প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক :
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
১১ বি. টি. রোড
কলিকাতা ৭০০০৫৬

মুদ্রক :
জাগরণী প্রেস
৪০/১ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা ৭০০০১২

পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

বিষয়সূচী

আধুনিক পৃথিবীতে কমিউনিকেশন তথা ভাব-সংযোগের সমস্যা, একটা বহুমুখী চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিমূলক সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজোন্নয়ন —অর্থাৎ ভাবনা ও রচনার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এই প্রশ্ন এবং এর উত্তর খুঁজছেন বুদ্ধিজীবীরা। চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, বিচ্ছিন্নতাবোধে, সূক্ষ্ম প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের ব্যবহারে সমাজতন্ত্রের প্রসারে মাস-মিডিয়া ওরফে গণ-মাধ্যম ব্যবহারের ব্যাপকতায—সর্বত্রই আজ সংযোগ আর বিযুক্তির টানা-পোড়েন তীব্র—এবং আরও তীব্র হচ্ছে।

আমরা বাংলা সংস্কৃতির বিশিষ্ট পটভূমিতে সংযোগ-সঞ্চারের সমস্যাটিকে নানাদিক থেকে তুলে ধরবার জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলিত একটি গুচ্ছ পরিবেশন করছি।

বিষয়টির ধারাবাহিক এবং সামগ্রিক চর্চা আমাদের ভাষায় নূতন। পাঠকেরা এটি গ্রহণ করলে পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করব।

প্রকাশক

মুখবন্ধ

এক : 'ট্রাম চলে তো মন চলে না'

১৯৫৫ কে আন্তর্জাতিক সংযোগ-বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। যান্ত্রিক বিদ্যার চূড়ান্ত বিকাশের যুগে জাগতিক এবং আন্তর্গ্রহ কমিউনিকেশনের তথা মাস মিডিয়ার নানা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে, হবে—কিছু কার্যক্রম নেওয়া। হয়তো বা সে-সব ভাবনা-পরিকল্পনায় কিছু ফলও পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর জীবনে নিয়ত সংযোগের যে-সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা নিয়ে পর্যাপ্ত বিতর্ক ও গবেষণা কিছু কম জরুরী নয়। কারণ এই সব সমস্যা এবং সমাধানের পথ কোনটাই কারিগরি বিদ্যার মতো সুনিশ্চিত নয়। ১৯৫৫-তে সাংস্কৃতিক কমিউনিকেশন নিয়ে কোন আয়োজন চোখে পড়ছে না; যদি কেউ লোকচক্ষুর আড়ালে আন্তরিক সংযোগের সন্ধানে রত থাকেন তো আশার কথা।

তৃতীয় বিশ্বের দেশ হলেও ভারতেও আজ আধুনিকতম কারিগরি বিজ্ঞানের তাপ লেগেছে। ভাবসংযোগের জটিল জালে ক্রমে আরও বেশি করে ধরা পড়ছে দূরতম গ্রামাঞ্চল। কলকাতা থেকে একশ কিলোমিটার দূরের গ্রামে চাষী যত স্বাচ্ছন্দ্যে আজ ডিজেল-পাম্পসেট গরুর গাড়িতে চাপিয়ে মাঠে যায় প্রায় তত সহজেই ট্রানজিস্টার বাজাতে পারে (আর্থিক সমস্যা, কলকাতা আকাশবাণীর দূর সম্প্রচার শক্তির স্বল্পতা প্রভৃতি অন্য সব বাধা না হয় ছেড়েই দিলুম)। কিন্তু যা বাজবে তার কতটুকু ঐ কলের সম্পত্তি আর কতটাই বা ঐ চাষীর অন্তর্গত রক্তে খেলা করবে তা নিয়ে নিরীক্ষণ, সমীক্ষা আর গবেষণায় গুরুত্ব দিতে আমরা যথেষ্ট দেরিই করে ফেলেছি।

টেকনলজির মধ্যে এমন শক্তি আছে আত্মবিস্তারের যে কিছুতেই তার সীমার বাইরে থাকা চলে না কোন হতদরিদ্র দেশেরও। তাই পেটে ভাতের মাথায় খড়ো চালের অভাব নিয়েও আর্যভট্ট-ইনস্যাটে মহাকাশে নামখোদাইয়ের অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাই। 'দোষ কারও নয়,' 'স্বখাত সলিলে ডুবে মরি' – সভ্যতার স্বখাত সলিলে। এই প্রচণ্ড গতি আর শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের –বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মনের বাড় যদি না ঘটে তো ভীষণ ভরাডুবি ঠেকবে না।

বিজ্ঞান আর কারিগরি বিদ্যা বড় নৈর্ব্যক্তিক—বড় বেশি নিরঞ্জন, তাতে দেশ-কালের রঙ প্রায় লাগেই না। মানুষের মন তা নয়, সৃষ্টি তা নয়। তাতে মাটির জলের গন্ধ জড়ানো, সময়ের ঘন্টা সেখানে বেজেই চলেছে প্রতিটি জাতিকে, ভাষাগোষ্ঠীকে, সময়কে তাই নিজের মতো করে সাংস্কৃতিক সংযোগের (কালচারাল কমিউনিকেশন) সমস্যাকে

বুঝতে হয়, মাটির মধ্যে সমাধানের পথ খুঁজতে হয়—আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিনিময়ে তা কুলোয় না।

দুই : 'সব বিকল হইয়া যাইবে'

রোম্যান্টিকেরা এক সময়ে প্রতিটি মানুষকে এক একটি দ্বীপ রূপে কল্পনা করতে ভালোবাসতেন মাঝখানে অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। পুঁজিবাদের জন্মের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিশ্ববিধানের নিয়ন্ত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ সমাজ তান্ত্রিক যূথবদ্ধতা তার যে প্রতিষেধক নিয়ে এল তার সত্য উপলব্ধ হতে-হতেই ব্যক্তিত্বনাশী অপর এক যৌগ-ফাসিজম দেখা দিল। এবং এ-কালের রুগ্ন স্বাতন্ত্র্যবাদ এক নব্য দার্শনিক প্রত্যয় হয়ে উঠল—অ্যালিয়েনেশনের প্রতিকূল বাতাসও আবার বইতে শুরু করেছে।

যবে থেকে স্বাভাবিক সামাজিক যূথের প্রতিস্পর্ধী কোন প্রবণতা বড় বেড়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গেই সেতুবন্ধের সাধনা চলেছে। আর সাম্প্রতিক মানববিশ্ব দূরত্ব-অসংযোগ বিচ্ছিন্নতার ব্যধিতে এত ভুগছে বলেই নতুন ওষুধের খোঁজে অশেষ তৎপরতা।

যন্ত্রে ও সংখ্যায় কিছু প্রেম সিঞ্চিত না হলে শেষ পর্যন্ত সব কলই যে বিকল হয়ে যাবে।

শিল্পসৃষ্টি শুধু নয়, জীবনাচরণের প্রতি পর্যায়ে, সর্ববিধ মানবজ্ঞানে, সমাজ সংগঠনে আন্তরিক সংযোগের এই চেতনা একটি নতুন মাত্রা এনেছে। আজ নানা দেশে অনুভূত হচ্ছে—এটা শুধু জরুরী নয়, অপরিহার্য। এরই ফলে সাংস্কৃতিক সংযোগ নামে এক আন্তর্বিদ্যার চর্চা (**Interdisciplinary study**) বিকশিত হয়েছে।

যে কোন বিদ্যার মতো এর ও জন্ম আকাশ থেকে নয়—বিচিত্র প্রসিদ্ধ জ্ঞানচর্চায় এর বীজ ছিল, আছে—এদেশের মাটিতে, বাংলার সংস্কৃতিতে তা খোঁজার, তা নিয়ে ভাবার কিছু দায়বদ্ধ এই সংকলন।

তিন : বিষয় থেকে তৈরি হোক বিশেষজ্ঞ

সংকলনে আছে একুশটি প্রবন্ধ।

একুশজন লেখকের মধ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক এবং সাংবাদিক আছেন, অন্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত ও কেউ কেউ আছেন। এঁরা অনেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত। মধ্যবয়স্করা আছেন, আছেন তরুণেরা; বয়সের দুই প্রান্ত চব্বিশ এবং চুয়াম্ন। অবশ্যই এঁরা বিভিন্ন বয়ঃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন না। লেখকেরা সবাই

নিজের বোধ-বুদ্ধিমতো বিশ্লেষণ করেছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ;—সম্পাদক হিসেবে তাঁদের স্বাধীন বক্তব্যই ধরে রাখতে চেয়েছি, আমার মত যা-ই হোক না কেন। চেয়েছি কমিউনিকেশন—জিজ্ঞাসায় নানা দিক থেকে আলো পড়ুক।

এঁরা কমিউনিকেশন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন, যদিও নিজের বিষয় নিয়ে অনেকেই নিবিড় চর্চা করেন। আর সাংস্কৃতিক কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ এদেশে কোথায়? আর এ বিষয়ে লিখতে গেলে এক্সপার্ট হতেই হবে, চিন্তাশীল মানুষের ভাবনার এর চৌহদ্দীতে প্রবেশ নিষেধ—এ কথা অযৌক্তিক, অগ্রাহ্য। আমি যাঁদের লিখতে আহ্বান জানিয়েছিলাম, পরিকল্পনা শুনেই যাঁরা পিছু হটেন নি, (অর্থনীতি ও সঙ্গীত বিষয়ে দুজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অবশ্য সময়াভাবে লিখতে পারেন নি।) তাঁদের অনেকের সঙ্গে লেখার আগে-পরে আলোচনা করে দেখেছি, এ-সমস্যার নানা দিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁদের কাছে সত্য ছিল, সত্য হয়ে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ লেখাই লক্ষ্যবিদ্ধ করেছে, বাকিগুলি অন্তত অভিপ্রায়কে স্পর্শ করেছে।

একথা মেনে নিচ্ছি, অপরিহার্য কয়েকটি প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পাই নি। কতগুলি বিষয় যোগ্য গুরুত্ব পেত যদি একাধিক লেখা থাকত। তবে মানববিদ্যার বহু বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ আছে এমন একটি নব্যবিদ্যার একান্ত চর্চার সূচনা করা হল আমাদের ভাষায়, সবিনয়ে এ দাবি করব ; প্রতীক্ষা করব কমিউনিকেশন নিয়ে মহত্তর বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের।

বিনা পারিশ্রমিকে শুধু বিষয়টিকে ভালোবেসে যাঁরা প্রবন্ধ দিয়ে গ্রন্থটি পূর্ণ করে তুলেছেন, যে তরুণ শিল্পী পুণ্যব্রত পত্রী প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বয়ং প্রকাশক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও সম্পাদনার কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন—বন্ধুবর রবীন্দ্র গুপ্ত, অনুজপ্রতিম পল্লব সেনগুপ্ত, অসিতানন্দ রায় এবং পুত্র পুষন গুপ্ত।

ক্ষেত্র গুপ্ত

অন্য সুর, অন্য ভাষা

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

সাধারণভাবে আমরা জানি যে ভাষা মনোভাব প্রকাশের একটি পরিচিত ও ক্ষমতাশালী মাধ্যম। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও তার মনোভাব প্রকাশ করত, সে-ভাষার প্রকার ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। প্রধানত স্বরবর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণকে ঠোঁট ও জিভের সাহায্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ভেঙে চুরে সে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করত। অবশ্য আমাদের কাছে যা এখন বিচিত্র বা অদ্ভুত ঠেকে, তার কাছে তা-ই ছিল স্বাভাবিক,—একমাত্র সম্বল। যখন যথেষ্ট হত না তাও, তখন কণ্ঠ স্বরনালীর আওয়াজকে সে হাতের তালুর সাহায্যেও নিয়ন্ত্রণ করত, ছোট-বড় বিভিন্ন আকারে ভেঙে নিয়ে। বাধাগ্রস্ত স্বরই এইভাবে ব্যাঞ্জনের সৃষ্টি করল; হাতের তালুর বদলে দাঁত, ঠোঁট, তালু, মূর্ধা প্রভৃতি মুখ-গহ্বরের বিভিন্ন অংশই বাধাদানের ভূমিকা গ্রহণ করল। জান্তব স্বর এইভাবে মানবিক রূপ লাভ করল।

কিন্তু কেন এইভাবে সরল ও জান্তব আওয়াজকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বেঁধে বিচিত্র রূপে ও রকমারি আকৃতিতে বিশিষ্ট করার চেষ্টা চলল ক্রমাগত? ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের আজকের ভাষা কেন তার প্রাথমিক রূপ থেকে এতটাই পাল্টে গেল যাতে তার ভ্রূণাবস্থার সঙ্গে বর্তমান চেহারার কোনও মিলই প্রায় চোখে পড়ে না?

শুধু অকারণ 'পুলকে'র জন্য যে এই পরিবর্তন ঘটেনি, তা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতিকে ও তার অন্যবিধ পরিমণ্ডলকে বশে আনার জন্য মানুষের মন যত উদ্‌গ্রীব হল, ততই বুদ্ধি ও নিত্যনব বিবেচনা বোধ তাকে, তার মনোভাবকে করে তুলতে লাগল সূক্ষ্ম, জটিল ও বিচিত্র। বিচারহীন বিশ্বাসবোধের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করল যুক্তিপ্রবণ সন্দেহকে; শিশুসুলভ আত্মসমর্পণের বদলে সে নিজেকে রক্ষা করতে মনস্থ হল; বিরুদ্ধতাকে জয় করার জন্য নিজস্ব শক্তিকে সংগ্রহ ও সংহত করে শত্রুর দৌর্বল্যের খোঁজ নিতে লাগল সে। ক্রমশ সূক্ষ্ম জটিল ও বিচিত্র এই মনের ভাবনাকে ব্যক্ত করার জন্য তার এইবার দরকার হল এইরূপ ভাষার।

প্রাকৃত জীবনে যখন এইরূপ পরিবর্তনের স্রোত বইছিল, মানুষের মুখের ভাষা হয়ে উঠছিল ভিন্ন চরিত্রের,—তখন তার শিল্পরূপের জন্যও খোঁজ পড়ল নতুন মাধ্যমের, নতুন ভাষার। তিনটি সমান্তরালকে এইভাবেই বিবর্তনের স্রোতে অঙ্গীবদ্ধরূপে অগ্রসর হতে দেখি আমরা। এইভাবে বিবর্তনটিকে দেখানো যেতে পারে।[১]

ক ১.   মানুষের মনোভাব—ক ২.—

খ ১.   মুখের ভাষা—খ ২,—

গ ১.   ভাষার শিল্পিত রূপ—গ ২.—

শুধু যে লিখিত ভাষার ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের রূপ ও চরিত্র ধরা পড়ছিল, তা অবশ্য নয়। শব্দগুচ্ছের যথাযথ অবস্থানের প্রয়োগে কাহিনীতে ও নাটকে গদ্যের শরীর বা ছন্দোবদ্ধ উপায়ে কবিতার শিল্পরূপ আবিষ্কার পরবর্তী যুগের ব্যাপার। প্রাগৈতিহাসিক মানুষও যে নিজের অন্যতর প্রয়োজনের তাগিদে শিল্পরূপের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করত, তার প্রমাণ রয়েছে বিভিন্ন গুহাচিত্রে, বিচিত্র সুরধ্বনির সৃষ্টিতে।

কিন্তু ছবি নয়, গান নয়,—চলচ্চিত্রকে বাদ দিলে সাহিত্যই শিল্পের আধুনিকতম মাধ্যম। কারণ এখানে শব্দকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করে মানুষ তার ভাবনাকে শিল্পরূপ দিতে চাইল। চিত্র ও সঙ্গীত অপেক্ষা সাহিত্যের মহিমা আরও বিশিষ্ট, আধুনিক ও জটিল, কারণ তার মাধ্যম আসলে প্রতীক ভিন্ন অন্য কিছু নয়। স্বর ও রেখা বা সুর ও ধ্বনিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা চিত্র ও সঙ্গীত প্রতীক ব্যবহারের নিয়ম শেখায় নি কিন্তু মানুষের চিন্তা > শব্দকে, শব্দ > বাক্যকে, বাক্য > কাব্যকে প্রকাশ করল, প্রতীকের মাধ্যমে। জটিল ও বহুমুখী চেতনার প্রতিফলন ঘটল এইভাবে।

সংলাপে, কাব্যে ও কাহিনীতে এই জটিল, সূক্ষ্ম, বিচিত্র ও রহস্যময় মানবমনকে যে-ভাষায় ও ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হল, তা বাস্তবেরই অনুকৃতি। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা দৃশ্যরাজি ও শব্দসমুচ্চয়কে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই লেখক তাঁর মত করে বাস্তবের রূপ দিলেন। লেখকের হৃদয়বৃত্তি ও বৌদ্ধিকতার ছাঁচে ঢালাই হয়ে এই যে দ্বিতীয় বিশ্ব নির্মিত হল, তা প্রাকৃত বিশ্বেরই অনুগামী।

কিন্তু এমন কথাও মনে হতে লাগল ক্রমশ যে মনের অন্দরে-কন্দরে, চিন্তার অন্তরঙ্গ কোণে, কল্পনার অধরা অস্পষ্টতায় লুকিয়ে আছে এমন অনেক কথা, প্রচলিত যুক্তিগত ভাষায় যাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। অথচ তাকেও ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সকলেরই মনের ভিতর লুকিয়ে আছে আর একটি মন,—যা স্পষ্টগ্রাহ্য যুক্তির ভাষায় কথা বলতে পারছে না, অথচ তার প্রকাশ ঘটলে তা সাধারণ্যে আস্বাদ্য হবে।

রূপকথার জন্মরহস্য এইখানেই লুকিয়ে আছে। উপন্যাসের মত এখানেও পূর্ব-মধ্য-অন্ত্য-বিশিষ্ট টানা একটি কাহিনীর জাল বোনা হচ্ছে, : তারই সমতালে বেড়ে উঠছে কতগুলি প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডের অন্যতম শিল্প-প্রয়োজন উপন্যাসের বাস্তবতা নামক ব্যাপারটি রূপকথায় ছিল না। দৈব-অনুগ্রহে

রাজপুত্র এখানে অনায়াসে বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে যান, সমস্যার সপ্তসিন্ধুকে অতিক্রম করেন,—শেষ পর্যন্ত রাজকন্যারূপ ইচ্ছাকে করতলধৃত করে তিনি বাস্তব-পৃথিবীর অসহায় নায়ককে বিস্মিত করেন।

অব্যবহিত পূর্ব-বাক্যটির রূপকচিন্তাকে আমরা অস্বীকার করি না। এবং রূপককথা থেকেই রূপকথার জন্ম হয়েছে, একথা ধরে নিলেও রূপকথার বস্তুবিশ্বের চরিত্র যে বর্তমান গল্প-উপন্যাসের চরিত্র অপেক্ষা অন্যতর, তাতেও কোন সন্দেহ থাকে না আমাদের।

'বিজার'-জাতীয় টুকরো লোককথার সন্ধান পাওয়া যায় প্রাচীনকাল থেকেই। তাছাড়া লোকজীবনের বিস্ময়বোধ উৎপাদনের ইচ্ছা থেকে কীভাবে ধাঁধার গল্প কাহিনীর বিচিত্র ভাব ও বিষয় লুকিয়ে আছে তাও আমরা দেখেছি। প্রাচীন আলঙ্কারিকরা যে নবরসের মধ্যে 'অদ্ভুত'কেও স্থান দিয়েছেন, তা থেকেও বোঝা যায় যে এই রসের শিল্প-নির্মাণ অপ্রচলিত ছিল না। এই সমস্ত শিল্পকাণ্ডের ভিতরে সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়, কীভাবে পরিচিত বাস্তবের প্রাথমিক উপকরণকে ভেদ করে গড়ে ওঠে লেখকের মায়ার জগৎ, যা স্বভাবে বস্তুবিশ্বের চরিত্র থেকে পৃথক হয়েও মানুষের গোপন কোন ইচ্ছাকে প্রাণ দিচ্ছে। তাকে আস্বাদ করার মানদণ্ডটিও তখন বদলে যাচ্ছে।

বিদেশি 'গ্রটেস্ক' জাতীয় শিল্পকলাকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। Shipley সম্পাদিত The Dictionary of World literary Terms-এর 'Grotesque' শীর্ষক অধ্যায়ে জানানো হচ্ছে '…of ancient buildings with murals of humans fantastically interwoven with animals and foliage. Hence ludicrous from incongruity or distortion ; fantastically absurd. Ruskin says that by the bold conjunction of symbols it reveals truths otherwise difficult to express.'

দেশী-বিদেশী ফ্যানটাসি শ্রেণীর রচনাকেও এই গোত্রভুক্ত করা যায়। সাধারণভাবে আমরা জানি যে ফ্যানটাসি উদ্ভট কল্পনার জগৎ। আভিধানিক অর্থে কথাটির একাধিক মানে খোঁজা হয়েছে। তাতে যেমন 'হ্যালুসিনেশন' বোঝায়, তেমনি 'ফ্যান্সি'ও বোঝায়। এই 'ফ্যান্সি'র সূত্র ধরে বলা হচ্ছে 'free play of creative imagination' (webster's Seventh New Collegiate Dictionary)। অর্থাৎ শব্দটি থেকে একদিকে যেমন মনোরোগ বা মানসিক বিকৃতি বেরিয়ে আসছে, সৃষ্টিশীল মনে সেই বিকৃতিই কিন্তু সদর্থে রসসৃষ্টির যোগ্য বাহন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই সৃষ্টিশীল কল্পনাও এক অর্থে 'স্বপ্ন' নামক জৈবিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এনসাইক্লো-পেডিয়া ব্রিটানিকা-এর 18th vol. জানাচ্ছে : 'When a person who is other-

wise awake tends to lose contact with the environment and his thinking proeeeds with little or no concern for logical considerations conditions become favourable for fantasiging." (P 357, macropaedia, 15 Edn :)

'হযবরল' বা এলিসের কাহিনীকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : 'বেজায় গরম। গাছ তলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল, ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি, অমনি রুমালটা বলল 'ম্যাঁও।' পাঠক মনে মনে মুচকি হেসে ধরে নেন যে তৃতীয় বাক্যের থেকেই গল্পের আত্মচরিত্র ঘুম ও জাগরণের মধ্যবিন্দুতে চলে গেছে।

কিংবা এলিসের কাহিনীর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই যখন দেখি 'She was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid) whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white Rabbit with pink eyes ran close by her,' তখন সহজেই বুঝি যে এলিস ইতিমধ্যেই অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় চলে গেছে।

এইভাবে স্বপ্নের মধ্যবিন্দুতেও বাইরের স্পর্শ অন্তর্মনে স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জাগরণেও স্বপ্নের বহির্ভূত ঘটনা তার দৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। মেজমামার কানমলা এইভাবেই 'হযবরল'-এ ব্যাকরণ শিং-এর গুঁতোয় পরিণত হয়।

কিন্তু এ তো গেল স্বাপ্নিকের কথা। তার স্বপ্ন যখন ফ্যানটাসির রসে সিক্ত হয়ে পাঠকের কাছে পৌছচ্ছে, তখন পাঠকের প্রতিক্রিয়াই বা কীরকম হতে পারে ?

সে যদিও জানে যে গোটা ব্যাপারই ঘটছে স্বপ্নের ভিতর, তথাপি কাহিনীর ঐ বিচরণভূমি তার কাছে বাস্তবজীবনের জাগ্রত অবস্থার বিশিষ্ট রূপ (এ ক্ষেত্রে ফ্যানটাসির) ধারণ করে হাজির হচ্ছে। পাঠক জানে যে বস্তুত ঐ স্বপ্ন দেখা বা নিদ্রাটুকুই বাস্তব। এইবার সে বাস্তবাতীতের রাজ্যে প্রবেশ করছে।

বিশ শতকে এসে মানুষ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এমন একটি স্তরে উপনীত হয়েছে, যেখানে অসম্ভব-জাত বিস্ময়বোধ তার হারিয়ে যাচ্ছে, গেছে। অথচ সেই অনুপস্থিত বিস্ময়কেই সে আস্বাদ করছে শিল্পের মধ্যে। 'Througn The looking Glass'-এ এলিস যখন বলছে,

'Oh Tiger-lily' ! said Alice addressing herself to one that was waving gracefully about in the wind, 'I wish you could talk !'

'We can talk' Said the Tiger-lily, 'When there's anydbody worth talking to'...

কাহিনীর এই অংশে ভাববিকাশের তিনটি স্তর স্পষ্ট। টাইগার লিলি ফুলগাছ কথা বলতে পারে না। যদি পারত! প্রথম স্তরে এলিসের এই ভাবনা স্বাভাবিকত্বের জগৎ থেকে উত্থিত হল। টাইগার লিলি জানাল যে সে কথা বলতে পারে। এই অসম্ভব কথাটিই ভাবের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে এসে এলিস বিস্মিত হচ্ছে। প্রথম দুই স্তরের পরস্পর বিরোধ বৈপরীত্য-হেতু এলিসের প্রত্যাশিতের জগৎ ভেঙে যাচ্ছে বলেই সে বিস্মিত হচ্ছে।

এই প্রত্যাশাকেই অন্যভাবে পরিপ্রেক্ষিত বলা যায়। স্বাভাবিক জগতে প্রতিটি বস্তুর গ্রহণ ব্যাপারে এক-একটি পরিপ্রেক্ষিত থাকে। তার ভূমিটি সরে গেলেই অসম্ভবের রাজ্যে উপনীত হই আমরা। এই প্রত্যাশার জগতের নিয়মকেই Eric Rabkin 'The Fantastic in Literature' গ্রন্থে 'Ground rules' বলেছেন। সে সম্পর্কে ধারণা সুতরাং Sense ও Nonsense উভয় ক্ষেত্রেই থাকা প্রয়োজন। একে টিকিয়ে রাখলে Sense বজায় থাকে, তাকে অস্বীকার করলেই Nonsense আবির্ভূত হয়।

'হ য ব র ল'র একটি অংশ উদ্ধার করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে :

'কে যেন ভাঙা ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল 'সাত দুগুণে কত হয়?'... আমি বললাম 'সাত দুগুণে চোদ্দ'। কাকটা অমনি দুলে দুলে মাথা নেড়ে বলতে লাগল 'হয় নি, হয় নি, ফেল'।...বললাম নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ।' কাকটা...বলল 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেন্সিল।' আমি বললাম...'এখন কেন?' কাক বলল, 'তুমি যখন বলছিলে তখনো পুরো চোদ্দ হয় নি। তখন ছিল তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে ধা করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'

কাহিনীর এতটা অংশ ইচ্ছা করেই উদ্ধার করা হল। এর প্রতিটি অংশের ও ভাবনাপ্রবাহের প্রতিটি স্তরের অসঙ্গতি ('Ground rules'-কে অস্বীকার) প্রত্যাশার জগৎ থেকে আমাদের ক্রমাগত দূরে ঠেলে দেয়। সাত দুগুণে চোদ্দর প্রত্যাশার জগৎ বৈপরীত্বের মত হাজির থেকে ফ্যানটাসির উন্মার্গ চিন্তাকেই স্পষ্টতর করে।

ফ্যানটাসির মধ্যে কল্পনার উন্মার্গ চিন্তা এই ভাবেই বাস্তব পৃথিবীর ভাব ও ভাষা থেকে পাঠকের মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় নীল আকাশের গায়ে,—পাল তোলা শাদা মেঘের নৌকার মত দুলতে থাকে আমাদের মন। আবার যদি দ্বিতীয় মাত্রা খোঁজার চেষ্টা চলে,

তবে অনেক সময় দেখা যায় লেখকের একটি অন্যতর উদ্দেশ্যও ঢাকা ছিল ফ্যানটাসির ভাব ও ভাষার মলাটে।

উদ্ধৃত অংশে কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখেছি যে সময়ের সামান্য হেরফেরে 'চোদ্দ' হয়ে যেতে পারে 'তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই' বা 'চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই'। এই ঘটনাটি কি প্রশ্ন তুলছে না মানবজীবনের তাৎক্ষণিক জীবনযাপন সম্বন্ধে? এই মুহূর্তের আমি আর কিছুক্ষণ পরের আমি কি একই লোক? এমন কোন স্থির উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস কি আমার জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যা জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ড-মিনিট ঘণ্টার দিনযাপনকে অখণ্ডিত সম্পূর্ণতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে অর্থবহ?

আত্মজিজ্ঞাসার ও পারিপার্শ্বিক মানবজীবনের দিকে দৃষ্টিপাতের পর হতাশ আমাদের মনে হয়: না, পারে না। অ্যাবসার্ড শিল্পের মতই সেক্ষেত্রে 'হ য ব র ল'র এই অংশটি উদ্দেশ্যহীন মানবজীবনের তাৎক্ষণিকতাকে আরও প্রকট রূপে হাজির করে। আমাদের জীবনটাই যে 'হ য ব র ল' হয়ে গেছে, তখন আমরা ভেতরে ভেতরে তা টের পেতে থাকি।

কোন সন্দেহই নেই যে অ্যাবসার্ড শিল্পের এই অবাস্তবিক (non-realistic) ভাষা লেখকের একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শন ও তার প্রকাশের অনিবার্য রূপ। অ্যাবসার্ড-এর ভাষা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে তাই অ্যাবসার্ড দর্শন সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নেওয়া যাক।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নীটশের 'জরথুষ্ট্র' প্রথম প্রকাশ পায়। তারপর থেকে এমন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বর্দ্ধিত হয়েছে যাঁরা নীটশের মতই মনে করেন যে ভগবান মারা গেছেন। তাই তাঁরা এখন এমন-এক বিশ্বে অবস্থিত, একদা যার একটি কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সেই কেন্দ্রবিন্দুর অভাবে বর্তমান জীবনযাত্রা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছে। এবং সেইজন্যই বর্তমান, বিশ্ব ও তার সংসারযাত্রাকে রীতিমত স্খলিত, উদ্দেশ্যহীন, এককথায় অ্যাবসার্ড বলে মনে হয়। এই ধারণা থেকেই অ্যাবসার্ড শিল্পের যাত্রা শুরু।

এর ফলে পুরনো মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত শিল্প সৃষ্টিকরাকে অনেকে নিরর্থক, অনাবশ্যক, অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। 'It bravely faces upto the fact that for those to whom the world has lost its central explanation and meaning, it is no longer possible to accept art-forms still based on the continuation of standards and concepts that have lost their validity' (P. 389, 'The Theatre of the absurd

এই জাগতিক বিশৃঙ্খলা ও যুক্তিহীনতা ও জীবনবৃত্তের কেন্দ্রীয় সত্যবিন্দুর অভাববোধ সম্পর্কে সক্রিয় ও সচেতন করাই অ্যাবসার্ড শিল্পের অভীপ্সা। ঐশ্বরিক উপস্থিতির অভাবে, কেন্দ্রাভিগ উদ্দেশ্যের অভাবে মানব-অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত,—কোনও সাধারণ অ্যাত্মিক সত্তায় সূত্রবদ্ধ নয়। অ্যাবসার্ড শিল্প মুগ্ধ, সন্তুষ্ট, নিশ্চিন্ত মানুষকে আঘাত করে বর্তমান চেতনায় নিয়ে এসে 'Ultimate reality of his condition' (P. 390, 'The Theatre of the Absurd) সম্বন্ধে সচেতন করে।

এই সচেতনার কাজটি অনেক সময় একটি ব্যাঙ্গাত্মক মাত্রা যুক্ত হয়ে হাজির হয়। এই প্রসঙ্গে ক্যামুর 'দ্য মিথ অব দ্য সিসিফাস'-কে মনে পড়ে, যেখানে মানবজীবনের উদ্দেশ্য হীনতা বোঝাতে গিয়ে তিনি কাঁচঘরে আবদ্ধ মানুষের টেলিফোন করার নির্বাক মূকাভিনয়ের ভঙ্গিমার কথা বলেছেন।

এই উদ্দেশ্যহীন অভ্যস্ত, যান্ত্রিক, ঘুমন্ত ও অনবচেতন মনকে অ্যাবসার্ড শিল্প ফুটিয়ে তোলে। স্যুররিয়ালিস্ট চিত্রীও প্রথাসিদ্ধ মাধ্যমের দ্বারা তাঁর ভাবনাকে মুক্ত করতে না-পেরে মাববমনের অন্তস্থিত এই জটিল, ব্যাখ্যাতীত ভাবরূপকে তাঁর ছবিতে ফোটাতে চান। তবে 'Surrealism turns away from life, while the absurd claims to be a reflection of life'. (The Dictionary of world Literary Terms/Shipley)।

'হ য ব র ল'র প্যাঁচারূপী বিচারকের ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্যটি এইভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। তাছাড়া লক্ষণীয় যে বিচারকরূপে প্যাঁচাকে নির্বাচন করা হয়েছে, দিবালোকের মুক্ত আলোয় যে তাকাতে পারে না। শুধু তথাকথিত বিচারালয় নয়, জাগতিক যাবতীয় বিচারদৃশ্যেই কি এই অবহেলা ও অন্ধত্ব আমাদের নজরে পড়ে না ?

অ্যাবসার্ডে দর্শক/পাঠককে সচেতন করা হয় এই বিশৃঙ্খল জগতে তার করুণ ও অব্যবস্থিত উপস্থিতি সম্বন্ধে। এইরূপ অস্তিত্ব এলিসের বিভিন্ন রূপাকৃতির (গল্পের শুরুতেই সে মিশ্র স্বাদগন্ধের চাটনি খেয়ে, কেকের টুকরো কামড়ে, জাপানি পাখা হাতে নিয়ে বারবার অস্বাভাবিক লম্বা ও ক্ষুদ্রায়তন হয়ে গেছে) ও বিভিন্ন লোকের কাছে তার বিভিন্ন পরিচয় থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

'হ য ব র ল'র 'কি মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।' অমনি বেড়ালটা বলে উঠল 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।' আমি খানিক ভেবে বললাম 'তা হলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব?' ...বেড়াল বলল 'রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও

বলতে পার।' এই অংশটিও আমাদের বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলছে; অর্থাৎ কারুরই কোন স্থির সনাক্তকরণ ঘটছে না।

যেহেতু প্রচলিত শিল্পমাধ্যমের মত পূর্বপরিকল্পিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনার প্রতীতিকে সে হাজির করে না, বরং শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করে, তাই অ্যাবসার্ড তথাকথিত যুক্তিশৃঙ্খলের (যা কেন্দ্রাভিগ অস্তিত্বের অভাবে অর্থহীন) বদলে মূর্ত ভাবরূপের ('Concrete images'; 'The Theatre of the Absurd') ভাষায় কথা বলে, তাই কোন যৌক্তিকতা বা ঔচিত্যবোধজাত সমস্যা-সমাধান প্রভৃতির বদলে অ্যাবসার্ডে শুধু মানবজীবনের আপাতিক উপস্থিতিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়। এই শুধু বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় একই জীবনের যে বিভিন্ন খণ্ডিত মূর্তি, তাকে অস্তিত্ববাদের দর্শনেও ফোটানো হয়েছে; অবশ্যই অন্যভাবে, অন্যসূত্রে, অন্য উদ্দেশ্যে।

যেহেতু অ্যাবসার্ডে শিল্পীর মনোজগতের অন্তরতম চিন্তাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়, তাই এতে বহির্জাগতিক দ্বন্দ্ব, তা-জাত নাটকীয়তা, থাকে না। কোন উচিত-কথার অন্তর্বাণীও এতে নেই। কারণ সাধারণ অর্থে কোন কাহিনী-বিস্তার বা প্রাবন্ধিক বাণীদান তার লক্ষ্য নয়। কাব্যিক চিত্রমালাই তার ভাষা ও ভঙ্গি।

Ludwig Klages-এর মতে আমাদের অনুভূতিগুলি প্রত্যক্ষত কতকগুলি রূপাকৃতির জন্ম দেয়। বিশ্লেষণী চিন্তার মাধ্যমে তাকেই আমরা সাধারণ প্রকাশভঙ্গিতে অনুবাদ করি। সৃষ্টিশীল অনুভূতিপ্রবণতা এইভাবে বিশ্লেষণী যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত, বাধাপ্রাপ্ত ও খণ্ডিত হয়। অ্যাবসার্ড এক অর্থে কাব্যিক রূপপ্রকাশকেই বিশিষ্ট মাত্রা ও ভাষা দেয়। তখন তার গদ্যভাষাও কোন-কোন ক্ষেত্রে গদ্যের সাধারণ স্বভাবচ্যুত হয়ে যুক্তি-শৃঙ্খল, বিশ্লেষণী দক্ষতা ও বিবরণী প্রতিভার বদলে শিল্পীর মনোজগতের একান্ত প্রত্যক্ষ, কোন কোন ক্ষেত্রে অরূপ চিন্তা ও রূপাকৃতির স্বভাব-বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষা-প্রকাশের বহির্ভূত এই সত্যকে অ্যাবসার্ড ধরে রেখেছে। তার ঐ ধারণাভঙ্গিমাই অ্যাবসার্ড শিল্পের বিশিষ্ট ভাষা।

এই প্রসঙ্গে 'হ য ব র ল'র হ্যাডার গাওয়া 'লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ' পংক্তিটিকে নেওয়া যেতে পারে। গানের সুরের বর্ণচিন্তা সচেতনভাবে আমরা করি না; তা থেকে যে গন্ধ বেরিয়ে আসতে পারে, তা-ও যুক্তিপূর্ণ বলে আমাদের মন মেনে নেয় না। সুরের জালে মনেমনে অনেকেই ছবি আঁকি. _তখন তাতে বর্ণের প্রলেপও পড়ে, —কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে তাকে ব্যক্ত করি কি?

কিংবা এলিসের কাহিনীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে কথা-বলা বেড়াল যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক যখন বলছেন: 'and this time it vanished

quite slowly, beginning with the end of the tail and ending with the grin, which remained some time after the rest of it had gone' তখন আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে যদিও অবয়বহীন এই হাসিটুকুও আমাদের অবচেতন মনের দৃশ্যের জগতে অনেকক্ষণ ঝুলে থাকতে পারে, বাস্তবিক প্রথাগত কাহিনীতে বা যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তাকে ব্যক্ত করা যায় না। কবিতার বিষয়ভুক্ত এই নিরালম্ব মুচকি হাসিটুকু উদ্ভটের দিগন্তে চিরতরে ঝুলে রইল।

ইয়োনেস্কো তাঁর 'Ni un dien ri un demon'-এ বলছেন যে যদি সত্যিই সম্পূর্ণত অন্তর্মনের প্রকাশ ঘটাতে হয়, তবে প্রচলিত ব্যর্থ লজিকের সীমা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তবেই শিল্পীর অন্তশ্চেতনার সাহসী প্রকাশ ঘটানো যাবে। লিয়রের ছড়ায় বা হাম্‌টি-ডাম্‌টির জগতে আসলে ইতিপূর্বে প্রকাশিত চর্বিত-চর্বণের ভাষা ও চিন্তাকেই সূক্ষ্মভাবে ভ্যাঙানো হয়েছে। অথচ এই ভাষা ও চিন্তাই বর্তমান পৃথিবীতে স্থূল ও প্রবল প্রতাপ দেখাচ্ছে। এই নির্বোধ, সন্তুষ্ট, চেতনাহীন পৃথিবীর বিকট রূপকে অ্যাবসার্ড শিল্পে বিকটতর করে দেখিয়ে পাঠককে সচেতন করার চেষ্টা চলে, খানিকটা শক-থেরাপির মত।

শিল্পে প্রকাশিত ফ্যানটাসি বা অ্যাবসার্ড বা ননসেন্স-এর সঙ্গে বাস্তবিক ঐ মনোভঙ্গির পার্থক্যের পরিখা থেকেই যায়। মনে যা এল, তাকেই যদি লেখা যায়, তবে তাতে পাগলামির লিখিত প্রকাশ ঘটতে পারে, উদ্ভট জগতের শিল্প তাতে রচিত হয় না। কারণ তা হলে তাতে বর্তমান জগতেরই খণ্ডিত এক টুকরো অংশ প্রকাশিত হবে,—কিন্তু এই পৃথিবীর উদ্দেশ্যহীনতার সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি, যা উদ্ভট শিল্পে প্রত্যাশিত,—তাকে ধরা যাবে না। কারণ আসলে তো উদ্ভট শিল্পেরও উদ্দেশ্য আছে: বর্তমান বিশ্বের উদ্দেশ্যহীন, খণ্ডিত, পারম্পর্যহীন বেঁচে থাকাকেই সে সম্পূর্ণত প্রকাশ করতে চায়।

অ্যাবসার্ডের এই দর্শন ও রসরূপকে তাত্ত্বিকেরা অভিন্ন বলে মনে করেন। আমরা তা মনে করি না। পরশুরামের 'দক্ষিণ রায়' গল্পটির কথাই ধরা যাক। রসরূপের উদ্ভট স্বাদের জন্য এটিকে আপাত ফ্যানটাসি বলে মনে হয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই এটির অন্য উদ্দেশ্য ধরা পড়বে। নানাবিধ চোরা কারবারের মালিক অসৎ বকুলাল দত্ত। দুঃখী অসহায় মানুষের ঘাড় মটকে বাঘের মতই সে শোষণ করেছে তার রক্ত বা প্রাণশক্তি। ফলে 'বাবা দক্ষিণরায় তাঁর ল্যাজটি চট করে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করেলন।' প্রকৃত জীবনে যে জীবনযাপন ছিল বিকট, অ্যাবসার্ড গল্পে তাকেই নিকটতর করে প্রকাশ করা হল। বকুবাবুর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ

ব্যাপারটা আলাদা করে দেখলে ফ্যানটাসির মত, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ভাবতে গেলে গল্পটিকে অ্যাবসার্ড-এর উদাহরণ বলেই মনে হয়।

এইসূত্রে ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র কথাও মনে পড়ে। সেখানে প্রতিশোধের জন্য খেতুর ব্যাঘ্ররূপ ধারণের ঘটনাটি ফ্যানটাসি বলে মনে হলেও 'কঙ্কাবতী' শুধু অকারণ পুলকে রচিত হয় নি। উদ্দেশ্যের দিক থেকে এটাও সামাজিক ব্যঙ্গের শিল্পপ্রকাশ।

বিদেশী কাহিনীর মধ্যে সুইফটের 'গালিভার্স ট্রাভেলস'কে মনে পড়ে। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের বহুবিধ কদাচার, ভণ্ডামি ও অমানবিকতাই এক্ষেত্রে লেখকের আক্রমণের বিষয়। তৎকালীন ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল প্রতিহিংসাপরায়ণ। খোলাখুলি প্রতিবাদ করা, তাই, সুইফ্‌টের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি বেছে নিলেন এক উদ্ভট কাহিনী,—যার শিল্পিত আবরণীর আড়ালে দাঁড়িয়ে লেখক যুদ্ধ চালালেন 'the chief end I propose to myself in all my labours is to vex the world rather than divert it...without hurting my own person' (Letter to pope, Sept, 29, 1725)। লিলিপুটের দেশে গালিভারের বিরাট উপস্থিতির মতই তাঁর পরিপার্শ্বের ছোট মানুষদের মাঝে লেখকও ঐরূপ বেমানান ছিলেন।

এই ধ্বংসের ইচ্ছা ও নিজেকে আড়াল করার প্রচেষ্টার জন্য 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স' নামক রূপকটি উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সামাজিক ব্যঙ্গ হলেও অসম্ভবের গল্পাঙ্গিকের মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করা হল। এখানেই একটা কথা বেরিয়ে আসছে। তা হল অ্যাবসার্ড তত্ত্বে বিশ্বাসী না হয়েও তার রূপটিকে গ্রহণ করা যায়,—যেমন করেছেন নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনায় মার্কসীয় দর্শন হাজির থাকলেও নাট্যের আঙ্গিক রূপে তিনিও অ্যাবসার্ডের দ্বারস্থ হয়েছেন। 'রাজরক্ত' প্রভৃতি নাটকই তার প্রমাণ।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে অ্যাবসার্ড যদি রূপকের আঙ্গিক গ্রহণ করে তবে রূপকের মধ্যকার 'পিওর অ্যালিগরি'র আমেজ ভেঙে যায়। যদি বলি 'কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত' তবে মনে মনে শুদ্ধ একটি রূপক চিন্তা করি আমরা। কিন্তু রূপক কথা থেকেই রূপকথা জাত হয়েছে, সেকথা মনে রেখেও বলা যায় যে গালিভারের কাহিনীর মত সৃষ্টি মিশ্র চরিত্রের। তাতে অ্যাবসার্ডের সঙ্গে শুদ্ধ রূপকের মিশেল দেওয়া হয়েছে,—কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্যানটাসির টুকরোও চোখে পড়ে। ফ্যানটাসি, রূপক, অ্যাবসার্ড-এর চরিত্র ও চেহারা মিলে মিশে এইভাবে এই ধরনের বেশির ভাগ কাহিনী মিশ্র একটি মূর্তি পায়।

'হ য ব র ল' কে যে আপাতত সমাজ-সচেতন লেখা বলে মনে হয় না, রূপকথার ভিতরের রূপক নয় বরং পরিবেশের মায়াই যে আমাদের প্রধানত আকর্ষণ করে, গালিভারের

গল্পের বামন ও দৈত্যদের কাহিনীর আকর্ষণেই যে আমরা নিবিষ্ট হয়ে যাই, তা এ লেখা-গুলিরই কৃতিত্ব। আঙ্গিকের বহিরাবরণ মনোহরণ না করলে রসসৃষ্টির প্রাথমিক দিকটিই উপেক্ষিত থাকে, তখন লেখা হয় তত্ত্বের সারসংক্ষেপ। বাইরের রূপেও রূপ প্রকাশের মায়ায় শূন্যবাদী চর্যার পদকারেরাই ধরা দিয়েছেন, সাধারণ দর্শক তো ছার।

রূপকথা, ফ্যানটাসি বা অ্যাবসার্ডের মত অবস্তুবাদী শিল্পমাধ্যমে ভাব-ভাষা-ভঙ্গি কী ভূমিকা গ্রহণ করে, তার পরিচয় পেয়েছি। এবার দেখা যাক, প্রচলিত কাহিনীর মধ্যেও কী ভাবে বাস্তবাতীতের পদপাত ঘটে।

প্রথমেই বক্তব্য, খাঁটি ভূতের গল্পকে এই আলোচনার বাইরে রাখছি। ধর্মতত্ত্বমূলক কাহিনীর মত এখানেও বস্তুর অতীতকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা হয়। ফলে এদের জগৎ ও পরিধি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সামাজিক রূপকের বহিরাবরণে যখন মজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসে ভৌতিক পরিবেশ, বা পরশুরামের বকুলাল দত্ত যখন হঠাৎ বাস্তবের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন মানবাতীত পরিচয়ের ডোরাকাটা ছাপে, তখন তার অন্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠককে সচেতন হতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক গল্পগুলির সম্বন্ধেও একথা সত্য। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির কথা মনে করা যাক। ভাষার ও উপস্থাপনার দুটি স্তর এই গল্পের অন্তর্বর্তী দুটি ভাবনার পর্যায়কে স্পর্শ করছে। গল্পের শুরুতে বাস্তবিকের বর্ণনার চালে যে লঘু সাংবাদিকতার কৌতুকাবরণ তা যেন বৈপরীত্যের পট হিসাবে কাহিনীর মধ্যবর্তী চিত্রভাষাটিকেই,—তার রহস্য ও অতীত উদ্ভাস সমেত,—ফুটিয়ে তুলছে। 'বিশ্বসংসারের ভিতরে যে এমন সকল অশ্রুতপূর্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন সকল গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এসমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম।'

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যাক নিম্নোক্ত বাক্যটির **সঙ্গীতকে** ; 'তখন হইতে স্নানশালার ফোয়ারায় মুখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার-কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।', কিংবা **চিত্রল** এই বাক্যটিকে ; 'তখন শুস্তা নদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে ; ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এ পারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।' কিংবা **ঘ্রাণনির্ভর** এই বাক্যটিকে: 'নিকটের পাহাড়ের বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে

ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।' বা স্পর্শমুখর এই বাক্যকে : 'যে মায়াময়ীরা আমার পায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর দিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না।' কবিত্বময়, দ্রুতবেগ, তৎসম-বহুল ও ইন্দ্রিয় নির্ভর এই চারটি বাক্য যেন সুরের কোন সঙ্গীতকে, চিত্রকে, গন্ধকে, অথবা স্পর্শকে উড়িয়ে নিয়ে আসছে 'বহুযুগের ওপার হতে'। মাঝে-মাঝেই দীর্ঘ বাক্যগুলি প্রবহমান সময়ের বিস্তার ও কল্পনার ব্যাপ্তিকেই আকার দিচ্ছে। এই গল্পের শুরু ও শেষের ফ্রেমটিতেই যা-কিছু কথোপকথন। ভিতরে মেহের আলির চিৎকার ভিন্ন স্পষ্টগ্রাহ্য কোন উক্তি-প্রত্যুক্তি নেই। এখানকার ভাষা নীরবতার> দৃশ্যের> উপলব্ধির। বহির্পৃথিবীর কেজো গদ্য এখানে বাতুলতার নামান্তর। তাকে উপরিতলের ও অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে বলেই অন্য এই ভাষা তার অনুগ ভাবনাটিকে ফুটিয়ে তুলছে; তৎসম শব্দের ভার যেন ভারী ওজনের অতীতকেই প্রাণ দিচ্ছে।

জীবনানন্দের কবিতার ভাষায়ও এইরূপ অলৌকিক ভাবনা ছায়া ফেলেছে। 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। এই কাব্যপংক্তিতে ব্যবহৃত আকার চিহ্নের দীর্ঘস্বর যেন প্রবহমান সময়ের স্রোত থেকে অতিদূরের কোন অতীতকে, তার দীর্ঘতাকে ছোঁবার অভিপ্রায় বলে মনে হয়।

ম্যাকবেথ, নাটকের বহিরাবরণকে তেমনি অনেকখানি প্রভাবিত করেছে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' ও 'উইচ-ক্র্যাফ্‌ট'। সেইসময়কার ইংলণ্ডে এসবের প্রচলন ছিল বহুল পরিমাণে।

কিন্তু 'ক্ষুধিত পাষাণের বা 'বনলতা সেন'-এর বা 'ম্যাকবেথে'র এই সব অলৌকিক ভাব ও ভাষা শুধু বর্ণনার সূত্র ধরেই ফুরিয়ে যায় না,—তার থেকেই বেরিয়ে আসে অতীতকে স্পর্শ করার জন্য ক্লিন্ন বর্তমানের অনিবার্য ঝোঁক, মানব-অস্তিত্বের মর্মভেদী গাঢ় নিঃসহায় বেদনাবোধ ও আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা এবং লোভ, উচ্চাশা ও হিংসার পরিণামে ধ্বংসমুখী ভয়ঙ্কর হাহাকার।

একেবারে স্বাভাবিক গল্পের মধ্যেও তার ভিতরকার বেদনা বা অন্তর্বাসটুকুকে ফোটানোর জন্য অলৌকিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। এই মুহূর্তেই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস বা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটির কথা মনে পড়ছে।

অজ-এর জীবনে ইন্দুমতীর মত সূর্যমুখীও ছিল নগেন্দ্রর জীবনে একাধারে গৃহিনী, সচিব, সখী, মিত্র, প্রিয়শিষ্যা ও ললিতকলায় পারদর্শিনী। তাদের যৌথ জীবনে কোন মালিন্যের ছায়া পড়েনি কখনো। হঠাৎ এল কালবৈশাখীর মত দুর্যোগ। কুন্দর মোহে পড়ে নগেন্দ্র ত্যাগ করল সূর্যমুখীকে। পরে কুন্দর আত্মহত্যায় তাদের পুনর্মিলন ঘটলেও

কাহিনীটিকে মিলনমূলক বলা যাচ্ছে না। তাদের দুজনের ভবিষ্যৎ জীবন ক্লিষ্ট, কষ্টময় হাসির মত হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুজনের মাঝখানে চিরদিন থেকে যাবে কুন্দনন্দিনীর সরল, নিষ্পাপ, অপচয়িত জীবনের দীর্ঘশ্বাস। 'মধ্যবর্তিনী' কাহিনীতেও স্বামী-স্ত্রীর মিলনসুখের মাঝখানে থেকে যাবে অন্য স্ত্রীর মৃতদেহ। অর্থাৎ তার চেতনা। এইভাবে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বাস্তবিক জীবনের অন্তস্তলে যে বুদ্ধির অতীত সূক্ষ্ম ও রহস্যময় চেতনাটি রয়ে গেছে, তাকে যুক্তির আলোয়, তর্কমুখর গদ্যে বা বিশ্লেষণধর্মী বাক্যে ব্যাখ্যা করা যায় না,—তাকে ফোটাতে গেলে অন্য সুরে কথা বলতে হয়, অন্যভাষায়।

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠবে সর্বসাধারণের কাছে ঐ মাধ্যমে কতদূর পৌঁছানো যায়? গল্পের ভিতরকার গল্পটুকুকে তারা খোঁজ করে টেনে নেবে কি কাছে? ডেকে নেবে কি কথার ভিতরকার সেই কথাকে,—যা তাদের মনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে নিভৃতে, চর্চার অভাবে ধূলধূসরিত বর্ণে? সাধারণ পাঠক, যাঁরা প্রচুর পাঠের প্রভাবে দীক্ষিত নন, তাঁরা কি অলৌকক ভাষা ও ভাবের পরিমণ্ডলে বাধাগ্রস্ত হবেন?

অল্প শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই সমস্যার কথা ভুলে যাবার নয়। কিন্তু যাঁরা শিক্ষার আরও নিম্নতর স্তরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যাঁরা তথাকথিত নিরক্ষর,—তাঁদের কাছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই মায়াময়, অলৌকিক উপাদান অনেক সহজে, স্বতস্ফূর্তভাবে গৃহীত হয়। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে মিথ-এর ব্যবহার আমাদের কাছে অবিশ্বাসের স্তরে। সেইখান থেকে হাত বাড়িয়ে অনেকটা শিল্পাস্বাদের জন্য আমরা তাকে, তার জীবনকে ছুঁয়ে ফেলি। কিন্তু সাধারণ নিম্নজ অন্ত্যজ মানুষের কাছে ঐ জীবন ও তার সত্য কি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বাস্তবিক নয়? দৈব-অনুগ্রহ, স্বপ্ন, পুনর্জন্ম ও জীবনের মূল্য গত রহস্য তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সমাহিত নয়। যেভাবে আমরা দৈব-নির্ভর কোন মিথকে অবিশ্বাসের চোখে দেখি, সেইভাবেই তারা দেখে বিজ্ঞানের চমককে। বিজ্ঞান-ই তাদের জীবনে বহুদূরের স্বপ্নময় অলৌকিক হাতছানি।

উঁচু স্তরে মানুষের শুভবোধ ও সদর্থক আকর্ষণও যে নিম্নজ, বঞ্চিত মানুষের কাছে কতখানি দুর্বোধ্য 'আক্রোশ' চলচ্চিত্রে তার নিদারুণ দূরত্ব আমরা অনুভব করেছি। এই যোগাযোগহীনতাকে ঘুচিয়ে দেবার কাজেও অ-লৌকিক কাহিনীর ভাব ও ভাষা সাহায্য করতে পারে, প্রাথমিক ভাবে।

---

১ প্রদত্ত নকশাটির বর্দ্ধিত অংশ অনেক জটিল, বহুবক্র এবং তরঙ্গিত হতেও পারে। এক্ষেত্রে তার বিস্তারিত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক বলে দেওয়া হল না।

নায়কের ব্যাধি

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণ মানুষ সাহিত্যের নায়ক হতে পারে না—এমন একটি মত একদা চালু ছিল, আর কিছুটা যে অনুসৃত-ও হয়েছিল প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে শুরু করে শেক্সপীয়র পর্যন্ত যাবতীয় নাটক তার প্রমাণ। আধুনিক কাল যে এই উন্নাসিকতা ত্যাগ করতে পেরেছে, সেটা তার একটা মস্ত গুণ। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারাকেই ইতিহাসের নায়ক মনে করা হয়—ফলত সাহিত্যেও তার সেই মর্যাদা। খেতের চাষি, কলের মজুর, রাস্তার বেশ্যা—যে-কোন চরিত্রই যে নায়ক হতে পারে, একালের সাহিত্য তা দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নায়কের 'নায়কত্ব' ব্যাপারটা বোধহয় এতেও ঘুচে যাচ্ছে না। নায়ক যে-কোন সামাজিক স্তর থেকেই উঠে আসতে পারে ঠিকই, কিন্তু যে-কোন মানুষ-ই আবার নায়ক হতে পারে না। দস্তয়ভস্কি এক খুনী যুবক-কে উপন্যাসের নায়ক করেছিলেন, আমাদের জানা আছে। সেই সঙ্গে এটাও আমাদের জানা আছে যে, খুনী মাত্রেই সাহিত্যের নায়ক হতে পারে না। নায়কোচিত গুণ তার একটা থাকা দরকার।

সেই 'বিশেষ গুণ'টি এই যে, নায়ক অ্যাভারেজ বা আর-পাঁচটা গড়পড়তা মানুষের থেকে আলাদা। তার আছে এক বিশেষ সমস্যা—আর আমাদের বিচারে সেই সমস্যাটি হল কমিউনিকেশান বা পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সমস্যা। নায়ক অ্যাভারেজের থেকে আলাদা; শুধু তাই নয়, চেতনার যে-স্তর থেকে সে কথা বলে, সমসাময়িক কাল-সমাজ, মনন-মূল্যবোধ তার থেকে একটু ভিন্ন। ফলত দ্বন্দ্ব—ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রতিবেশের; পরিণতি—ব্যক্তির দীর্ণ, খণ্ডিত মানস। দস্তয়ভস্কির রাসকলনিকভ, তলস্তয়ের লেভিন, স্তাঁদালের জুলিয়েন সোরেল, রলঁ্যা-র ক্রিসতফ, রবীন্দ্রনাথের গোরা, নিখিলেশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী—এদের প্রত্যেকে-কেই আমরা দীর্ণ-ক্ষতবিক্ষত হতে দেখি এই একই সমস্যায়।

মনে রাখা দরকার, এটা কেবল একালেরই সমস্যা নয়। আধুনিক উপন্যাসের ওই-সব নায়কের সারিতেই আমরা বসাতে পারি ভারতীয় মহাকাব্যের যুধিষ্ঠির আর রামচন্দ্রকে, গ্রীক নাটকের ঈদিপাসকে, শেক্সপীয়রের হ্যামলেটকে। এরা প্রত্যেকেই পীড়িত হয়েছে সেই সমস্যায়—যাকে আমরা বলেছি কমিউনিকেশানের সমস্যা। তাই আঠার দিনের অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ঠির যখন ধিক্কার দিয়েছেন 'ক্ষত্রিয়াচার পৌরুষ ও ক্রোধকে'—'ঈষৎ হাস্য করে অর্জুন তাকে বলেছেন 'মূঢ়তা'। লঙ্কাযুদ্ধের বিজয়ের পর 'হর্ষধ্বনি' করেছে বানর

সেনারা আর নায়ক তখন সন্তমুক্ত পত্নীকে দেখিয়েছেন 'মাংসশোণিতকর্দমে দুর্গম যুদ্ধভূমি। এই স্থানে বিস্তর বানর ও রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে।' বীভৎস ভয়ঙ্কর একটা সত্যকে কেন টেনে বার করতে চায় ঈদিপাস—ইয়োকাস্তার কাছে তা খুব স্পষ্ট হয় নি। ঠিক যেমন রাজার ছেলে হ্যামলেটের কাছে জীবন কেন এক বন্ধ্যা অন্তরীপ ('Sterile promonotory') মনে হবে তা-বোঝার ক্ষমতা পার্শ্বচরের ছিল না। রাজপুত্রের 'man delights me not'—উক্তিতে সে তাই বোধ করেছে কৌতুক।

*　　　*　　　*　　　*

অতএব সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে।

পাঁচজনে মিলেমিশে থাকার তাগিদ থেকে যার উৎপত্তি—সেই সমাজ-ই জন্ম দিয়েছে এই সমস্যার। এটা নৈরাশ্যের কথা নয়। মানুষ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার কোন অবকাশ এখানে নেই। কারণ মানুষ সামাজিক জীব—এই সত্যটার চাইতেও আরও বড়, আর গভীরে নিহিত সত্যটা এই যে, সমাজের মধ্যেই একমাত্র ব্যক্তির ব্যক্তিক বা আত্মিক বিকাশ পুরোটা সম্ভব। বিরোধের গোড়া এইখানে।

ব্যক্তির তাগিদ আছে নিজেকে প্রকাশের; আর এই প্রকাশ—তা যেহেতু নিজের মধ্যে নয়—বাহিরের সঙ্গে—অবকাশ থেকে যাচ্ছে বিরোধের। কারণ বাহিরের জগত অনেক সময়ই প্রতিকূল; প্রতিবেশ কখনও নির্দয়, কখনও বা মূঢ় এক বাতাবরণ—যেখানে no man cares who is his neighbour/Unless his neighbour makes too much disturbance' (এলিয়ট); অথবা 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা…'। (জীবনানন্দ)

এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তির চেতনা-স্তরের সঙ্গে সাধারণের চেতনা স্তরের একটা ফারাক থেকেই যায়। সময়-সমাজের কাছে যত ঋণ-ই ব্যক্তির থাকুক না কেন—ব্যক্তির ভাবনা যে কখনও কখনও তার কালের গণ্ডী ছাপিয়ে যায়—এমন নজির ইতিহাসে কম নেই। মার্কসের তিনশো বছর আগে শেক্সপীয়র যেদিন সোনা-কে 'common whore of mankind' বলতে পেরেছিলেন, তখন সেটা নিশ্চয়ই তাঁর সমকালের গড়পড়তা ভাবনার থেকে আলাদা ছিল। বিপ্লবে সামিল হতে না পারলেও তলস্তয় যে বুঝেছিলেন, ব্যক্তি-সম্পত্তি-ই যাবৎ অনিষ্টের মূল, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে, ভাবনার দিক থেকে তিনি ছিলেন আগুয়ান মানুষ।

অতএব ব্যক্তির ভাবনা যে সময় বিশেষে সাধারণের থেকে একটু ভিন্ন খাতে বয়, মেনে নিতে-ই হবে। আর এটা মেনে নিলে, বিরোধ-বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিটাকেও খুব সহজে অস্বীকার করা যায় না। স্বাদেশিকতার নামে একটা নেশার মাদকতাও যে যুবশক্তিকে-

জড়িয়ে ধরেছে—এ-উপলব্ধি সন্দীপের না থাকলেও নিখিলেশের ছিল। অতএব কে অস্বীকার করবে তার যন্ত্রণা? কোন্ ঔচিত্যবোধের দোহাই ঠেকাতে পারে এই ব্যক্তির একা হয়ে যাওয়া?[১]

ইতিহাসের গতি, বলা হয়ে থাকে, বাঁকা। ব্যক্তি যেমনটি চায়, সমাজ বা সামাজিক সম্পর্কের যে-মডেলটি তার মনে আঁকা থাকে তেমনটি ঘটে না। কিছু চ্যুতি, কিছুটা অন্যরকম পরিণতি অবশ্যম্ভাবী; আর তাই ব্যক্তির আত্মবিচ্ছিন্নতার বোধও একেবারে ভিত্তিহীন বলা চলে না। ধনবাদী সমাজে, মার্কস দেখিয়েছিলেন, শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা। যন্ত্র শ্রমিকের নয়; তার শ্রমে যা উৎপন্ন—তার মালিক-ও সে নয়; বণ্টনব্যাপারেও তার কোন হাত নেই। অতএব শ্রমিক তার কাজের থেকে বিচ্ছিন্ন। আত্মপ্রকাশের তাড়না যার আছে সে মানুষ যদি দেখে, প্রতিবেশ তার বাধা, জীবনযাপনের প্রতিটি ধাপেই যদি সে চূর্ণ, খণ্ডিত হতে দেখে তার আদর্শকে—জীবন তো তার কাছে মনে হতেই পারে বোঝা; ধনবাদী সমাজের শ্রমিকের মতো সে-ও তো ভাবতে পারে এ-জীবনটা তার নয়: It is not his own but somone else's। তাই সার্ত্র যখন বলেন, জীবন একটা 'predicament' অন্তত ধনবাদী সমাজের প্রেক্ষিতে দেখলে, কিছু সত্য তার মধ্যে থেকেই যায়।[২] যদিও তার পরও কিছু বলার থাকে। বাস্তবকে বাস্তব হিসাবে মেনে নেওয়া এক, কিন্তু তা-নিয়ে 'কাল্ট' তৈরি করা ভিন্ন বিষয়। তাই বিচ্ছিন্নতা, কমিউনিকেশানের সমস্যা—জীবনেরই ক্ষেত্রজ এক সামাজিক সমস্যা—এইটুকু মেনে নিতে বাধা নেই, কিন্তু মানুষ স্বভাবত বিচ্ছিন্ন—এমন ঘোষণায় অন্যরকম একটা ইংগিত এসে যায়।

১। এখানে একা হয়ে যাওয়া বলতে আধুনিক অস্তিত্ববাদী ভাবনায় যে 'বিচ্ছিন্নতা'-র কথা বলা হয়, ঠিক তা বোঝাচ্ছে না। অস্তিত্ববাদীদের মতে জগত-জীবন চালিত হয় এক ভ্রান্তি বা অ্যাবসার্ডিটি-র দ্বারা। ব্যক্তিমানুষ এই জীবনে পরবাসী—Stranger। এখানে যে-দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে, তার জন্ম ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের সংঘাত থেকে। সে সমাজেরই এক জন। কিন্তু তার ভাবনার সঙ্গে সাধারণের ভাবনার মিল ঘটছে না। সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কোন একটি ঘটনার পরিণতি, সে যেমনটি চাইছে, তেমনটি ঘটছে না। ফলে তার মধ্যে আসছে বিচ্ছিন্নতা-বোধ।

২। প্রশ্ন উঠতে পারে জীবনকে predicament ভেবে নেওয়া মানে একটা সিদ্ধান্তে এসে যাওয়া। জীবনকে বদলানোর জন্যে মানুষের যাবতীয় প্রয়াস ও সংগ্রামকেই তাহলে অস্বীকার করা হয়। এখানে একটি বিশেষ পরিস্থিতি—সমাজ বদলের কোন আয়োজন যেখানে ঘটছে না—তেমনি এক বন্ধ্যা পরিস্থিতিতে ব্যক্তির ভাবনার কথা বলা হয়েছে। সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার চাপে এই ভাবনারও যে বদল হয় ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। যদিও এই সে-অবস্থাতেও ব্যক্তির অন্য সংকট থাকে। রুশ বিপ্লবের কালে ব্লক-এর মনেও যে সাময়িক দ্বিধা দেখা দিয়েছিল, আমাদের জানা আছে।

হিন্দি ছবি, বাঙালি দর্শক ও সমাজ

কানাই সেন

হিন্দি ছবি—জনসংযোগ সঞ্চারণে :

সাম্প্রতিক কালে জন সংযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম চলচ্চিত্র। সব স্তরের মানুষের কাছে এ ধারাটির গুরুত্ব এবং প্রভাব সীমাহীন। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে সুস্থ প্রগতিশীল জন সংযোগের সেতু। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ভাষাগত বিভিন্নতার যে দুরত্ব-দেয়াল রয়েছে একমাত্র চলচ্চিত্রের ভাষার দ্বারা তা ভেঙে দেয়া সম্ভব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশে হিন্দি চলচ্চিত্রের মধ্যমটি যে-ভাবে গৃহীত হয়েছে তাতে এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দি চলচ্চিত্রের দর্শক সংখ্যা যে-ভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে তাতে ভাষার প্রতিবন্ধকতা যে জনসংযোগ-সঞ্চারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় নয় একথা স্বীকার করতেই হবে। শিল্পগুণের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার না করে এ সত্য স্বীকার করা যায় যে হিন্দি ছবি বাংলাদেশের দর্শককে যে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে তার তুলনায় বাংলা ছবি কিম্বা জনসংযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলি দুর্বল এবং অকিঞ্চিৎকর। বিগত দুই দশকের মধ্যে হিন্দি ছবি বাঙালী দর্শকের মনে যে গভীর প্রভাব ফেলেছে তা তুলনাহীন। সমাজতাত্ত্বিকের বিচারে হয়তো এর কারণ, তাৎপর্য কিম্বা যথার্থ পরিসংখ্যান ও সুদূর প্রসারী ফল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভব। কিন্তু সাধারণ ভাবে জনসংযোগ সঞ্চারণের ক্ষেত্রে এই চলচ্চিত্রের প্রভাব সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

হিন্দি ছবি—বাঙালী দর্শক :

বাঙালী দর্শক সমাজে উত্তাল ঢেউ তোলা হিন্দি ছবির দর্শকদের বয়স, চরিত্র, পেশা, বৃদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে এর বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের দিকটি সহজেই চোখে পড়বে। বিশেষ বয়স, রুচি এবং মানসিকতার দর্শকের কাছে এর সীমাহীন আবেদন সত্যই অভূতপূর্ব। বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের রুচিবোধ. বিচারবুদ্ধি, সুস্থ মানসিকতার সঙ্গে তথাকথিত হিন্দি ছবির বিষয় ভাবনার দুরত্ব অনেক। তবুও অনিবার্য ভাবে বহু বিচিত্র এবং বিপরীত ভাবনার মানুষ নিয়ে হিন্দি ছবি এক বিশাল দর্শক শ্রেণী গড়ে তুলেছে। এই চলচ্চিত্র দর্শকের মধ্যে যেমন আছে উঠতি বয়সের তরুণ এবং যুবক সম্প্রদায়, বেকার, অর্ধবেকার,

জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত, হতাশাগ্রস্ত, উচ্ছৃঙ্খল সম্প্রদায় তেমনি রয়েছে নিম্ন-মাঝারি-উচ্চ আয়ের শ্রমিক ও ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ; ডাক্তার-উকিল-শিক্ষক-অধ্যাপক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী এবং প্রায় সব শ্রেণী-বয়স-বৃত্তির মহিলারা। এদের প্রমোদ উপভোগের দৃষ্টিকোণ এবং মানসিকতা নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র। কিন্তু এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য যে ভিন্ন বৃত্তি, ভিন্ন চিন্তা এমন কি পরস্পর বিপরীত ভাবনার মানুষকেও এই মাধ্যম অনিবার্য ভাবে আকর্ষণ করে। বিশেষ পর্যবেক্ষণ এবং সমীক্ষায় এই বিপুল দর্শক শ্রেণীর স্তর বিন্যাস ও মানস-বিভিন্নতা নির্দেশ হয়তো সম্ভব নয় কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক মানুষ যে এর মধ্যে তাদের সহজ আনন্দ, তৃপ্তি এবং উল্লাসের উপকরণ খুঁজে পেয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। এ তৃপ্তি বা আনন্দ-রসের নান্দনিক মূল্য কতটা, সহৃদয় চিত্তের কত গভীরে এর আবেদন সে বিচারে না গিয়েও একটা সত্যই স্বতঃই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে—হিন্দি সিনেমার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বৃহত্তর মানুষের সম্পর্ক আজ অচ্ছেদ্য।

হিন্দি ছবি—দর্শক আকর্ষণের কেন্দ্র :

হিন্দি চলচ্চিত্রে পরীক্ষামূলক আঙ্গিক, উচ্চতর ভাবনা, জীবনের গভীর সমস্যা তুলে ধরার বিক্ষিপ্ত কিছু চেষ্টা থাকলেও এ-জাতীয় ছবির সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে খুবই কম। বিশিষ্ট ফর্মুলা বা প্রকরণ নির্ভর করেই অধিকাংশ (শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ) হিন্দি ছবি তৈরী হয়। কারণ ফর্মুলা নির্ভর ছবির দর্শক সম্পর্কে প্রয়োজক-পরিচালকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিশ্চিন্ত। ছবি নির্মাতাদের নিশ্চিন্ততা এবং বিশাল শ্রেণীর দর্শকের গ্রহণ-প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে এই শ্রেণীর ছবিগুলি বিশ্লেষণে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সহজেই নির্দেশ করা যায়।

(ক) প্রত্যাশা-পূরণ এই জাতীয় হিন্দি ছবির প্রাথমিক শর্ত। বাস্তব জীবনে যে অভাববোধ, নৈরাশ্য, যন্ত্রণা, অস্থিরতা রয়েছে তা থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তির প্রবল সম্মোহন রয়েছে হিন্দি ছবিতে। নায়ক যে-কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন অতিজাগতিক শক্তির প্রভাবে সে অপরাজেয়। সাময়িক পরাভব থাকলেও পরিণামে তার জয় অবধারিত। জীবনের সমস্ত প্রত্যাশা, অবাস্তব স্বপ্ন-বাসনা এক শ্রেণীর দর্শক দেখতে পায় হিন্দি ছবির মধ্যে। এবং এই শ্রেণীর দর্শক সংখ্যাই সর্বাধিক। নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ-দূরত্ব কখনোই দীর্ঘস্থায়ী নয়। দর্শকের মানসিক উৎকণ্ঠা শেষ হয় নায়ক-নায়িকার মিলন মধুর উষ্ণতায়। অবচেতন মনের কামনা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতায় দর্শক সহজেই এতে আকৃষ্ট হয়।

(খ) বীর-পূজার মানসিকতাও হিন্দি চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। এ কারণেই বিশেষ অভিনেতার ছবির প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। সেই অভিনেতার

সাজ-পোশাক, আচার-আচরণ, বিশেষ ভঙ্গি অনুকরণে দর্শকের প্রবল আগ্রহের মধ্যেই তাদের অনুরাগের প্রকাশ ঘটে। এই নায়ক-নির্ভরতার পথেই সাম্প্রতিক হিন্দি ছবির জনপ্রিয়তার ধারাটি প্রবলতর হয়েছে।

(গ) সম্ভোগ-সম্মোহনের যে বিপুল পশরা হিন্দি ছবিতে থাকে তা এই ছবির আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র। বর্ণময়তা, সাজ সজ্জা, পরিবেশ সব কিছুর মধ্যেই এক অলীক জগতের বার্তা। নায়ক-নায়িকার রূপ-যৌবন, বিলাস-ব্যসনে বেদনা-আঘাত-দারিদ্র্য কোন ছায়াই ফেলতে পারে না। যেন রূপকথার জগত বাস্তব পৃথিবীর পটভূমিতে বায়বীয় উপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ। বাস্তব জীবনের ক্লান্তিকর সমস্যা, জটিল জীবন-যাত্রা, অস্থির জীবন-বোধের মধ্যে এ জাতীয় দৃশ্যসম্ভার দর্শককে কিছু সময়ের জন্য সম্মোহিত করে।

(ঘ) মারদাঙ্গা, বীভৎস পাশবিকতা, উদ্দাম জীবনচর্চা, যৌনআবেশ-ভরা দৃশ্যগুলি দর্শকের অবচেতন মনের গোপন প্রবৃত্তিগুলোকে জাগাতে সাহায্য করে। অপরিতৃপ্ত জীবনবোধ, অপরিণত, উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতা বারবার এই জাতীয় দৃশ্যগুলির মধ্যে মানসিক তৃপ্তি খোঁজে।

(ঙ) এ ছাড়া নাচ গানের বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য, কিশোর-প্রেমের বর্ণময়তা, বিজ্ঞাপন ও প্রচারের বিভিন্ন কলাকৌশল বিভিন্ন ভাবে হিন্দি ছবিকে জনপ্রিয় করছে।

হিন্দি ছবির দর্শকের শ্রেণী বিন্যাসে দেখা গেছে প্রায় সব শ্রেণীর দর্শকের কাছেই কোন-না-কোন কারণে ছবিগুলির আকর্ষণ রয়েছে। কেবল আমোদ-উপকরণ হিসেবে বুদ্ধিজীবী মহলে এর জনপ্রিয়তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। চিন্তাভাবনার জটিলতা থেকে মুক্তির ইচ্ছায় 'কেবল দেখার জন্যই দেখা' এই ভাবনার দর্শকসংখ্যা আজ আর কম নয়। পরোক্ষ ভাবে বা নেতিমূলক মনোভাবে এই শ্রেণীর দর্শকের সংগে হিন্দি ছবির সংযোগ-সেতু গড়ে উঠেছে।

হিন্দি ছবির বস্তু সম্ভার কি ভাবে ভিন্ন শ্রেণীর দর্শককে আকর্ষণ করে? সেই সব বস্তু ফর্মুলা-নির্ভর জনপ্রিয় ছবিতে কোন আনুপাতিক হিসেবে থাকে তার একটা সম্ভাব্য পরিসংখ্যান দেয়া হলো—

হিন্দি ছবির মোট উপকরণ (১০০ হিসেবে)

(ক) গল্প	(খ) গান	(গ) নাচ/ক্যাবারে ইত্যাদি	(ঘ) ধর্ষণ
১০-১৫	১০-১৫	১০-১৫	৫-১০
(ঙ) যৌন উত্তেজক দৃশ্য	(চ) ভিলেন এবং তার দলের কাজ-কর্ম	(ছ) নিষিদ্ধ বস্তুর লেনদেন	
১৫-২০	১৫-২০	৫-১০	

(জ) বিভিন্ন কৌশলে মারামারি	(ঝ) রঙ্গ রস	(ঞ) করুণ রস
২০-২৫	৫-১০	৫-১০

ফর্মুলা-নির্ভর হিন্দি ছবির বস্তু-সম্ভারের আনুপাতিক হিসেব দেয়া হলো। এ জাতীয় ছবির ক্ষেত্রে এই বিভাগগুলির উপস্থাপন নিশ্চিত। তবে আনুপাতিক হিসেবের হের-ফেরের ক্ষেত্রে কোন এক বা একাধিক বিষয়-উপস্থাপনের সময় বাড়ে কিম্বা কমে। হিসেবটি যথাযথ নয়। কিন্তু হিন্দি ছবির মূল প্রবণতা এবং দর্শক আকর্ষণের কেন্দ্র-অনুসন্ধানে এই জাতীয় একটি পরিসংখ্যান জরুরী।

হিন্দি ছবি—জনপ্রিয়তার দুর্বার গতি।

শহর, শহরতলী এবং বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে হিন্দি ছবির প্রবল জনপ্রিয়তা ষাটের দশকের গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। তখন হিন্দি ছবির দর্শক সংখ্যার বৃহত্তম অংশই ছিল অপরিণত মনের তরুণ- তরুণী, নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী সম্প্রদায় এবং স্বল্পসংখ্যক অন্যমনের মানুষ। কিন্তু সত্তর দশক থেকে হিন্দি ছবি তার দর্শক হিসেবে পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র-বিত্ত-ভাবনার মানুষকে। এই জনসংযোগ সাফল্যের ক্রমিক অগ্রগতি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। শহর, শহরতলী, শিল্পাঞ্চল ছাড়িয়ে হিন্দি ছবির জনপ্রিয়তার দুর্বার গতি গ্রামীণ জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রেও হিন্দি ছবির ভূমিকা আজ অপরিহার্য। গ্রামের মানুষের অন্যতম প্রধান প্রমোদ-উপকরণ পেশাদার যাত্রা-অভিনয়ের আজ একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দি সিনেমা। বাংলা পারিবারিক কাহিনী-চিত্রের প্রভাব গ্রাম বাংলার এক বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের ওপর থাকলেও হিন্দি ছবি ভাষার দূরত্ব অতিক্রম করে আজ সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সংযোগ সেতু গড়ে তুলেছে। একটি পরিসংখ্যানের সাহায্যে এই বিষয়টি তুলে ধরা যেতে পারে।

পাঁচ বর্গ কিলোমিটার স্থান

(শহর এবং গ্রাম দুই পরিবেশই রয়েছে প্রান্তবর্তী স্থান গুলিতে।

সিনেমা হলের সংখ্যা ৬	বাংলা ছবি চলেছে (৫২ সপ্তাহের হিসেব)	হিন্দি ছবি চলেছে (৫২ সপ্তাহের হিসেব)	দর্শক সংখ্যা (১০০ জন হিসেবে) বাংলা ছবি	হিন্দি ছবি
১ *	২	৫০	৫	৯৫
২ *	৫ ক	৪৭	১৫	৮৫
৩ * *	৭ ক	৪৫	২০	৮০
৪ * *	৫	৪৭	৮	৯২
৫ * * *	৮	৪৪	২০	৮০
৬ * * *	১০ ক	৫২	২৫	৭৫

নির্দেশিকা=* শহর প্রান্তসীমায় অবস্থিত সিনেমা হল।

** শহর ও গ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সিনেমা হল।

*** গ্রামের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত সিনেমা হল।

'ক'—হিন্দি ছবির আদলে তৈরী বিশেষ বাংলা ছবি। ২, ৩, ৬ চিহ্নিত হলে 'ক' জাতীয় ছবি দেখানো না হলে বাংলা ছবির প্রদর্শন সময় কমবে এবং হিন্দি ছবির প্রদর্শন সময় বাড়বে—সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটবে।

হিন্দি ছবি—অন্য দিক:

জনসংযোগের ক্ষেত্রে হিন্দি ছবির সাফল্য প্রশ্নাতীত। দর্শকের মনোরঞ্জনের পথ ধরে, স্বপ্ন আশা পূরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হিন্দি ছবির সাফল্যের গতি অপ্রতিহত। তবে সব হিন্দি ছবিই সংযোগ সঞ্চারণে সমান সফল নয়। পারিবারিক জীবন কেন্দ্রিক ছবি, লঘু হাস্যরস, মিষ্টি মধুর প্রেম কাহিনী আশ্রিত ছবি দর্শকদের কাছে সমাদৃত হলেও উদ্দাম জনসংযোগের ধারাটি এখানে স্তিমিত। সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে দেখাবার একটা প্রবণতা অধুনা কিছু হিন্দি ছবিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণের চেনা ভাষা, অতি পরিচিত ফর্মুলা নির্ভরতা না থাকায় ছবিগুলি হিন্দি ছবির বৃহত্তর দর্শক শ্রেণীকে আকর্ষণে সফল হচ্ছে না। সেই সমস্যাই পরিচিত উপকরণ-মাধ্যম বা ফর্মে পরিবেশিত হলে দর্শকের সংগে সংযোগ সঞ্চারণ সম্ভব হয় অনায়াসে। এ প্রসঙ্গে দু'টি পরিচিত এবং বিতর্কিত ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা ছবি দু'টির ভিত্তি। এর একটা ছবিতে সামাজিক সমস্যা অত্যন্ত তীব্র—'আক্রোশ' এবং অন্যটিতে তীব্রতা পেয়েছে রাজনৈতিক সমস্যা—'মেরী আওয়াজ শুনো।' 'আক্রোশের' নায়ক সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুখর নয়। তার বিক্ষোভ অন্তরীন। ভাষাহীনতাই তার ভাষা। তাই সে মৌন। জীবনের চূড়ান্ত অসহায় মুহূর্তে সে জ্বলে উঠেছে ধ্বংস মূর্তিতে। কিন্তু সে ধ্বংসের আগুন সমাজকে স্পর্শ করেনি। পুড়িয়েছে আত্মীয়কে—আত্মাকে। সীমাবদ্ধতা এবং অসহায়ত্ব বড় হয়ে উঠেছে। নায়ক কিম্বা তার সম্প্রদায়ের মানুষের সমস্যা সাধারণ দর্শকের সঙ্গে কমিউনিকেট করা সম্ভব হয় নি। সমস্যার ভাষাও এখানে অ-মুখর। জনসংযোগ সঞ্চারণে এ ছবি কোন মতেই সফল নয়। অন্য দিকে 'মেরী আওয়াজ শুনো'তে বৃহত্তর রাজনৈতিক সমস্যা, বুর্জোয়া শাসন কাঠামোয় মানুষের অসহায়ত্ব, তথাকথিত এস্টাবলিসমেন্টের বিরুদ্ধে আঘাত করার সীমাবদ্ধতা ও ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখানো হয়েছে। সমস্যা নিঃসন্দেহে গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে ফর্মুলা—নির্ভর ছবির আঙ্গিকে।

স্বভাবতঃই সমস্যার সঙ্গে দর্শকের সংযোগ সঞ্চারণে কোন বাধা হয় নি। বৃহত্তর দর্শক আকর্ষণের জন্য হিন্দি ছবিকে অনিবার্য ভাবেই বিশেষ রীতি নির্ভর হতে হবে। পরিপূর্ণ ফর্মূলার সঙ্গে টেকনিক্যাল দিক, দৃশ্য সংস্থান, অভিনয় ইত্যাদি যদি উচ্চাঙ্গের হয় তবে জন সংযোগের ক্ষেত্রে সে ছবির সাফল্য সংশয়াতীত। 'শোলে' ছবির সাফল্যই তার প্রমাণ। বাংলা তথা ভারতে এর প্রদর্শন সময় এবং দর্শক সংখ্যা সম্ভবতঃ সর্বকালের রেকর্ড। সুতরাং হিন্দি ছবির জনসংযোগের ভাষা তার নিজস্ব—বিশিষ্ট। সেই বিশেষ ভাষায় বলা হলেই তা গ্রহণে বৃহত্তর দর্শক আন্তরিক হবে—অন্যথায় নয়।

হিন্দি ছবি—জনসংযোগ-সঞ্চারণের কোন্ দিগন্ত :

হিন্দি ছবি জন সংযোগ সঞ্চারনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে এ তথ্য স্বীকৃত। কিন্তু দর্শক হিসেবে হিন্দি ছবি যে বিপুল জনসমাজ পেয়েছে তাদের কমিউনিকেশানের কতগুলি নির্দিষ্ট বাধাধরা ফর্মূলা আছে এই আকর্ষণের মধ্যে সদর্থক ও গঠনমূলক চিন্তার ভূমিকা একান্তই গৌণ। এর ফলে রুগ্ন ভাবনার সঞ্চারণ ছাড়া অন্য কোন প্রাপ্তি ঘটে নি। জনসংযোগ সঞ্চারণে সার্থক ভূমিকা নিতে হলে হিন্দি ছবিকে তথাকথিত ফর্মূলা নির্ভরতার বাইরে দর্শককে নিয়ে যেতে হবে। দর্শক-আকর্ষণের পদ্ধতিতে ঘটাতে হবে মৌল পরিবর্তন। অন্যথায় সাময়িক উদ্দাম উত্তেজনার পরিণামে প্রবলতম অবসাদ ছাড়া হিন্দি ছবি আর কিছুই দিতে পারবে না। কিন্তু হিন্দি ছবি যদি জন সংযোগ সঞ্চারণে সদর্থক ও যথার্থ গঠনমূলক ভূমিকা নিতে পারে তবে এর অবদান বৃহত্তর জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হবে।

নয়া রূপকথার শিকড

তুহিন চট্টোপাধ্যায়

গৃহযুদ্ধের তৎপরতা সাংস্কৃতিক পরিবেশমণ্ডিত আবোহাওয়ায় অত দ্রুত, অত অভিনয়-বহুল ভাবে, লক্ষ্য করা যায় না। এখানে তলে তলে চলে পরিবর্তন। আগুনের প্রসার সনাতন মধ্যবিত্ত বাঙালীর পোশাকে আগুন না ধরিয়েও, উষ্ণতার স্বাদ এনে দেয়। বছর ১৫ আগেও জিন্‌স-বিপ্লবের আঁচ অধিকাংশ কলচর্ড বাঙালী পাননি। আজ যখন ঘরের, ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞাপন হোর্ডিং থেকে নেমে এসেছে, তখন রকমফেরের আঠা স্পর্শ করা যায়। এইভাবেই তলে তলে ঘটে গেছে নিঃশব্দ গোপন বিপ্লব। গুরুপাঞ্জাবীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছে। ফের নিঃশব্দে উধাও হয়েছে তার মোহিনীদৃষ্টি। বচ্চনকাট চুল এসেছে। এলায়িত বাঙলাসংস্কৃতিতে এসে পড়েছে স্থবির চিন্তাবিরোধী হাওয়া। শরৎচন্দ্রের পিয়ারী আজ আর তত আবেগপ্লুত নয়। এখন নাইটক্লাবে ড্রামবিটের তালে তালে নৃত্যপটু নর্তকী জীনত আমনের রহস্যই সবচেয়ে চমকপ্রদ।

হিন্দী সিনেমার দর্শক :

বাণিজ্যিক হিন্দি সিনেমায় প্রস্তুত হয়েছে বাস্তবিক এক শ্রেণীবিহীন দর্শকসমাজ। এত বেশী চরিত্রর দর্শক, যাদের একাংশ শিক্ষিত এবং অন্য অংশ লুমপেন—তারা দুদল কি ভাবে একই সাথে মুগ্ধ হচ্ছে, তা চিন্তার বিষয়। বিশেষত সংস্কৃতিপ্রেমী বাঙালী আবার একটু বেশী মূল্যবোধ আক্রান্ত। বিশ্লেষণমুখী হলে, একটি হিন্দী চলচ্চিত্র থেকে, আমরা বেশ কিছু পরস্পরবিরোধী গল্প আবিষ্কার করতে পারব। এই পরস্পর বিরোধীতাকেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় 'বাস্তবতাবর্জিত'। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, চলচ্চিত্রে বলতে আমরা কি বুঝি? কোন বিশেষ একটি ঘটনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের কিছু মুহূর্তই চলচ্চিত্রর বিষয়। এখন, ঐ চরিত্রেরা যখন কিছু বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অনুকরণে তৈরী, তখন তাকেই আমরা বলি বাস্তবতা। যেমন, একটি গায়কের জীবন। অথবা, একজন পলাতক রাজনীতিজ্ঞর মৃত্যু। অথবা, ব্যবসায়ে একজন ভিক্ষুকের পণ্টিয়াক লাভ। এর মধ্যে যদি দেখা যায় যে, নায়ক=গায়ক+পলাতক রাজনীতিজ্ঞ+ব্যবসায়ী ভিক্ষুক এবং ঘটনা=গায়কের জীবন+রাজনীতিজ্ঞর মৃত্যু+ভিক্ষুকের পণ্টিয়াক লাভ, তাহলেই আমরা সাধারণভাবে তাকে বলি অবাস্তব। আসলে তাকে বলা উচিত বাস্তবতার বিভিন্ন প্রতীকের মিশ্রণে একটি ফ্রেম আবদ্ধ যা, তাই।

অতি জনপ্রিয় ছবি 'মুকাদ্দর কি সেকেন্দার' চলচ্চিত্রটি এক লড়াকু শিশুর উন্নতির চূড়ান্তে পৌছন এবং আত্মত্যাগ বিষয়ক চলচ্চিত্র, প্রথমত। দ্বিতীয়ত, একজন অশিক্ষিত যুবকের ব্যর্থতার চলচ্চিত্র। তৃতীয়ত, একটি বাঈজীর ঔদার্য বিষয়ক। চতুর্থত, একজন ভাল গায়কের ছবি। পঞ্চমত একজন ভাল গায়িকার ছবি। এইভাবে, এই ছবিটি বিভিন্ন অংশে বিছিয়ে আছে। একজন লুমপেন দর্শকের কাছে এর নায়ক একজন ঝকঝকে লুমপেন। একজন রোমান্সপ্রিয় যুবতীর কাছে এর নায়ক একজন দেবদূত। এবং একজন সিনিকের কাছে এটি একটি মিথ্যাভাষণ, যা বর্ণময়। সুতরাং এত বেশী সংখ্যক দর্শকের কাছে এই ছবি পৌছচ্ছে, কারণ, এতো বেশী ধরনের চরিত্র-বিভাজন এই ছবিতে সম্ভব। ঘটনাও কখনোই স্থির থাকছে না। মূল ঘটনাকে ছাপিয়ে উঠছে বিভিন্ন ঘটনার শাখা। ফলে মূল বিষয় বলেই কিছু থাকছে না। একটি কাল্পনিক ঘটনা ভাবা যাক। একজন গাড়ী কিনল। গাড়ীটা খারাপ হওয়ায় সে গ্যারেজে গাড়ীটা পাঠিয়ে দিল। গ্যারেজের মালিক দুঃশ্চরিত্র। সে বেশ্যাবাড়ি যায়। বেশ্যাটি খুব ভাল গান গায়। এবং সম্প্রতি ডাকাতরা তাকে তুলে নিয়ে যায়। ততদিনে গাড়ীটা মেরামত হয়েছে। নায়ক গাড়ী নিয়ে বেশ্যাটিকে বাঁচায় এবং নতুন জীবনের পথ দেখায়। ঘটনার এই যে বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং যে সমন্বয়মুখীতা, তাই হিন্দী চলচ্চিত্রর মূল বিষয়। এ সম্পর্কে হাসির এবং একাধারে তাত্ত্বিক ছবি সায়ে পরঞ্জায়ের 'চশমে বদ্দুর' বর্তমান প্রবন্ধে তা আলোচিত হবে।

মুডের বিস্তার :

ভারতের নাট্যশাস্ত্রে রস নয় প্রকার। ক. শৃঙ্গার খ. করুণ গ. বীর ঘ. বীভৎস ঙ. হাস্য চ. রৌদ্র ছ. ভয়ংকর জ. অদ্ভুত ঝ. শান্ত।

যে কোন হিন্দী চলচ্চিত্রর কাহিনীতে এই ৯টা রসের কমপক্ষে ৫, বেশী পক্ষে ৯টিই ব্যবহৃত হয়। এর ফলে, যে দর্শক বীভৎস রস পছন্দ করেন না—তিনি হাস্যতে তৃপ্ত হচ্ছেন। সুতরাং অধিকশ্রেণীকে সবসময় কমিউনিকেট করা যায়। আধিভৌতিক ছবি 'গেহরাই' এর নায়িকা পদ্মিনী কোলাপুরে, যে প্রেতআশ্রিতা। এই ভয়ংকর রসই ছবিটির মূল মুড। কিন্তু এর পাশাপাশি আছে যৌনতা—শৃঙ্গাররসভুক্ত, যেখানে তান্ত্রিক পদ্মিনীকে নগ্নভাবে বলি দিতে উদ্যত। আছে বীররস, পদ্মিনীর ভাই তাকে তান্ত্রিকের কাছ থেকে উদ্ধার করে আনে। মা ও বাবার স্নেহ আছে, সেখানে মূলরস করুণ। এবং ইতস্তত: হাস্যরস আছে, যা সব হিন্দীছবিতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত স্নিগ্ধসাধুর কৃপায় মুক্তি—যা শান্তরস সম্পন্ন।

গুটিকয়েক বাঙালীদর্শক ও ইন্সাফ কা তরাজু :

বাঙালীর কালচারাল সিটি এই কলকাতায় গতির বোরডমের বদলে এসেছে স্থবিরতার

ছোঁয়া। স্কুল-কালেজ-আপিসমুখো পাবলিকের ব্যস্ততা বাস ধরা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু গ্রামীণ চণ্ডীমণ্ডপজাত তরজার আসর আজ দূরদর্শনের পর্দায় এসেছে। সুতরাং একদিকে শহুরে আসবাব, চিন্তায় মুক্তি ও অন্যদিকে অবসাদ ; বাঙালীর মোক্ষলাভ পূজাসংখ্যার ভেতর তাই ঘটে থাকে। রাজনীতির অভ্যেস বাঙালীর আছে। এখনো স্বদেশীর গল্পে গায়ে কাঁটা দেয়। ১৫ই আগষ্টের উন্মাদনা চালের দামের বৃদ্ধিতে খুব কমে না। আবার সেদিনকার, এই ৭০ দশকের, নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে গেরস্থ-বাঙালীর একধরনের ভয়, কৌতূহল, উত্তেজনার ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। এর সবচেয়ে বড় হদিশ মিলবে মোহনবাগান +ইষ্টবেঙ্গল+মহামেডানের সমর্থকদের ক্লাবপ্রীতি, যা রাজনীতির বোবা ও অন্ধ দলপ্রীতির সাথেই তুলনীয়। এসবই বাঙালীর শ্লাঘার বিষয়। 'আমরা একটু বেশী মানবদরদী একটু বেশী সচেতন' এই জাতীয়।

'ইন্সাফ কা তারাজু' ধর্ষণবিরোধী একটি ব্যবসায়িক চলচ্চিত্র। এর নায়িকা (জীনত আমন) মডেল গার্ল এবং তার বোন (পদ্মিনী কোলাপুরে) ইস্কুলের ছাত্রী। চতুর ভিলেন (রাজ বব্বর) নায়িকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তাদের আলাপ জোরদার হলে সে নায়িকাকে ধর্ষণ করে। কোর্টে কেস উঠলে আসামীর উকিল দুঁদে বক্তৃতায় প্রমাণ করেন, নায়িকা নীতিজ্ঞানশূন্যা, সে প্রায় নগ্ন অবস্থায় বহু কমোডিটির বিজ্ঞাপনে হাজির হয় এবং সেই আসামীকে সঙ্গম করতে বাধ্য করিয়েছে, তারপর টাকা চেয়েছে। টাকা না পাবার জন্য এখন বিচারালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে। জজসাহেব এতে বিশ্বাস করেন। আসামী মুক্তি পায়। নায়িকা আর তার বোন দূরে, প্রায় নির্বাসনে থাকাকালীন পুনরায় আসামীর মুখোমুখি হয়। এখানে বোনের বস ঐ ভিলেনটি। সে এবার বোনকে ধর্ষণ করে। এতে নায়িকা ভিলেনকে হত্যা করে এবং আগেকার জজসাহেব তার নিজের ভুল বুঝতে পারেন। সুখের ঈশারায় ছবির শেষ।

এইবার বাঙ্গালীর আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে এই ছবির বিশ্লেষণে আসা যাক। অশিক্ষিত লুম্পেন দর্শকরা এইছবি থেকে একটি মোটাদাগের দরদী, প্রতিহিংসাপরায়ণ কাহিনী উপহার পাচ্ছে। একই সাথে তারা যৌনতার দৃশ্যও দেখছে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের কাছে এই ছবি নিছক ব্যবসায়িক হলেও, তারা দেখলেন কেন ? বিশেষত রোমান্সপ্রিয় বাঙ্গালীর কাছে এটি নিঃসন্দেহে একটি রোমান্সবিরোধী চিত্র হিসেবে চিহ্নিত। দেখার কারণগুলি এইরকম : ১. এটি এমন একটি গল্প, যার নায়িকা মডেল। ব্যক্তিগত জীবনের আধুনিকতায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলে বিজ্ঞাপন। (লিরিলের মেয়েটির কথা ভাবা যাক।) ২. যে ভিলেন, সে, চেহারাগত দিকথেকে একেবারেই ভিলেন নয়। সুন্দর, আকর্ষণীয় চেহারা। ব্যবহারেও আভিজাত্যের ছাপ। (এখন ভিলেনের বদলে বিরোধী-

মতবাদের রাজনীতিজ্ঞরাই চিহ্নিত হন যাঁরা অত্যন্ত অভিজাত ও বাকপটু।) ৩. ধর্ষণ-বিরোধী ছবি, সুতরাং মানবিক ছবি। (বাঙালীরা মূল্যবোধের মাঝেই এনটারটেণ্ড হতে চান। রাস্তায় পকেটমারের ওপর অমানুষিক প্রহার বা বাস থেকে মাতালকে নামিয়ে দেওয়াই এর উদাহরণ।) ৪. মুক্তযৌনতার প্রতি আকর্ষণ, কিন্তু এর ফলে সনাতন পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যেতে পারে। তাই কনজারভেটিভ বাঙালী দর্শকসমাজ, পাশ্চাত্যের দর্শকদের মত চলচ্চিত্রে যৌনদৃশ্য সম্পর্কে নির্মোহ থাকতে পারেন না। হালে, 'অপসংস্কৃতি' নামক রাংতার চাকতি প্রস্তুত হবার ফলে অবশ্য শহরের আংশিক বুদ্ধিজীবিরা, যেকোন কিছুকেই এই লেবেল এঁটে দিতে চান। কিন্তু, যে অর্থ নৈতিক কাঠামোয় স্থিতিশীলতাই এই বুভুক্ষু যৌনক্ষুধার্ত প্রজন্ম তৈরী করেছে, সেই কাঠামোর বিরুদ্ধে, এঁরা শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না। তামাশার কথা নয়, আজ বাঙলা সংস্কৃতিতে ব্যবসায়িক হিন্দীচলচ্চিত্রর বীজ অনেক গভীর পৌঁছে গেছে। তাই দেখা যায়, কিশোর-প্রেমিকযুগলের আত্মহত্যাকে, খবরকাগজ (একটি বাঙলাদৈনিক) ও সংবাদবিষয়ক পত্রিকায় (একটি পাক্ষিক) 'এক দুজে কে লিয়ে' এই শিরোনামে ছাপা হতে। শহরসংস্কৃতির সর্বভুকক্ষমতা এবং গ্রামীণসংস্কৃতির ঘরমুখীতার মিশ্রণে, এক ভিন্ন সংস্কৃতি বাঙলায় তৈরী হয়েছে, যার সামনের সারিতে রয়েছে 'অবাস্তব' 'হাস্যকর' 'অপসংস্কৃতিময়' 'বিষাক্ত' হিন্দী সিনেমা!

দুটি চলচ্চিত্রের প্রভাব ও কাঠামো এবং একটি তাত্ত্বিক কমেডি ছবি :

কুরবানী :

কোন অনুষ্ঠান যখন যথেষ্ট সংখ্যক যুবকযুবতীর কাছে পৌঁছচ্ছে না, স্রেফ প্রতিষ্ঠানগত চাতুরিতে আবদ্ধ থাকছে—এবং 'শিল্পিত' নাট্যদলগুলি যখন ব্রেশট + সংস্কৃত ধ্রুপদী + আধুনিক ভাঁড়ামো নিয়েও খালি কাউন্টারে মাছি তাড়াচ্ছেন, তখন স্বপ্নের রঙীন অধারাবাহিকতা নিয়ে বিরোধীবাস্তবতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, 'কুরবানী' প্রস্তুত হয়। শিপ্পীর 'শোলে' যে চূড়ান্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার আপাতসামঞ্জস্যর দিকে অতাত্ত্বিকভঙ্গিতে হেঁটেছিল, কুরবানী তার প্রায় দরজায় কড়া নেড়ে ফেলেছে। একটি নাইটক্লাবের নর্তকী এর নায়িকা। এই ছবিতে এর সাথে টিনএজারবিহ্বলতাজাত নাজিয়া হাসান উপস্থিত। বিড্ডুর সুরারোপ এবং ফিরোজ খানের মস্তিষ্কনির্ভর একটি রূপকথা আমরা পর্দায় দেখি। বাঙালীর জীবনে যা একটি উত্তেজক রূপকথা। এই চলচ্চিত্রে আমরা তাই তাই ঘটনা দেখতে থাকি, যার সাথে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের রোজগারে বেরন বা গানের জলসা বা আবৃত্তির ভেলকির সাথে কোন আপাত যোগাযোগ নেই, অথচ আমরা শিহরিত বিস্ময়ে

কুরবানী দেখি। জটিলতম এক কাঠামো নির্মিত হয়েছে এতে, যা বিস্ময়ের কোন ছেদে বিশ্বাসী নয়। ক্রমাগত হতচকিত করাই যার একমাত্র লক্ষ্য। বেড়াতে বেরলেও আমরা অনুরূপ বিস্মিত হই। অর্থাৎ, কুরবানী, বাঙালীকে এক ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা এনে দেয়।

মেরী আওয়াজ শুনো :

এতাবৎকাল হিন্দী ছবিতে ব্যক্তিগত গল্পের প্রাধান্য ছিল। ব্যক্তিগত অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোর কোন বিশ্লেষণ নয়। একটি বিশেষ পাপীচরিত্র, যার ধ্বংসে আশু মুক্তি, তাই ছিল বিষয়।

রাজনীতিপ্রিয় বাঙালীরা নিওফিল্ম ব্যতীত রাজনীতির সঠিক বিশ্লেষণ পেতেন না। এর কারণ, রাজনীতি বলতে, বাঙালীরা বাম-রাজনীতিই বোঝেন। নয়া চলচ্চিত্রে বেনেগাল-সথু-নিহাল্নি স্ফুলিংকে প্রায় গ্রাস করে ব্যবসায়িক ছবি মেরী আওয়াজ শুনো প্রস্তুত হয়।

এবং এই চলচ্চিত্রেই আমরা এই বিষাক্ত স্ট্রাকচারের উল্লেখ পাই, যা তথাকথিত কমার্শিয়াল হিন্দীছবিতে বিরল। সুতরাং নয়া চলচ্চিত্রের বিষয়+রঙীন যাদু+চমক=মেরী আওয়াজ শুনো=সফলতা। বেনিয়ানস্ ট্রাভেলের মত সরলতম রূপকের মাধ্যমেই যে চলচ্চিত্রের বানিজ্যতরী প্রস্তুত হয়েছিল, তা প্রায় বাতিল হয়।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের স্বশাবি বাদ দিলে (কেননা রাজনীতি অতিতরুণদের কাছেও বই-মেলার বানিজ্যতরী) কমিউনিকেশনের প্রাথমিক শর্ত পূরণ করে মেরী আওয়াজ শুনো। 'এই তো অবস্থা'-এই কথাটি বাড়িমুখো দর্শকদের মুখ থেকে শোনা যায়। না, তারা আর্টফিল্ম নয়, একটি বানিজ্যিক ছবি দেখেই এই কথা বলেন।

একটি তাত্ত্বিক কমেডি : চশমে বদ্দুর

হিন্দীছবির গিমিক 'চশমে বদ্দুর'-এর বিষয়। 'চশমে বদ্দুর' হিন্দীছবির মূল প্যাটার্নের ওপর দাঁড়িয়ে। তিনজন যুবক একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন। এর মধ্যে একজন অর্থনীতির ছাত্র। সেই মেয়েটির সাহচর্য পায়। অন্য দুজন, প্রচলিত অর্থে, ভদ্র-লুমপেন। ঐ দুজন মেয়েটি সম্পর্কে যা যা ভাবে, তাহল, অতীতের হিন্দীছবির বিভিন্ন মুড। মিলনাত্মক পরিণতির জন্য মেয়েটিকে নকল কিডন্যাপ করার মতলব হয়। কিন্তু আসল ডাকাতরা এসে পড়ায় মেয়েটি নাটকীয় যুদ্ধের মাঝে নায়কের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়। এই ছবিটি মূলত হিন্দী ছবির তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলার খুব অল্প দর্শক ছাড়া ছবিটি জনপ্রিয় হয় না। এর থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না, যে বাঙালীরা তত্ত্বের চেয়ে প্রয়োগ বেশী পছন্দ করেন? অথচ, 'চশমে বদ্দুর'-এর মত আধুনিক ছবি ভারতবর্ষে খুব কম হয়েছে। কিন্তু এর বোধ, এলিটশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ঘটনা সিদ্ধান্ত :

এমন সিদ্ধান্তে, ও এমন ঘটনার মাঝে আমরা আসতে পারি, যে নয়া-রূপকথার জটিলতম স্ট্রাকচার বাণিজ্যিক হিন্দীছবি, যা বাংলার সংস্কৃতিতে তার বলিষ্ঠ, সুঠাম শেকড় বিছিয়ে দিয়েছে।

সংযোগ-সঞ্চারণ এবং লোকসংস্কৃতি

পল্লব সেনগুপ্ত

॥ ১ ॥

সম্ভবত যখন থেকে মানুষ ভাব-বিনিময় করতে শিখেছে, তখন থেকেই সভ্য হবার পথেও পা বাড়িয়েছে সে ; বস্তুতপক্ষে এই ভাবনার- পারস্পরিক-সঞ্চার এবং সভ্যতার বয়স সমান। আদিম যুগ থেকে আজ অবধি আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে মানুষ যতই এগিয়েছে ততই তার ভাব-সঞ্চারের মাধ্যমগুলি সূক্ষ্ম থেকে আরো সূক্ষ্ম, জটিল থেকে জটিলতর এবং ব্যাপক থেকে উত্তরোত্তর অনেক বেশি ব্যাপক হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই আদিম সমাজের উত্তরসরণ করে এসেছে কৌম সমাজ, যা বিবর্তিত হয়েছে লোকায়ত সমাজে, যা-কিনা ফের অগ্রসর হয়েছে পরিশীলিততর শ্রেণী সমাজের দিকে। এই সমস্ত ক'টি পর্যায়েরই সংযোগ-সঞ্চারের বহুজনীন মাধ্যমগুলিও ক্রমান্বয়ে চেহারা এবং চরিত্রবদল করেছে।

একটু বোধহয় ভুল হল : চেহারা অবিরতভাবে বদলে গেছে [যাচ্ছেও] ঠিকই, কিন্তু চরিত্রের বদলটা বাহিরঙ্গিকভাবে যদিও পরিবর্তনশীল, তবু তার অন্তর্কাঠামোটুকু অবশ্যই স্বধর্মচ্যুত হয় না। কি সেই ধর্ম ? অনিবার্যভাবেই সেই প্রশ্ন এখানে উঠবে। আর তার জবাবের ওপরই নির্ভর করবে সংযোগ-সঞ্চারের মাধ্যমগুলির লৌকিক প্রকরণগুলির জাতি নির্ণয়ের ব্যাপারটি।

গোষ্ঠী জীবন যাপনের প্রথম ও প্রধান শর্তই যেহেতু একজনের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন অন্যের মনে পৌঁছে দেওয়া, তাই এই সংযোগ-সঞ্চার ইত্যাদির জন্য মানুষ প্রথম থেকেই একটু-একটু করে সঙ্কেত, চিহ্ন, প্রতীক, ভঙ্গী, ধ্বনি প্রভৃতির উদ্ভাবন করেছে স্রেফ বেঁচে থাকবার তাগিদেই। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই এসেছে একই ছক ধরে স্বাচ্ছন্দ্য আর জটিলতা ; ঐ সমস্ত সঙ্কেত-ইত্যাদির মধ্যেও সেগুলো প্রতিফলিত হয়েছে স্বভাবতই। তারাই হল ক্রমপরিবর্তনশীল সংযোগ মাধ্যম, তথা কমুনিকেশন মিডিয়া।

একসময়ে দেবতার কল্পনা করে তার উদ্দেশে নিজেদের ভক্তি, ভয়, স্তুতি-ইত্যাদি নিবেদন করাটা ছিল এক ধরনের কম্যুনিকেশন। এর থেকেই এসেছে নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, মন্ত্র, কাহিনী। কালের পাতা, যতই উল্টেছে, এদের ভিতর সূক্ষ্ম-জটিল ব্যঞ্জনা আরোপ করে ভাবপ্রকাশের ক্রমান্বিত পরিশীলন করা হয়েছে। নাচের একটা ভঙ্গী, একটা বিশেষ অর্থবহন করতে আরম্ভ করেছে হয়ত ; কালক্রমে সেই ভঙ্গী বা মুদ্রাটিই

একটা ভাবসঞ্চারের মাধ্যমে পরিণত হল। একটা বাস্তবানুগ চিত্ররেখা উত্তরকালে বিশেষ কোনো তাৎপর্য-দ্যোতক চিহ্নে বিবর্তিত হল; একটা বিশিষ্ট ধ্বনির ব্যঞ্জনা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। যা ছিল দেবতার উদ্দেশের গোষ্ঠীর প্রতিবেদন, তাই পরিবর্তিত হয়ে গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনীন সঞ্চারণ মাধ্যম হিশেবে গণ্য হতে লাগল। ধীরে ধীরে তার আদি অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতেও পারে; নূতনতর সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার তাৎপর্যও হয় নূতনতর।

বক্তব্যটাকে তথ্যসাপেক্ষ করা দরকার। ধরুন, খুব পরিচিত একটি চিহ্ন, আল্পনার পদ্মের কথা। প্রাথমিকভাবে, ফুল একসময়ে নারীত্বসূচক দৈহিক চিহ্নের প্রতীক রূপে গণ্য হত আদিম মানুষের মনে। ফুল যার প্রতীক বলে ভাবা হল, তার ব্যাবহারিক ক্রিয়াশীলতা এবং গাছের ক্ষেত্রে ফুলের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা যেহেতু অনুরূপ বলে বুঝতে সমর্থ হয়েছিল তারা। তারও আগে গুহার গায়ে ভয় এবং বিস্ময় নিয়ে তারা বাস্তবানুগ যোনি চিহ্নই খোদাই করে রাখত, হয়ত বা সন্তান জন্মের রহস্য যে 'দেবতা'-র আয়ত্ত, তাকে খুশী করতে কিংবা তার 'করণীয়'-টুকু স্মরণ করিয়ে দিতে। সুতরাং, বাস্তবানুগ যোনিচিহ্ন একই তাৎপর্য কম্যুনিকেট করতে বিবর্তিত হল প্রতীকানুগ 'পুষ্প' চিহ্নে। সমস্ত ফুলের মধ্যে প্রতীকী-আনুরূপ্য প্রতীকমূলের সঙ্গে পদ্মেরই যেহেতু সবচেয়ে বেশি—উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী এবং চিত্রশিল্পীরা বিশেষভাবে সে-কথা জানেন—তাই ধীরে-ধীরে পদ্মচিহ্নই ঐ বিশেষ অর্থের সংযোগ-সঞ্চারের মাধ্যম হয়ে গেল। প্রথম থেকেই এই তাৎপর্যটুকু করা হয়েছিল, তার পরিণতি উত্তর পর্বে একভাবে পদ্মচিহ্নই দেবসম্পর্কসূচক বলে গণ্য হতে শুরু করল। এরই আরও পরিণত বিবর্তন, পদ্মপ্রতীকের নন্দনতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা বহন করা। মূল প্রতীক বাস্তবানুগ দৈহিক-চিহ্নের অনুরূপায়ণ-পরিণতি লাভ করল আল্পনার পদ্ম এবং দেবমূর্তির পদতলের পদ্ম পবিত্রতাসূচক বলে স্বীকৃত হল; কাঁথায় সেই পদ্ম-চিহ্নই নন্দনতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা অর্জন করল। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে আবার পদ্ম, ঐ যোনিপ্রতীক রূপেই রইল অনড়, অটল হয়ে।

উপরের আলোচনা থেকে একটা জিনিস ফুটে উঠছে যে, সংযোগ-সঞ্চারের মাধ্যমগুলি সর্বজনীন হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। পদ্ম যখন পবিত্রতাব্যঞ্জক, তার সক্রিয়মূল [ফাংশনাল] সংযোগ-সঞ্চারণ ক্ষমতা সর্বজনীন; ঐতিহ্যগতভাবে গোষ্ঠীর, সমাজের, ধর্মের, জাতির সকলেই তা বোঝে। পক্ষান্তরে, পদ্ম যখন সেই একই সময়কালে তান্ত্রিকমহলে যোনি চিহ্ন রূপে গৃহীত, তখন সেটা তাদের বাইরের কেউ না-বোঝালে বোঝে না। সুতরাং একই সময়ে সংযোগসঞ্চারের একই লোকায়ত প্রকরণ স্থায়ী এবং পরিবর্তনসাপেক্ষ এই দুইভাবেই প্রচলিত থাকতে পারে।

॥ ২ ॥

সংযোগ-সঞ্চারের সর্বজনীন মাধ্যম মাত্রেই লোকায়ত ঐতিহ্যের অনুসারী, এমন কথা ভাববার কারণ কিন্তু নেই। বিশেষত সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যম-গুলির ব্যাবহারিক প্রকাশও ক্রমশই বেশি সূক্ষ্ম, জটিল এবং পরিশীলিত হয়ে ওঠে যেখানে। এখন যাকে ম্যাস-মিডিয়া ওরফে-গণমাধ্যম বলে মনে করি আমরা [যেমন, রেডিও, টি. ভি. সিনেমা, খবরের কাগজ-ইত্যাদি], তার মধ্যে নাগরিক জীবন-কেন্দ্রিত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্যানির্ভরতাই সবচেয়ে বড় সক্রিয়মূল উপাদান। সেই বিজ্ঞানায়ত্ত সক্রিয়মূলতা আগেও হয়ত ছিল, কিন্তু তার ক্ষমতাও ছিল যুগোপযোগীভাবে অতি সাধারণ এবং সীমাবদ্ধ। বিশেষ, প্রধানত যেখানে বক্তব্যের প্রতিবেদন ছিল কম-অথবা-বেশি সংকেত-ব্যঞ্জনা-নির্ভর, সেখানে সেই আবেদনের ব্যাপ্তিও ছিল গণ্ডীবদ্ধ। অর্থাৎ, কম্যুনিকেশনের সর্বজনীনতা বাড়ে নাগরিকীভবন [আরবানাইজেশ্যন] হবার সমান অনুপাতে এবং ঠিক সেই অনুপাতে কমে যায় তার লোকায়ত চরিত্র।

বলতে পারেন কেউ, পরিশীলিত প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম মাধ্যমে যা কম্যুনিকেট করা হয়, তাই কি সর্বজনীন? রেডিওতে খবর দেওয়া হল একটা কিছু; যে-ভাষায় খবরটি ঘোষিত হল; শুধু যাঁরা সে-ভাষাটি বোঝেন তাঁদের কাছেই তার মর্ম পৌঁছবে। তা-হলে মূলগত-ভাবে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ঢাকের কাঠিতে বিচিত্র সাংকেতিক বোল তুলে খবর দেওয়ার সঙ্গে তরে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? যারা সে-বোলের মর্মার্থ বুঝবে, তাদের কাছেই শুধু তার গুরুত্ব। সুতরাং রেডিওর ভাষাও যেমন সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে কার্যকর, ঢাকের ভাষার কার্যকারিতাও তেমনই সীমাবদ্ধ। তা হলে লোকায়ত সংযোগ-সঞ্চারের তফাৎ কোথায় মৌলিকভাবে? ১২

এই আলোচনার প্রথমেই কিন্তু সে-কথা বলে-নেওয়া হয়েছে: সমস্ত স্তরের সংযোগ-সঞ্চারেরই অন্তর্কাঠামো মূলত এক। কিন্তু তাহলেও আনুপাতিক বৈপরীত্যে প্রসঙ্গটি এল। রেডিওর মাধ্যমে যে-খবর পৌঁছোয় তার বক্তা একজন, শ্রোতা আর সবাই; পক্ষান্তরে ঢাকের খবর পৌঁছে দেয় এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, সেখান থেকে আর এক গ্রামে, একের পর এক লোকবাদ্যকর। অর্থাৎ, রেডিওর তুলনায় এতে সক্রিয়ভাবে প্রতিবেদনে অংশগ্রহণ করছে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ; সুতরাং এর যৌথতা-নির্ভর চরিত্রগুণও অনুপাতগতভাবে বেশি রেডিওর খবর প্রচারের ব্যাবহারিক সক্রিয়তার তুলনায়।

॥ ৩ ॥

লোক সংস্কৃতির সমস্ত প্রকরণের মধ্যেই খানিকটা করে হলেও, সংযোগ-সঞ্চারমূলক মূল্য রয়েছে। সেটি প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মাচার কেন্দ্রিত হয়ে প্রকাশমান হলেও, পরবর্তী সময়ে

তাদের ভিতর অন্তবিধ বক্তব্যের প্রতিবেদনটুকুই মুখ্যতর হয়ে উঠেছে সন্দেহাতীতভাবে। ধরুন, আমাদের টুসু, ভাদু, গম্ভীরা-প্রভৃতির কথা। প্রাথমিকভাবে এরা পূজাকেন্দ্রিক, আচার-ভিত্তিক হলেও, কালের অগ্রগমনে এদের প্রতিবেদনের উপজীব্যটা মূলত সংবাদভিত্তিকই হয়ে দাঁড়িয়েছে। হবিবপুরের দারোগাবাবু কিভাবে ঘুষ নিয়েছিল, তার খবর মেলে গম্ভীরার গানের বয়ানে; মানবাজারের হাটে কেমন ভাবে জমিদারের পাইকরা এসে উৎপাত করেছে সেই-সমাচার পাওয়া যাচ্ছে ভাদুর উদ্দেশে নিবেদিত গানের কলিতে; ইন্দাস অঞ্চলে খরা হয়ে মানুষের দুঃখকষ্ট কতটা বেড়েছে, জানা যাবে টুসুগানের কথায়।

যে সমস্ত লৌকিক প্রকরণ ধর্মসম্পৃক্ত নয়, তাদের মধ্যে ত এ জিনিসটি আরও ব্যাপক। কুচবিহার জলপাইগুড়ির চটকা গানে, অথবা চোরচুন্নীর পালায়, মুর্শিদাবাদের আলকাপে, নদীয়ার পঞ্চীর গানে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংবাদ প্রতিবেদন-করাটাই প্রধান বিষয়। লেটো গান, হাপু গান সর্বত্রই সেই একই প্রবণতা দেখি। কখনো-কখনো এদের মধ্যে একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ধর্ম চিন্তার প্রতিবেদন এবং ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক আর্থনীতিক সমাচার একত্রে সহাবস্থান করে। যেমন, পটের গান। ১৯৭৮ সালের বন্যার পর তৈরী এমন একাধিক পট দেখার সুযোগ হয়েছে, যার মধ্যে বিধ্বংসী বন্যার ছবির সঙ্গে সরকারী ত্রাণব্যবস্থা ইত্যাদির রূপায়ণও করা হয়েছে, মায় মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা-ও সেখানে চিত্রিত। প্রাসঙ্গিক ভাবে যে গান বাঁধা হয়েছে ঐ পটগুলির উপলক্ষে সেখানেও সংবাদপত্র-সুলভ বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে। মায় পটের ছবিতে মুখ্যমন্ত্রীকেও আঁকবার চেষ্টা করেছেন লোকশিল্পী: সঙ্গে গান বাঁধা-হয়েছে, দোহাই বাবু জ্যোতি বাবু তুমি ভগবান অন্ন দিয়ে এ দুর্দিনে বাঁচাইলে প্রাণ" ইত্যাদি ইত্যাদি!

॥ ৪ ॥

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে গান এবং নাটকের মাধ্যমেই সামাজিক বক্তব্য সঞ্চারণের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। চটকা ধরণের হালকা রীতির গান যেখানে মূলত রসালো কেচ্ছা-ইত্যাদির দিকেই বেশি নজর দেয়, সেখানে গম্ভীরা, টুসু, ভাদু, পঞ্চী ইত্যাদি গানের গভীরতাদ্যোতক চরিত্রের জন্যে তাদের মধ্যে সামাজিক শোষণ, আর্থ-নীতিক সংঘাত, রাজনৈতিক লড়াই ইত্যাদি ব্যাপারও ঠাঁই পায় স্বচ্ছন্দে। সত্যিকথা বলতে কি লোকসঙ্গীত থেকে গণসঙ্গীতে বিবর্তনের সূত্রই নিহিত সামাজিক ভাবে সংযোগ-সঞ্চারণের সাফল্যের মধ্যে। লোকসঙ্গীতের জনপ্রিয় 'ফর্ম' গুলির ওপর ভিত্তি করেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হয়েছে জনপ্রিয় গণসঙ্গীতগুলি; এটা কখনোই সম্ভবপর হতো না, যদি না ঐ 'ফর্ম' গুলির সংযোগ-সঞ্চারণের ক্ষমতা ব্যাপক হতো।

লোকনাট্যের যে-সমস্ত প্রকরণে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় আনা যায়, যেমন, আলকাপ বা চোর

চূরণী, সেখানেও ঠিক একই ভাবে সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক বক্তব্য সঞ্চারণ করতে দেখা যাচ্ছে আজকাল। বর্গাদারী স্বার্থ সংরক্ষক আইন, বামফ্রন্টের আত্মপ্রতিষ্ঠা, দলবিদ্বেষের সঙ্গে জোতদার-কালোবাজারী এবং মহাজনদের যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ও গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে এইসব ফর্মগুলির ওপর নির্ভর করে। লোকসঙ্গীতের প্রকারগুলির রূপান্তরে যেমন গণসঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক তেমনই এই সমস্ত লোকনাট্যধারার থেকেই এসেছে আজকের রাজনৈতিক পরিভাষায় যাদের নাম 'পোস্টার ড্রামা' সে-ধরনের ফর্মগুলি। এমন কি ঐ ধরনের 'ভিলেজ অপেরা'-য় গানই হল বৃহত্তম সঞ্চার মাধ্যম, তাই সেই ধারানুসারেই, এই সব পোস্টার ড্রামাগুলিতেও গানের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়।

এখানে একটা কথা বলা দরকার : সংযোগ-মাধ্যম হিসেবে সমস্ত লোকসঙ্গীত এবং লোকনাট্যই একটা বিশেষ ভঙ্গী গ্রহণ করে; তা হল তির্যক বিদ্রূপের। ঠিক এই জিনিসটিই গণসঙ্গীতে এবং পোস্টার ড্রামাতেও একটি প্রধান উপজীব্য। এককালের বিখ্যাত 'ও মাউন্টব্যাটন সাহেবো' কিংবা অতি-সাম্প্রতিক 'ও হাতে ভোট দিও না' গানগুলির কথা মনে করুন, তাহলেই এই বক্তব্যের সমর্থন পাবেন।

আলোচনার শেষে পূর্বাপর যে-কথাগুলি বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে, সেগুলিকে সম্বদ্ধ করে সার্বিক একটি বক্তব্যে পৌঁছতে পারি : এক-সময়ে ভাব-সংযোগের সেতু ছিল দেবতা, পরবর্তীকালে গণদেবতাই তার অভীষ্ট; ধর্ম-নির্ভর চিহ্ন, ধ্বনি-ইত্যাদি পরবর্তীকালে ধর্মের গণ্ডীকে পেরিয়ে অন্যবিধ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে; আধুনিক নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেও লৌকিক সংস্কৃতিজাত 'ফর্ম' গুলির ভিত্তিতেই তৈরী হয় নূতনতর সংযোগসঞ্চারক ফর্মসমূহ; কিন্তু এ-সত্ত্বেও নাগরিকীভবন এবং সংযোগসঞ্চারের লৌকিক মাধ্যমগুলির চরিত্র আনুপাতিক বৈপরীত্যে সম্পর্কিত, কারণ 'ফর্ম' সমধর্মী, 'কন্টেন্ট'ও কিছুটা তাই, অনেকাংশে 'অ্যাপ্রোচ'-ও, কিন্তু 'পার্টিশিপেশন'-এর ক্ষেত্রে দুয়ের চরিত্র পৃথক। কিন্তু তবুও, সার্থকভাবে 'কম্যুনিকেট' করতে হলে লোকসংস্কৃতির 'ফর্ম'-গুলিকে গ্রহণ করতেই হবে, সেগুলিই ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের সঙ্গে মিশে-আছে যেহেতু।

———

উনিশ শতকের ভাবজাগৃতি ও জনসংযোগের সমস্যা

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

'অয়ি ইতিবৃত্তে ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ' উক্তিটি অগ্রজ আলোচকের সম্বন্ধে উত্তরকালের লেখকরা প্রায়শ নানা ভঙ্গিতে বলে থাকেন। যেহেতু কালের ব্যবধানে ঘটনার চালচিত্র স্পষ্ট ধরা পড়ে, তাই পরবর্তীকালের লেখকরা কিছু বেশি সুযোগসুবিধাও পেয়ে যান। তবে দীনতার ছদ্মবেশে অহং অনেক সময় এত প্রখর হয়ে ওঠে যে পূর্বজদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হন। 'শয়তানকেও তার অবশ্য প্রাপ্য দেওয়া উচিত' যদি সত্য হয়, তবে ইতিহাসের পূর্বতন লেখকেরা বাতিল হবেন কেন? এত কথা বলার কারণ, সম্প্রতি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যায়নে একটা হঠকারী ঝোঁক দেখা দিয়েছে। কেবল অতিবাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তরুণ বুদ্ধিজীবীকুল এই মূল্যায়নে নিয়োজিত হলে বিশেষ উদ্বেগের হেতু ছিলনা। এর সীমা সাগর পেরিয়ে কেমব্রিজ এবং সীমান্ত পেরিয়ে বাংলা দেশ পর্যন্ত; রাজধানীর জবাহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ও অন্তর্ভুক্ত। নকশালপন্থী, সোভিয়েতপন্থী বা মার্কসবাদী-কমিউনিস্ট, তিন শিবিরেই প্রবল বিপ্লবী ভাষ্যকার আছেন, যাঁদের মতে তথাকথিত 'বেঙ্গল রেনেশাস' আসলে আত্মতৃপ্ত কতিপয় বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বিফল ঢক্কা নিনাদ। বর্তমান নিবন্ধে তাই 'নবজাগরণ' কথাটি এড়িয়ে শিরোনামে ভাবজাগৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্নটা উঠেছে সমাজতত্ত্বের দিক থেকে। ডিরোজিও-হেয়ারের শিষ্যরা, রামমোহন এবং তাঁর অনুগামী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এমনকি সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি বিদ্যাসাগর-প্রভাবিত গোষ্ঠী বা তরুণ ব্রাহ্মদের চিন্তা ও কর্ম শতকরা কতজন মানুষকে স্পর্শ করতে পেরেছিল? অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন জনসমষ্টির শতকরা তিনভাগ মোটামুটি 'সাক্ষর' ধরলে শতকরা একভাগও গ্রাজুয়েট হতে পারেন নি। অথচ 'রিনাইস্সান্স' বা রেণেশাসের অর্থ হল নবজাগরণ, 'Awakening,' এই শব্দের একটা অর্থব্যাপকতা আছে। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। ইয়োরোপে এই রেণেশাসের বিস্তার—চতুর্দশ শতকের ইতালি থেকে ষোড়শ শতকের ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত। সাইমনস এবং আরও অনেকে ইয়োরোপীয় রেণেশাসের ইতিহাস লিখেছেন। ওয়েবস্টার অভিধান সংক্ষেপে রেণেশাস-লক্ষণ নির্ণয় করতে চেয়েছে এই বলে: 'The transitional movement in Europe between medieval and modern times beginning in the 14th

Century in Italy, lasting into the 17th Century, and marked by a humanistic revival of classical influence expressed in a flowering of the arts and literature and by the beginnings of modern science.' (পৃঃ ৭৩৫/ছাত্র সংস্করণ)

স্বর্গের তুলনায় মর্ত্য, পরকালের তুলনায় ইহকাল, সংস্কারের পরিবর্তে যুক্তির প্রাধান্য। এই হল নবজাগরণ। Man is Man For all that! এই দৃষ্টিভঙ্গির বদলকেই 'transitional movement' বলা হয়েছে। এইসব লক্ষণ যদি ষোড়শ শতকের ইংলণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে ধরা যায়, তাহলে উনিশ শতকের বাঙালীর নবজাগরণ খুবই নিষ্প্রভ অকিঞ্চিৎকর একটা ব্যাপার নিঃসন্দেহে। কোথায় সার ফ্রান্সিস বেকনের মতো বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্ব, অবরোহী চিন্তার নায়ক, কোথায় বা শেক্সপীয়র মার্লো প্রমুখের সৃষ্টিশীল প্রতিভা। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মধুসূদন-বঙ্কিম হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ধরলে অবশ্যই তুলনীয় একটা ভাবজাগৃতি, শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের হদিশ মেলে। পুরনো মিস্ট্রি-মিরাক্লের সঙ্গে যেমন শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি কমেডির কোন সম্বন্ধ নেই, তেমনি মুকুন্দের সঙ্গে ভারতের যতই পার্থক্য থাক, মুকুন্দ-ভারত থেকে মধু-হেম-নবীনের ব্যবধানও দুস্তর। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়দত্ত, ভুদেব আদির মতো ব্যক্তি অন্তত আঠারোর শতকে বাংলা দেশে ছিলনা। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইতে যে সামাজিক ইতিহাস লিখেছেন, তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য বাঙালীর নবজাগরণের চিত্র আর কেউ দিয়েছেন বলে বর্তমান আলোচকের জানা নেই। সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ, সুমিত সরকার বা ডেভিড কফ-সম্প্রদায় যা করেছেন তা হল ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা, ভাষ্য এবং তৎভাষ্য। জল বেশ ঘোলা করা হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্যের ইংরেজি ভাবানুবাদ করা মাত্র সেটি মার্কসবাদী ভাষ্য নামে প্রচারিত হয়েছিল। তখন রামমোহনকে Morning star of Renaissance বলা হয়েছিল। উচ্ছ্বাসপূর্ণ এই পুস্তকটি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং এটিতে দ্রুত মন্তব্যের ঝোঁক সর্বত্র। অথচ এটি প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে অবশ্যপাঠ্য করে তোলা হয়েছিল। সংক্ষেপে একথা ধুয়া চালু হয়েছিল 'রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ'।

তারপর এল তেলেঙ্গানা আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ ঘোষিত হল। নেতারা অনেকে জেলে, অনেকে আত্মগোপন করে রইলেন। 'মার্কসবাদী' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হতে লাগল। প্রকাশ্যে তার সহযোগী থাকল সরোজকুমার দত্ত-গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত পরিচয় এবং শিবির, সংবাদ, ডাক প্রভৃতি। উনিশ শতকের নবজাগরণকে উল্টোভাবে দেখা হল। তাতে সকলকেই প্রায় সুবিধাবাদী, দাম্ভিক, ইংরেজভক্ত, দ্বিধাগ্রস্ত

ইত্যাদি বলা হল। অন্তত কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা জনসংযোগের দিক থেকে নবজাগরণ পর্বের কোন ব্যক্তিকেই মহান বলতে পারলেন না। যে-কৃষকদের অন্ধকারে রেখেই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন হল ইংরেজশাসনের সহযোগী শ্রেণী তৈরির লক্ষ্য নিয়ে, তাদের ওপর পুরনো জোতদার-জমিদার শোষণের সঙ্গে যুক্ত হল অনুপস্থিত মধ্যস্বত্বভোগী ও পত্তনিদার শিক্ষিত শ্রেণীর শোষণ। নবজাগরণের নায়কের অনেকেই প্রভূত ভূসম্পত্তি বা জমিদারির মালিক ছিলেন। শতকরা ৭০ জন দেশবাসী অর্থাৎ কৃষক সমাজের কথা কেউ ভাবলেন না।

এমন তির্যক আলো ফেলে জনগণের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির নিরিখে নবজাগরণের বিচার করা হল যে, ধোপে কেউ টিঁকলেন না; মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়ে বড়ো হল মধুসূদনের প্রহসন, হুতোম প্যাঁচার নক্সার স্থান হল বঙ্কিমের ঊর্ধে। দেখা গেল, রামমোহন-বিদ্যাসাগর চূড়ান্ত বিচারে রায়তবিদ্বেষী এবং ব্রিটিশ শক্তির 'কোলাবরেটর'। কয়েকটি ক্ষার-পরীক্ষায় তাঁদের শ্রেণীপরিচয় ধরা পড়ে গেল। এতদিন তাঁরা যেন ভুয়া সমাজপ্রগতির মঞ্চের আড়ালে লুকিয়েছিলেন। কতগুলি ঘটনা তুলে ধরা হল: (১) সিপাহী বিদ্রোহকে বিদ্যাসাগর স্বাগত জানান নি, বরং লেঠেল নিয়ে সংস্কৃত কলেজ পাহারা দিয়েছেন; (২) রামমোহন উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য এদেশে ইংরেজদের স্থায়ী বসতি আকাংক্ষা করেছেন, নীলচাষ সমর্থন করেছেন; বঙ্কিম পাবনা-রায়তদের বিদ্রোহ পছন্দ করেন নি, 'সাম্য' প্রচার বন্ধ করে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে মহদাশয় জমিদারদের পক্ষে কয়েকটি অনুচ্ছেদ যোগ করেছেন। একথা ঠিক, সারা উত্তর-পূর্ব ভারতে এমনকি মণিপুর ইম্ফল পর্যন্ত যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা এবং প্রবেশিকা থেকে এম. এ অবধি তার নিয়ন্ত্রণে, তখনও উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর তালিকা, স্কুল ও কলেজ পরিদর্শকের প্রতিবেদন, আচার্য-উপাচার্যের দীক্ষান্তভাষণ সবই একটি ক্ষীণকায় বিশ্ববিদ্যালয়-পঞ্জীতে কুলিয়ে যেত। অর্থাৎ যে-শিক্ষার দৌলতে আমাদের নবজাগরণ, সে-শিক্ষার পরিধি খুবই সংকুচিত ছিল। স্নাতক হলেই ডেপুটির পদ কত সহজপ্রাপ্য ছিল, কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থে তার একটি অদ্ভুত নজীর আছে। পিতৃবিয়োগের দুঃসংবাদ পেয়ে নবীনচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে হাজির। তিনি দিলেন চট্টগ্রামে যাবার রাহা খরচ। নবীনচন্দ্র যখন চট্টগ্রামে, তখনই বিদ্যাসাগর বলে রাখলেন ছোটলাটকে। কলকাতায় ফিরে নবীন ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করে নিয়োগপত্র নিলেন।

এই দৃষ্টান্তে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত কারণেই ইংরেজি শিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে 'পাথরে-বাঁধানো কুণ্ডের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৮৫৪ সাল থেকে ইংরেজ সরকার শিক্ষার দায়িত্ব নিলেও তার বহর ছিল প্রশাসনের প্রয়োজনের সুতোয় বাঁধা। ইনফিলট্রেশন থিয়োরির ভ্রমাত্মক এবং সাম্রাজ্যবাদী সংকীর্ণতার মধ্যেও যে-সম্ভাবনা ছিল, তার প্রয়োগ

নিয়ে কেউ উদ্বিগ্ন হন নি। বিদ্যাসাগর ভার্নাকুলার এডুকেশনের কথা ভেবেছেন—সেটা জনশিক্ষা নয়, রেভা. লালবেহারীর চিন্তায় গ্রামীণ শিক্ষার জন্য কিছু পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু ধর্মান্তরিত পাদ্রির কথা সোনাপলাশী গ্রামের প্রতিবেশীরাও শুনতে চাইবে না, সমাজ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পক্ষে গ্রামীন শিক্ষার অনুকূলে কোন আন্দোলন গড়ে তোলাও অসম্ভব ছিল। 'মার্কসবাদী'র লেখকেরা তোলপাড় বাধিয়ে দিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, কৈবর্ত বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি স্থানিক বিদ্রোহের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'কন্টেন্ট'-এর ওপর তাঁরা গুরুত্ব দিলেন। কৃষক অভ্যুত্থান নিয়ে সুপ্রকাশ রায় ছদ্মনামে একজন কমিউনিস্ট লেখক প্রশংসনীয় ইতিহাসও লিখেছেন।

কিন্তু কিছু কথা থেকেই যায়। বিশ শতকের তিরিশের দশকে যদি কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির কথা আমরা ভেবে থাকি এবং সেজন্য মার্কসবাদের আদর্শে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে থাকি, তাহলে উনিশ শতকের ভাবজাগৃতিকেই বা জনগণের শ্রেণীস্বার্থের নিরিখে এতকাল বিচার করা হয়নি কেন? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা সময় নানারকম টালবাহানা। 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গানটি একান্তভাবেই নাকি বুর্জোয়াভাবে আবিল, নাইটহুড পরিত্যাগ করলেও 'চার অধ্যায়' রচনা করে রবীন্দ্রনাথ দুভাবে স্থিতাবস্থাকে জোরদার করেছেন। এক, বিপ্লবী (সন্ত্রাসবাদী) আন্দোলনকে হেয় করেছেন। দুই, নিজের গা বাঁচিয়েছেন। বিদ্যাসাগরে স্ববিরোধিতা? থাকতেই পারে। মেকানিক্যাল ম্যান ছাড়া স্ববিরোধমুক্ত হওয়া শক্ত। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। তারপরেও তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কংগ্রেসে যোগ দেননি। সেকালে সমাজসংস্কার ও রাজনীতি ভিন্ন ছিল না। তাঁকে ডাক দিলেও নাকি কংগ্রেসের কোন দায়িত্ব নিতে তিনি রাজী হন নি। রামমোহন তো সামন্ত প্রভুদের স্বার্থরক্ষাতেই 'রাজা' খেতাব নিয়ে বিলাত গিয়েছিলেন। অকালে মারা না গেলে তিনি হয়ত সপার্ষদ বিলেতে থেকেই যেতেন। এইসব মন্তব্যের ভিত্তি যতটা অনুমান (Conjecture), ততটা প্রমাণভিত্তিক নয়।

জনগণের জন্য ভাবনার ব্যাপারটা অধুনা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। তাতে সুবিধে এই যে পূর্বপুরুষের চেয়ে নিজের সামাজিক বোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা বেশি প্রমাণ করে যুগপৎ আত্মতৃপ্তি এবং বাহবা পাওয়া যায়। বিশ শতকের এই অন্তপর্বেও আমরা বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়ে কৃষক-শ্রমিক সমস্যা, ইউরো-কমিউনিজম, প্ল্যানিংয়ের গলদ, ভূমিসংস্কার প্রসঙ্গে কেবল প্রবন্ধ লিখি, মেহনতী মানুষের স্বার্থে বক্তৃতা দিই, সম্পাদকীয় ছাপি—সে সব কজন বোঝে? সরকারী পরিসংখ্যানই বলে, শতকরা ৩০।৪০ জন গ্রামের মানুষ দুবেলা ভরপেট ডালভাত খায়না, টিপসই দেয়, জন্মমৃত্যুর জন্য ওলাবিবি, ষষ্ঠী, পঞ্চানন, পীর-মাজার মানে, তারা কি আমাদের সফিসটিকেটেড ভাষায় লেখা রচনা পড়বে? পড়ে শোনালেও বুঝবে?

যে-ইংরেজি শিক্ষা এবং মেকলেকে দুবেলা গাল পেড়ে আমি জনগণের সঙ্গে একাত্মতা বোঝাতে চাই, তার সুবাদেই আমি উকিল মাস্টার ডেপুটি ডাক্তার বা কেরাণী এবং সেই শিক্ষালব্ধ ভাবাই আমার অবলম্বন। আসলে সব বিতর্ক এবং আলোচনা আমাদের সমাজেই সীমাবদ্ধ। 'আমরা' বলতে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীকেই বোঝাতে চাইছি।

য়ুরোপের নবজাগরণ কি জনগণকে স্পর্শ করতে পেরেছিল? মনে রাখতে হবে, রাণী এলিজাবেথের সরকার স্বাধীন দেশের সরকার। তখন ইংলণ্ড বাণিজ্যের বাহু বিস্তার করে অন্যদেশ লুণ্ঠন শুরু করেছে। নাট্যকার ও অভিনেতৃগোষ্ঠী সবে 'ভ্যাগাবণ্ডস্ এ্যাক্ট' থেকে মুক্তি পেল। সাবালক ভোটের কথা, স্ত্রীশিক্ষা বা মজুরদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে কিছুই ভাবা হয়নি। খুন-জখম, মারামারি করে রুজি-রোজগার করাটা খারাপ চোখে দেখা হত না। বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বাদ তলার দিকে পৌঁছয়নি। সুতরাং ইতালি স্পেন বা ইংলণ্ডের রেনেশাঁসও খুব ব্যাপক অর্থে সমাজের নীচের দিকে চারিয়ে যায়নি। স্বৈর-রাজতন্ত্রকে মেনে নিয়ে গণতন্ত্র আজও ইংলণ্ডে হাঁসজারু। ভারতে ব্রিটিশ শাসন বাণিজ্যিক কারণে দেশ-শোষণ করতে চেয়েছে। আমরা একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভূখণ্ডে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত মানবগোষ্ঠী নই, তাদের চোখে পণ্যের বাজার মাত্র। বিদেশী শাসনের অধীন কোন দেশে-বিদেশীদের চেষ্টায় রেনেশাঁস আসতে পারে না। তাই উপনিবেশ ভারতের রাজধানী বাংলাদেশেও আসে নি। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার ফলাফল আপেক্ষিক মানদণ্ডে বিচার করতেই হয়। অন্য সব রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে ইংরেজের ভারত-বিজয় তুলনীয় নয়। সামন্ত হিন্দুশাসনকে সরিয়ে পুরনো সামন্তশাসনই নিয়ে এলেন পাঠান-মোগল। ইংরেজ বাণিজ্যের স্বার্থেই ইতিহাসের দূত হয়ে এল। তার রেলপথ স্থাপন, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা তার প্রশাসনেরই স্বার্থে। তবু সেই মাধ্যম দিয়েই কি দুর্ভিক্ষের রিলিফ, বিজ্ঞানের জ্ঞান আর গণতন্ত্রের চেতনা এসে পৌঁছয়নি? রবীন্দ্রনাথ যথার্থই 'কালান্তর' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

এ কথা সত্য, ইংরেজ আগন্তুকরা আমাদের তাঁতীদের সর্বনাশ করেছে; তুলো চাষের ক্ষতি করেছে। তুলো-প্রসূতি ভারত তুলো আমদানি করতে বাধ্য হয়েছে। কার্ল মার্কসের ব্যবহৃত পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যাচ্ছে, ঢাকার মসলিন-কারিগর তাঁতীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। ১,৫০,০০০ থেকে কমে ১৮৩৭ সালে দাঁড়াল ২০,০০০ সংখ্যায়। মার্কস মন্তব্য করেছেন: 'British steam and Science uprooted over the whole surface of Hindustan, the Union between agriculture and industry.' তবুও একথা স্বীকার করতে হয়, ইংরেজশাসনের শিল্প-পুঁজির আধিপত্যই এদেশে এনেছিল 'only Social Revolution ever heard of in Asia'. সুতরাং

কেবল অভাবাত্মক দিক নয়, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভাবাত্মক দিকও দেখতে হবে। উনিশ শতকের ইংরেজিশিক্ষিতরা সদ্য-অতীতের সঙ্গে তুলনায় প্রথম পর্বের ইংরেজ শাসনের ভাবাত্মক দিকগুলিকেই বড়ো করে দেখেছিলেন।

কার্ল মার্কস চাষীদের সর্বনাশের কথা মনে রেখেও নব্য শ্রেণীর অগ্রচারী ভূমিকা স্বীকার করেছেন। 'এই নব্য শ্রেণী যেমন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিশ্বস্ত, অনুগত; তেমনি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানেও অভিজ্ঞ'—এই সূত্রেই নতুন চেতনার জাগরণ প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘাত এবং আনুগত্যের মধ্যে বিরোধের মাত্রাভেদ দেখা দিতে লাগল। এর মধ্যেই সমাজপ্রগতির লক্ষণ ফুটে উঠেছে। কার্ল মার্কসের চেয়ে মার্কসবাদী কে আছেন? তিনি নিজে বুদ্ধিজীবী ছিলেন এবং শ্রমিক-সুহৃদ শিল্পপতি এঙ্গেলসের আর্থিক সহায়তার আশ্রয়ে সংসার চালিয়ে গবেষণা করে গেছেন। পৃথিবীর যে-অঞ্চলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সে-অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক শ্রমিক বা মেহনতী মানুষ কি সমাজতন্ত্রের অদ্যাবধি অগ্রগতির পরেও মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা বোঝেন? না বুঝলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়? অথচ এটা তো ঠিক যে তাঁদের চিন্তাধারা অনুসরণেই পৃথিবীর সর্বহারা শ্রেণী শৃঙ্খলমুক্তি ঘটাচ্ছে।

অতএব কার্ল মার্কস অনুসরণে বাংলার নবজাগরণকে গুণগত অর্থে 'কালান্তর' বলতে হবেই। মেঘনাদবধ প্রচলিত রামায়ণ-ধারায় উলটপুরাণ, একেবারেই রসসংস্কারের বিপরীত ভাষণ! তবু যে নব্য সম্প্রদায় তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, তার কারণ রাবণের হাহাকার আসলে দ্বিধাগ্রস্ত নব্যশ্রেণীরই অস্তিত্বের যন্ত্রণাকে রূপ দিয়েছে। বঙ্কিম যতই রক্ষণশীল মূল্যবোধে স্থিত হতে চান, শেক্সপীরিয় ট্রাজেডির ব্যক্তির যন্ত্রণা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। 'এ জীবন লইয়া আমি কি করিব?'—রেনেশাস পর্বেরই চিন্তানায়কের ভাবনা। দেশের শ্রীবৃদ্ধি মানে বুর্জোয়া অর্থনীতির মাথাপিছু গড়পড়তা আয় নয়, রহিম শেখ রামা কৈবর্ত পরাণ মণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধির নিরিখেই তার চূড়ান্ত বিচার। এই কথা তিনিই ভেবেছেন। হয়ত কিশোরীচাঁদ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত তত্ত্বের আকারে তাঁর আগে কিছু লিখেছেন। কিন্তু বঙ্কিমের অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি শিক্ষিত মানুষকে ভাবিয়েছিল:

'এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এতে মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম বিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি ভরিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ি গিয়া আহার করা যাইবে না—এই

চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, নুন লংকা দিয়া আধপেটা খাইবে।'

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফাঁকিটা বঙ্কিম ঠিকই ধরেছিলেন। আবার ক্যাম্বেলের লেখা ইতিহাসে (Modern India : A sketch of the system of civil Government 1852) ব্রিটিশ শাসনের অসঙ্গতির কিছু কিছু সমালোচনা আছে বলে বঙ্কিম তাঁকে স্মরণ করেছেন (উইলিয়ম গ্রে ও স্যর জর্জ ক্যাম্বেল / বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)। লোকরহস্যের বাবু-সমালোচনা কি রেণেশাঁসের সীমাবদ্ধতাকেই প্রকাশ করেনি ?

বিদ্যাসাগর নিয়ে সার্থক গবেষণা বিনয় ঘোষই করেছেন, আবার যাবতীয় কনফিউশনও তিনি ছড়িয়েছেন। 'উনিশ শতকের নবজাগৃতি' নামে তাঁর দুখণ্ড বই ছিল। তাতে শিক্ষিত বাঙালীর অবদান', বিজ্ঞান ও মানবিকী বিদ্যায়, আন্দোলনে কর্মেও জীবনাচরণে —বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ভাবাত্মক দিকগুলির বিশ্লেষণ—সেই সঙ্গে উচ্ছ্বাসমূলক প্রতিবেদন। তারপর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'—তিনখণ্ড বই। পাশ্চাত্ত্য সমাজবিদ ও ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধার করে রেনেশাঁস লক্ষণ বিচার, সেই প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিত্বের উন্মোচন। হঠাৎ মোড় ঘুরল। তিনি আস্তে আস্তে মার্কস থেকে সরে ম্যানহাইমের আশ্রয়ে এসে দাঁড়ালেন। বাংলার বিদ্বৎসমাজ লিখলেন, নানা প্রবন্ধে নিজের কথাকেই ভাঙলেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ সম্বন্ধে নেতিবাচনই তখন মুখ্য। জনগণের নিরিখেই বিচার করলেন।

সংক্ষেপে আমাদের কথা বলি। সোভিয়েত বিপ্লবের পরে জনশিক্ষানীতি কোনরকম গণভোটে স্থির হয়নি। মধ্যবিত্ত বিপ্লবী লেনিন, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী লুনাচারস্কি প্রমুখ তার নীতি নির্ধারণ করেন। জারের আমলে যাঁরা প্রশাসন যন্ত্রের তাঁবেদার শিক্ষাজীবী ছিলেন, তাঁদেরকেই কাজে লাগানো হল। সবই নির্ভর করেছে দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে। তাতে কিছু কুফল ফলে নি।

রামমোহনই প্রথম ফ্রিডম অব প্রেসের দাবি তোলেন। জনগণের কণ্ঠস্বর যাতে ভবিষ্যতে শোনা যায় তার জন্যেই তিনি কান পেতে ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জকে লেখা তাঁর চিঠি কেন যে বেন্থামের মতে দ্বিতীয় অ্যারিওপ্যাজিটিকা তা ৩০, ৩৪, ৩৬, ৩৮ প্রভৃতি অনুচ্ছেদ পড়লে বোঝা যায়। 'একথা সবাই জানেন যে স্বৈরাচারী সরকার স্বভাবতই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন করতে চায় যাতে তাদের নিপীড়নের ঘটনাগুলি না প্রকাশ হয়ে পড়ে।'—এই হল ৩৬নং ধারার ভাবানুবাদ।

'অন্যায়ের শত্রুরা, স্বাধীনতার শত্রুরা পরাজিত হবেই।' এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রামমোহনের। তিনি 'রাজা' হয়ে বিলাত গিয়েছিলেন, তার চেয়ে বড়কথা তিনি

নাগরিক রাজনীতিক (অর্থনীতিকও) দাবির কথা পার্লামেন্টের গোচরে আনতে চেয়েছিলেন। যে-পর্যন্ত অভিজ্ঞতায় জানা যায়—ধনবাদী সভ্যতা নিজের দেশে যতটুকু সৎ হবার ভাণ করে, বিদেশে অর্থাৎ উপনিবেশে তাও থাকে না, সেখানে তার নগ্ন চেহারা—সে-পর্যন্ত অভিজ্ঞতার সুযোগ রামমোহন পাননি।

বিদ্যাসাগর তো টুলো পণ্ডিতবংশের ছেলে। সেদিক থেকে বেদান্ত এবং স্মৃতি দুই তো তাঁর কাছে তুল্যমূল্য হবার কথা। কিন্তু তিনি ন্যায়শাস্ত্র কাব্য এবং ইংরেজি পড়ার ওপর জোর দিলেন। কেন বার্কলে পড়ানো তাঁর মতে অনুচিত সেই যুক্তিগুলি অনুধাবন করলেই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর কত বস্তুবাদী ছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য মহেন্দ্র গুপ্তই প্রথম শবব্যবচ্ছেদে সম্মত বাঙালী। এই বিজ্ঞান মনস্কতা বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার। অঙ্কের পরিবর্তে সংস্কৃত কলেজ শিক্ষাক্রমে তিনি গভীর উদ্দেশ্য নিয়েই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। ছাত্রদের কাছে য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের দরজা জানালা ইংরেজির মাধ্যমেই খুলে যাবে তাঁর ভাষায়—youngmen thus educated will be later able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy.

ব্যক্তির চেষ্টায় সমাজপরিবর্তন অসম্ভব। তাঁর জন্য চাই অর্থনীতিক আমূল পরিবর্তন। এতথ্য তাঁর কাছে সুবিদিত ছিলনা। তাই নিজের ব্যর্থতাকে নিজেরই ব্যর্থতা ভেবে তিনি অপরিসীম কষ্ট পেয়েছেন এবং সভ্যসমাজ ত্যাগ করে কার্মাটারে অনুন্নত মানুষদের সঙ্গ বেছে নিয়েছিলেন। সেখানে দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর কিরকম অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিচিত্রে তা জানা যায়।

স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও আমরা জনসংযোগের কাজে কতটা এগিয়েছি? গ্রামের শোষক মহাজন জোতদারের ভাষা গ্রামের কৃষকেরা যত ভালো বুঝবে, কৃষক স্বার্থে নিয়োজিত শিক্ষিত প্রাবন্ধিকের ভাষা ততটা বুঝবেনা। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন প্রাচীন কালের কথকেরা। আমাদের আড়ালে থাকে পড়া-বইয়ের রপ্ত করা ভাষাভঙ্গি। শ্রোতা ও কথকের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সে-বিচ্ছেদ ঘোচাতে আমরা কজন তৎপর? মাস-মিডিয়া নিয়ে এখন নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে। আমরা প্রতীক্ষায় থাকতে পারি, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা সাধারণের বোধ্য ভাষা রপ্ত করবেন, দরকার হলে ক্ষেত্র-নিরীক্ষা করবেন এবং তারপরে জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যসংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জাতীয় সেবা প্রকল্পে (Nss) ব্যাপারটাকে বুড়ি ছুঁয়ে যাওয়া হচ্ছে মাত্র।

কিন্তু এমন কথা ভাবাই ভ্রমাত্মক যে, যেহেতু জনগণের মুক্তির লক্ষ্য। উনিশ শতকের ভাবুক ও চিন্তানায়কদের কাছে আশু কর্তব্য ছিলনা, তাই তাঁদের ভূমিকা সমাজতত্ত্বের বিচারে তাৎপর্যহীন। কালের সীমায় তাঁদের কর্ম ও জীবন স্ববিরোধ সত্ত্বেও অবশ্যই জনমুক্তির পথ প্রস্তুত করেছে।

নূতন ও পুরনো মূল্যবোধ

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্তা। এই বিজ্ঞানের আগমন প্রথমে ইউরোপে। রেনেশাঁসের পরবর্তীকালে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে। কিন্তু আমাদের দেশে এসেছে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। আধুনিক বিজ্ঞান হল তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ অর্থাৎ এক্সপেরিমেণ্টাল সায়েন্স। বস্তুজগতের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানী নূতন নূতন ব্যাখ্যা খুঁজতে লাগল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য। এ সময় থেকেই পুরনো বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উপর আঘাত পড়ল। নূতন নূতন বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্বাস মানুষের মধ্যে বাসা বাঁধলো।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশল-জাত-দ্রব্য সামগ্রী আমাদের প্রত্যহিক জীবনে খুব-ই প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাব এক অসাধারণ সংযোগ ও সঞ্চারণ মাধ্যম। দূরদর্শন, রেডিও, সংবাদপত্র নিশ্চয়ই প্রচার-মাধ্যম। কিন্তু বিজ্ঞানের কথাটুকু নিজেই এ সব প্রচার-মাধ্যমকে ছাড়িয়ে যায়। যদিও সমাজের এক বৃহৎ অংশ বিজ্ঞানের এই ফলাফলটুর আস্বাদ পাচ্ছে না। এ বঞ্চিতদের কাছে পুরনো মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কাজ করে চলেছে। একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়: শহরাঞ্চলে এখন ঘরের জ্বালানি হিসেবে কাঠ, ঘুটে, কয়লা পুরনো হয়ে গেছে। গ্যাস, হিটারের সাথে পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ লোকের এখনও কোনও প্রকার জ্বালানি কিনবার আর্থিক সঙ্গতি নেই। শুকনো পাতা, কাঠ সংগ্রহ করেই জ্বালানীর প্রয়োজনটুকু মেটায়। শহরাঞ্চলে বায়ুদূষণ মুক্ত করার জন্য ঘটা করে গাছের পূজা চলছে। কোন্ গাছের দূষণমুক্তকরণ ক্ষমতা বেশী সে গাছ লাগান হচ্ছে। শহরাঞ্চলে গাছ কালেক্‌টিভ জীবনে, গবেষণার বিষয়। কিন্তু গ্রামে গাছ এখনও ব্যক্তিজীবনের চাহিদা মিটাচ্ছে। গবেষণার দৃষ্টি এখনও অনুপস্থিত।

আর একটি ঘটনা—মানুষের মধ্যে পুরনো বিশ্বাস কাজ করছে। পাশাপাশি নূতন বিশ্বাস দানা বাঁধছে: পরিকল্পনার অর্থ মঞ্জুর হল নলকূপ বসানোর জন্য। বসানো হল। কিন্তু অধিকাংশ লোক বহুদিনের লোকায়ত বিশ্বাসের মূল্যবোধে গঙ্গার জলই ব্যবহার করতে থাকে। নলকূপ প্রায় অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রইল। এক বৃদ্ধ ত নলকূপের জলে কজনকে স্নান করতে দেখে বলেই বসল: 'ছি! ছি! গঙ্গার জল থাকতে টিউকলে

চ্যান করছো।' গঙ্গার জল দূষিত হচ্ছে, নলকূপের জল ভাল, ধর্মীয় প্রভাব ত্যাগ করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি এক লাইনে উত্তর দিতে না পেরে লোকটি আমতা আমতা করতে থাকে।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যখন সর্বত্র জল সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ করবে তখনই পুরনো অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে। পুরনো বিশ্বাস নির্বাসনে বিজ্ঞান মস্তবড় হাতিয়ার।

মৃত্যুর পর চোখ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার আহ্বানে বিস্তর সাড়া পড়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস মৃত্যুর পর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা নিষেধ। অত্যন্ত আপনজন বা সমাজের কেউ অন্ধ হলে চোখ পাবে, দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবে—এ নূতন বিশ্বাস বিজ্ঞান থেকেই জন্ম নিল। রেনেশাসের আর এক ফলশ্রুতি যুক্তিবাদ ও বিচার বোধ। মৃতদেহের চোখ একজন জীবিতের দৃষ্টি দেবে—এ যুক্তি ও বিচার বিজ্ঞানেরই অবদান। অবশ্যই এখানে একটা অত্যন্ত মানবিক আবেদন আছে। কিন্তু সে মানবিক আবেদন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করল বিজ্ঞান। বহু পূর্বে কৃষিক্ষেত্রে অজন্মা হলে বা আরও অনেক কারণে মানুষকে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হত। বাইবেলের পূর্বভাগ (Old Testament)-এ এর উল্লেখ আছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও এ রূপ জীবনদান করার প্রথা বহুপূর্বেই বন্ধ হয়। সম্ভবত মানবিক দিক থেকে বন্ধ হয়।[১] কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদএর অনুপস্থিতিতে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্থানে বহুদিন পর্যন্ত এ-রীতি দেখা গিয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষ চাষের কাজ শুরু করে ছয় হাজার বছরের অধিককাল। চাষের উপকরণ ছিল প্রকৃতির দান। প্রকৃতির জলধারার ভৌগোলিক নৈকট্যেই চাষ হত। অন্যত্র সম্ভব নয়। আবার প্রকৃতি কৃপণ হলে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ। এই ছিল চিরাচরিত ধারণা। অনাবাদী জমি শতাব্দীর পর শতাব্দী পড়ে ছিল আবাদ অসম্ভব ব'লে। কিন্তু বর্তমানে বাঁধ-পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ায় চাষের জল একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে লাগল। এতকালের আবাদী জমিতে চাষের পদচিহ্ন পড়ল। মরুভূমি আর মরুভূমি হয়ে পড়ে থাকবার জন্য নয়। এরও পরিবর্তন সম্ভব। চাষ না-হওয়ার পিছনে অলৌকিক বিশ্বাস এখন মানুষ করে না।

একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, বিজ্ঞান কিরূপে সংযোগ-সঞ্চারণ করছে? কতকগুলি সত্য বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। এ বিশ্বাস মানুষের মধ্যে কাজ করছে এবং সভ্যতার যাত্রা একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সাধারণ প্রচার-মাধ্যমে যা পরিবেশন করা হয় তা সংবাদটুকু। ঘটনার সৃষ্টি ও পরিণতিতে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যে সংযোগ-সঞ্চারণ করল তা নূতন মূল্যবোধের। অন্য মাধ্যমগুলি সংবাদ পরিবেশন করলেও

বিজ্ঞানের সত্যটুকুর ফলভোগ না করতে পারলে থেকে যায় জন-সংযোগ ও সঞ্চারণ সমস্যা। সাহিত্য ও এক বড়মাপের সংযোগ মাধ্যম।

এমন নিশ্চয়তা নেই যে অক্ষরজ্ঞান হলেই সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লেখক যে দূরদর্শিতা প্রকটিত করতে চেয়েছেন পাঠক তা বুঝবেন। এমন নিশ্চয়তা নেই যে অক্ষরজ্ঞান হলেই লেখকের সৃষ্টি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। এখানেই থেকে যায় লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগের অভাব। কখনই আশা করা যাবে না লেখক ও পাঠকের মানসিকতা একই থাকবে। কিন্তু আশা করা যায় পাঠক সাহিত্যকৃতির মধ্যে এমন কিছু পেয়েছে যা তার মধ্যে কাজ করছে। কিছু বিনিময় হচ্ছে। তাহলেই সার্থকতা যখন লেখক পাঠকের মধ্যে ব্যবধানের মাত্রা কমে আসবে। বিজ্ঞান সে দিকে পথ রচনা করতে পারে। মানসিক আদান-প্রদানের পরিধি বাড়াতে পারে, যদি সকলে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের ফসলটুকুর অংশীদের হতে পারে। সেজন্য বিজ্ঞানীর জ্ঞান সকলেরই অর্জন করতে হবে তা নয়। গ্রামে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছায়নি তার কারণ এ কখনই নয় যে গ্রামবাসীদের তড়িৎশক্তি সম্পর্কে পুঁথিগত জ্ঞান নেই। উপকরণের ব্যবহার সংযোগ-সাধনের পূর্বশর্ত। আজ বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশল যতই উন্নততর পর্যায়ে উঠুক না-কেন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেই এর একটা বিরাট অংশ ব্যয় হচ্ছে। এত বড় পৃথিবীটাকে বিনষ্ট করে দিতে পারবে বর্তমানে মজুত নিউক্লীয় বোমার মাত্র পনের ভাগের এক ভাগ ব্যবহৃত হলে। সহজেই অনুমান করা যায় কি বিপুল টাকা এদিকে ব্যয় হচ্ছে। এক-কথায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে বন্দী। বৃহৎ ও মাঝারী দেশও আজ এই মারণাস্ত্র নির্মাণের পাল্লায় মেতে উঠেছে। ফলে অবিশ্বাসের মাত্রা মারণাস্ত্র নির্মাণকারী দেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই স্বয়ংক্রিয় সংকেত সংগ্রহ এবং দ্রুত ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণের যন্ত্র নির্মাণের পথে। অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে ধরা পড়লে তিন মিনিটের মধ্যে আক্রমণকারী দেশে ক্ষেপনাস্ত্র পাঠিয়ে ধ্বংশ করবে। যন্ত্রের ভুল আছে। যদি কোনও প্রকার ভুল সংকেত আসে—তাহলে স্বাভাবিক মন নিয়ে ভাবা যায়না কি বিরাট ধ্বংশ আসবে। একটি ভুলের মাশুলে ৪২০ কোটি অধ্যুষিত এ-পৃথিবীর মানবের জীবন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে, নতুবা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগোবে। আধুনিক প্রয়োগ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বেকন (Francis Bacon) সম্পর্কে মার্কস বলেছিলেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বেকন-এর বস্তুবাদ মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ দেখাল। তাঁর মহত্তর চেতনায় বস্তু যেন মানুষের কাছে কাব্যময় হয়ে উঠেছে ও হাসছে[২] বেকন ১৬২৬ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। আজ মনে হয় যুদ্ধাস্ত্র দেখে সাড়ে তিন শতাব্দীর ব্যবধানে বস্তুর কাব্যময় হাসি ও সহজলভ্য উজ্জ্বলতা তিরোহিত। বিধ্বংশী অস্ত্রগুলি দেখে কি বলা যায় না

সাড়ে তিন শতাব্দীর ব্যবধানেই আমরা ভাবসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি ? আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ এর ভিত্তিতে তৈরী পরমানবিক বোমা হিরোসিমায় যে ধ্বংশ যাও সংগঠিত করেছিল তা দেখে ক্ষোভে আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'আবার যদি নূতন করে জীবন শুরু করতে পারতাম তা হলে বিজ্ঞানী না হয়ে হতাম একজন মিস্ত্রী।'[৩]

রাষ্ট্র জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাকে রূপ দেবে। মারণাস্ত্রের এ প্রতিযোগিতায় স্পষ্টই দেখা যায় রাষ্ট্রচালক এবং জনগণের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন। যে বিজ্ঞান তার প্রযুক্তি-বিদ্যার মাধ্যমে সংযোগ দৃঢ়তর করতে পারত তা আজ বিপথে চালিত হচ্ছে। একদিকে মাত্র সাড়ে তিনশত বৎসরের ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন আবার রাষ্ট্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

আজকে পৃথিবীতে এই সমস্যাগুলি আছে :

১। কয়েক কোটি মানুষ অনাহারে মারা যায়,

২। প্রায় ৮০ কোটি মানুষ নিরক্ষর,

৩। প্রতিষেধক টিকার অভাবে ডিপথিরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, হাম, পোলিও-মাইলেটিস, যক্ষ্মা ইত্যাদিতে বহু শিশু মারা যাচ্ছে,

৪। ম্যালেরিয়ায় এনকেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে অনেকে,

হিসাব করে দেখা গিয়েছে, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের টাকা যদি উপরোক্ত সমস্তগুলি সমাধানের পেছনে কাজ করত তা হলে অনেকগুলিকেই নিশ্চিহ্ন করা যেত।

অথচ যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন বিগত তিরিশ বছর ধরে কম হয়নি। কম হয়নি বিভিন্ন শান্তি কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রচার। হয়ত ভাবসংযোগে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যুদ্ধ ত হয়নি—এই সান্ত্বনার আড়ালে কোটি কোটি টাকা চলে যাচ্ছে যুদ্ধাস্ত্রের নির্মাণে। অথচ উপরের সমস্যাগুলির মাত্রা আরও বেড়ে চলেছে। রোগীর অব্যর্থ মৃত্যু জেনেও তাৎক্ষণিক বেঁচে আছে—সান্ত্বনাটুকু অনেক হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধাস্ত্রের ভারে পৃথিবী অবনত। তবু যুদ্ধ লাগেনি সান্ত্বনা। এখানেই সংযোগ-সঞ্চারণ এক বিরাট সমস্যা।

পাল্টা অস্ত্র বানান কি এর সমাধান ? কিন্তু এটাই হ'ল ঘটনা। বৃহৎ শক্তি-ই আত্মরক্ষার তাগিদে একই পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করছে। কিন্তু তা সমাধান হিসেবে কাজ করেনি। বরং আরও অধিক টাকা জনকল্যাণ থেকে কেটে আনতে হয়েছে। তাহলে কি বায়ু ও জলদূষণ মুক্ত করার যন্ত্রের মত বিভীষিকাময় বোমার আঘাত প্রশমিত করার কোন প্রয়োগ কৌশল বের করার তাগিদ বেড়ে উঠবে ? এ তাগিদও সমস্যাগুলি বাড়িয়ে তুলবে

'তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়—
সে পরুষ, সে বর্বর, সে মূঢ়।
তার অঙ্গুলি ছিল স্থূল, কলাকৌশলবর্জিত ;
............প্রাণের' পরে ছিল তার অন্ধ ঈর্ষা'

(পৃথিবী ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ আমরা 'আদিপর্বে' নই—আধুনিক পর্বে উত্তরণ ঘটেছে। 'কলাকৌশলবর্জিত' নই—বিজ্ঞানের প্রয়োগসর্বস্বতা নিয়েই চলছি। তবু প্রাণের প্রতি ঈর্ষা অব্যাহত। এ হল কবির প্রাজ্ঞদৃষ্টির উপলব্ধি। তাই তিনি ভাব-সংযোগ-সঞ্চারণে 'পরযুগে' এলেন,

'জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে।
উষা দাড়ালেন পূর্বাচলের শিখরচূড়ায়
পশ্চিম সাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট ॥'

কিন্তু, 'তবু সে আদিম বর্বর আঁকড়ে রইলো তোমার ইতিহাস।' এ হল কবির অন্তর্দৃষ্টি ; আদিকালের সাথে যেন ভাব বিনিময়। অতীতের 'আমি' কে খুঁজছেন আজকে 'আমিকে' প্রতিষ্ঠিত করতে। একই বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশল কবির মত ভাব-বিনিময়ে ব্যস্ত। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমানবিক পদার্থ বিদ্যার ড. উইলার্ড লিবি (Willard Libby) প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের কাল-নির্ণয়ের এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন কসমিক রশ্মির আঘাতে কার্বন—১৪ (C-14)তে রূপান্তরিত হয়। জৈব বস্তু মাত্রেই C-14 গ্রহণ করে। কিন্তু জৈব বস্তুটির মৃত্যুর সাথে সাথেই C-14 নেওয়া বন্ধ হয়। তারপর এক নির্দিষ্ট হারে উক্ত মৃত পদার্থ থেকে C-14 এর বিয়োজন ঘটে। 5,760+30 বৎসরের মধ্যে অর্ধেক C-14 এর বিয়োজন ঘটে। এ পদ্ধতিতে পর্বত গাত্রে বা অন্যান্য স্থানে প্রাচীন নিদর্শনের সঠিক কাল-নির্ণয় সম্ভব।[৪]

মহাকাব্য রামায়ণ মীথ নয়, ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে—এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এ পদ্ধতিতে (C-14) রামায়ণ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যে রত।

হাজার হাজার বছরের পুরনো হারিয়ে যাওয়া দিনের সঠিক কাল-নির্ণয় করে সুদূর অতীতের সাথে সংযোগ সেতু রচনায় নূতন দিগন্ত খুলে দিল। তবু আমরা যুদ্ধাস্ত্রের বিভীষিকার মধ্যে রাষ্ট্রনায়কদের ভাববিচ্ছিন্নতার শীকার।

আজকের বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশল দেখলাম যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে হাত-পা বাঁধা। অনুরূপ ভাবেই কলে-কারখানায় উৎপাদন-শিল্পে এ-বিজ্ঞান মুনাফা সৃষ্টিতে নিত্যক্রিয়াশীল। এগুলি উৎপাদন বাড়াবার কাজে। কিন্তু সে উৎপাদন তাকায় না সমহারে বণ্টনের দিকে। তাকায় না প্রয়োজন-অনুযায়ী উৎপাদনের দিকে। উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা। বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিজ্ঞানটুকু উপাধি বিতরণের জন্য। কিন্তু ফলটুকু শিল্পকারখানার ভাণ্ডারে। নিম্নের উদাহরণই যথেষ্ট যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশল জনকল্যাণের কাজে লাগতে পারছে না।

কেরালায় একটি কারখানা থেকে যে দূষিত জল নদীতে এসে পড়ে তা নদীর জলকে এতই বিষাক্ত করেছে যে মাছ ও অন্যান্য জলজ জীব মরে যেতে লাগল। ফলে বংশানুক্রমে যে সব জেলে মাছ-ধরা পেশায় ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। শুধু তা-ই নয়—উক্ত কারখানা থেকে যে দূষিত গ্যাস বায়ুতে এসে মিশছে তা বায়ুকেও বিষাক্ত করে তুলেছে। ফলে স্থানীয় জনসাধারণ—শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। সরকারী স্বাস্থ্য রিপোর্টে তার বিশদ বিবরণ জানান হল। অথচ কারখানা নিসৃত দূষিত জল ও গ্যাস পরিশোধন করার যান্ত্রিক উপায়ও আছে। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না বার বার বলা সত্ত্বেও। অবশেষে সরকার থেকে চরমপত্র দেওয়া হল—কারখানা বন্ধ করার হুমকি দিয়ে। ওরা বাধ্য হয়ে জল ও বায়ু দূষণ মুক্ত করার ব্যবস্থা নিল। কিন্তু পরে ধরা পড়লো যে অতি কম খরচে দায় সাড়া গোছের একটি ব্যবস্থা নিয়েছে। মুনাফা সৃষ্টি যেখানে লক্ষ্য সেখানে দূষণমুক্তকরণ ব্যয়বাহুল্য।

বিজ্ঞান তার সমস্ত প্রয়োগ-কৌশল নিয়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারছে না। চিকিৎসা শাস্ত্রে বিজ্ঞান আজ প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে। পাশাপাশি ভেজাল অষুধের সংবাদ গড়ে ওঠা বিশ্বাসকে ধূলিসাৎ করে ফেলছে। যে নূতন বিশ্বাস পুরনো বিশ্বাসকে ভেঙ্গে ফেলবে সেখানেই বাধা। মানুষ আশাহত। বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশলকে নিয়ে যারা মুনাফা লুঠছে তারা যেন অপরাজেয়। তাদের শাস্তি দেওয়ার কেউ নেই। সরকার নামক জিনিসটি তারা যেন হাতের মুঠোতে রেখে দিয়েছে।

আমাদের দেশে দলীয় রাজনীতি সংবিধানে স্বীকৃত। আজকে সমস্যার সমাধানে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অনেক। রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে জনগণ অনেক আশা করে। যদি রাজনৈতিক দল সঠিক তত্ত্বের উপর কর্মপন্থা রচনা করে এগিয়ে যেতে পারে তা হলে এক অনন্যসাধারণ পরিচয় বহন করতে পারে, তাহলে পারবে এসব বিশৃঙ্খলা দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে। রাজনৈতিক দলের অবস্থান অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সমাজ ও ব্যক্তির যাবতীয় সমস্যা, সুখদুঃখের প্রতিফলন হবে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। দূরদর্শন, রেডিও, খবরের কাগজ প্রচার মাধ্যম হিসাবে যতখানি সার্থক হবে, রাজনৈতিক দলের প্রচার তার চেয়ে অনেক গভীরে কাজ করবে। কিন্তু অন্ধ বিরোধিতা সংকীর্ণ গণ্ডী রচনা রাজনৈতিক দলকে জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। সেজন্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সুন্দর সামাজিক গুণের অধিকারী হতে হবে। তাহলে জনমানসে সংযোগ স্থাপনের যোগ্য মাধ্যম হতে পারে।

কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিরাট বৈজ্ঞানিক কর্মযজ্ঞ চলছে। কিন্তু আমাদের মত বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে ছোট ছোট গ্রামীণ পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের কি সামিল করা যেত না? অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের সাথে বিজ্ঞানের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মাত। অভাবের তাড়নায় কত ধর্মান্তর হয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ছোঁয়াচ গ্রামবাসীরা যদি পেত তাহলে এক নূতন ধর্মের সন্ধান পেত যা সরিয়ে দিত কুসংস্কার পুরনো বিশ্বাস। খুব অধুনা বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে গ্রামেরই যে সম্পদ আছে তা থেকে যান্ত্রিক শক্তির যোগান দেওয়া যায়। গমকল, ছোটশিল্প, ইটের চুল্লী, বাড়ীর জ্বালানি, জলতোলা প্রভৃতির প্রয়োজনীয় শক্তি গ্রামীণ উৎস থেকেই সংগ্রহ সম্ভব। শুধু প্রয়োজন সক্রিয় কর্মসূচী। তাহলে একটা বিজ্ঞান-চেতনা সৃষ্টির ভিত্তিভূমি রচিত হবে। সফল হবে জন-সংযোগ-সঞ্চারণ।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দামোদর উপত্যকা বাঁধের কর্মযজ্ঞ শুরু হল। অথচ গ্রামের জমির ন্যায্য বণ্টন হল না। বড় চাষী, মাঝারী চাষী, ছোট চাষী ও ভূমিহীন চাষী তাদের নিজ নিজ জায়গায়ই থেকে গেল। দামোদরের জল আসছে চাষের কাজে—রটে গেল। কৃষকেরা বুঝল না কিছু। হাতের চেটো উল্টে ভুরু কুঁচকে আকাশে আগে মেঘ দেখতো আর দিন গুনতো। এখন হাতের চেটো উল্টো করে জীপ গাড়ী আর বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনিয়রবাবুদের দেখছে আর সুদিন আসার দিন গুনছে। এ-সব বিরাট কর্মযজ্ঞের নীট ফল কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উচ্চপদে চাকুরির সম্ভাবনা। ফলে ইঞ্জিনিয়রিং পড়ার ধূম পড়ে গেল। এ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার নামে গ্রাম বাংলা থেকে ক্রমশই সম্ভাবনাময় জীবন দূরে সরে যেতে লাগল। সংযোগের সুতোয় পড়ল টান। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে প্রাথমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে মাধ্যমিকে পড়লেই কোমর বেঁধে লেগে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। কিন্তু শতাব্দীর অবহেলিত গ্রাম ধুকছে। বিনা ওষুধে, চিকিৎসার অব্যবস্থায় ছট্‌ফট্ করছে। তাগা-তাবিজ ও পুরনো বিশ্বাসের স্থান ওষুধ ও হাসপাতাল নিতে পারল না। যেন এক ত্রিশঙ্কু অবস্থা। বিশ্বাসের জমি পরিবর্তিত হলনা। বরং যেটুকু বিশ্বাস ছিল তা হারাতে বসল। এই ছিন্নমূল অবস্থা সমাজকে করে তুলেছে চঞ্চল ও সময় সময় উন্মত্ত। প্রতিবাদের ভাষা যুক্তির সিড়ি বেয়ে উঠতে পারছে না। প্রথম পদক্ষেপেই উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। বস্তুসর্বস্ব জ্ঞান—সুইচ টিপে আলো জ্বালানো ও নিভানোর মত বিশেষ চিন্তাশক্তির প্রয়োজন হয় না। অভাব ও বঞ্চনায় দারিদ্রক্লিষ্টরা সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। আর যাঁরা পারছে তাদের রয়েছে অসহিষ্ণু মন যুক্তিবাদকে গলা টিপবার জন্য।

অথচ রেণেশাঁস-পরবর্তী মানুষের মধ্যে যুক্তির নিরিখই প্রধান। মানুষ প্রচলিত

সমাজের আজ্ঞাবহ জীব শুধু নয়—সমাজের পরিবর্তন সাধনে এক বড় যোদ্ধা। রেনেশাঁসের উল্লেখযোগ্য ফল ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের তাগিদ। লিওনার্দ ছ ভিঞ্চি যাকে বলা যায় রেনেশাঁসের এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব—তাঁর মধ্যে দেখি বিভিন্নমুখী প্রতিভা। শুধুমাত্র চিত্রশিল্পী নন গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং কারিগরী বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি তাঁর। এই ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফাউস্ট-রচয়িতা গ্যেটের মধ্যেও পাওয়া যায়। আবহাওয়া-বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নয়নে গোটের অবদান ছিল অসাধারণ। এ বিষয়ে তিনি একটি পুস্তকও প্রকাশ করেন। ভূতত্ত্ব নিয়েও তাঁর গবেষণা আছে। পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন দিকে তিনি পদচারনা করেন। বিশেষ করে বর্ণালী গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। উদ্ভিদের সম্পর্কে তাঁর গবেষণানিবন্ধও সমাদৃত হয়েছে। এরূপে তিনি বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে গবেষণার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

কিন্তু বহু শাখায় বিভাজিত (Compartmentalised) আজকে বিজ্ঞান সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ নিরুদ্ধ করেছে। বিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশল জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আহরণের হাতিয়ার হয়ে উঠছে। বিভিন্নমুখী জ্ঞানান্বেষণের দাবী ক্রমশই অস্বীকৃত হতে লাগল।

বিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশলে যুদ্ধাস্ত্র ও মুনাফার কাজে নিয়োজিত হওয়ায় তার প্রভাব সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। দৈনন্দিন জীবনে এসেছে স্বচ্ছন্দ ও আরাম উপ-ভোগের সহজতর উপায়। এজন্যও বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। বিশেষত বিজ্ঞান পড়লেই একটা চাকুরী। তারপর আরামদায়ক জীবন। ফলে বিশুদ্ধ জ্ঞান, গভীরতর সামাজিক জ্ঞান ও দৃষ্টি, সুকুমার শিল্পকলা থেকে মানুষ দূরে চলে আসছে। বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জীবনব্যাপী প্রবাহ খণ্ডরূপ নিয়ে গতিহীন। হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মতান্ত্রিক গবেষণার পথ এ ধারাবাহিকতা রক্ষায় অক্ষম হয়ে পড়েছে। আবার উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞানী মুনাফাসর্বস্ব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠেই ধারাবাহিকতার ছেদ টানছে। গ্রীকদের মধ্যে ছিল স্বাধীন চিন্তা ও বিশুদ্ধ জানান্বেষা। কিন্তু ছিল না প্রয়োগ বিদ্যা। তাঁরা জানতে চেয়েছে, করতে চায়নি। গ্রীকপণ্ডিত অ্যারিষ্টোটলকে একজন বিজ্ঞানী বললে বোধ হয় ভুল হবে না। তিনি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু আজকের বস্তুবাদ থেকে তা বহুদূরে। দেহের সঙ্গে আত্মার যে সম্পর্ক ক্রীতদাসের সহিত প্রভুর যে সম্পর্ক, তিনি বিশ্বাস করতেন বস্তুর সঙ্গে মনের সে-সম্পর্ক। তাঁর সম্পর্কে দুটি মজার কাহিনী আছে।[৫] তিনি বিশ্বাস করতেন স্ত্রীলোকের পুরুষের চেয়ে কম দাঁত থাকে। কিন্তু তাঁর দুই স্ত্রী ছিল। অথচ এ বিশ্বাসের যথার্থতা বিচার করেননি। বোধ হয় জানাকেই (to know) বড় করে দেখেছেন, to do অপ্রয়োজনীয়। কুসংস্কারও সেজন্য তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল। তিনি বিশ্বাস করতেন উত্তরদিকের বায়ু প্রবাহের সময়

স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হলে স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কথিত আছে দুই শ্রীমতী অ্যারিষ্টটল সন্ধ্যা হলেই বায়ুর দিকনির্ণয় যন্ত্র (weather cock) এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আর আজকে গ্রীকদের ঠিক বিপরীত গোলার্ধে আমরা। বিজ্ঞানের স্পর্শেই বস্তুসর্বস্বতায় হারিয়ে যাচ্ছি তাও তাৎক্ষণিক ফল লাভের জন্য। সুদূরপ্রসারী স্বাক্ষর আর থাকছে না। তাই শহরাঞ্চলের প্রাচুর্যের কেন্দ্র যতই ছোট হোক-না—সমস্যায় ভরপুর। সমস্যা দারিদ্রে-ঘেরা গ্রামজীবনে। মানুষ হারিয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস। হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুলিশ সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর। এর একটা মস্ত বড কারণ খুব অল্প কয়টি পেশা বাদ দিলে যেমন ডাক্তারী কারিগরী মিলিটারী ইত্যাদি বাকীগুলোর জন্য কোনও পৃথক শিক্ষাগত ও শৃঙ্খলাগত যোগ্যতা কাজ করে না। কেরানি, আমলাতন্ত্র সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মনগড়া যোগ্যতার ধোপে টিকে চাকুরি সংগ্রহ করে। মেডিক্যাল কলেজের মত সরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পেশাগত ট্রেনিং বা পড়ানোর পর চাকুরীর বন্দোবস্ত করলে বোধ হয় বিজ্ঞানসম্মত হত। কেন্দ্রীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষাগুলিও বিজ্ঞানসম্মত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রদের জন্যই। পরীক্ষাগুলিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক মানের ভিত্তিতেই পরিচালিত। পাব্লিক সার্ভিস কমিশন নিজস্ব ছাপ দিয়ে পরীক্ষাটাকে অভিজাত গোষ্ঠীতে বসিয়েছে—ভবিষ্যতের পদমর্যাদার মাপকাঠিতে। ফলে নিজ যোগ্যতা ও পদ-এর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হচ্ছে না। ধার করা জ্ঞান নিয়ে পদমর্যাদা রক্ষা করতে হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইরে সকলেরই এক অবস্থা। স্থান পরিবর্তন করলে অভিযোগকারী অভিযুক্ত। এই পেশাগত শিক্ষার পরিধি না থাকার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য এক অদ্ভুত জায়গায় এসে পৌঁছেছে। সমাজবিজ্ঞান পড়ছি চাকুরির জন্য। সামাজিক প্রয়োজন মিটানো পরের কথা। ফলে পড়াশুনা হয়ে পড়েছে চাকুরি সর্বস্ব। জ্ঞানলাভের উপকরণ হয়ে উঠতে পারছে না

আধুনিক বিজ্ঞানের নিত্যনূতন প্রয়োগ-পর্যায় দেখা দেওয়ায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সংখ্যা বেড়ে গেল। পাঠক্রমে এল বৈচিত্র্য, কিন্তু চাপ পড়ল শিক্ষার্থীদের উপর। পূর্বে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাশ করা যেত, আজ তা আর সম্ভব নয়। ফলে প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার উপর সাধারণ মানুষের সংযোগ বেড়ে গেল। একই সাথে আর একটি অধ্যায়ের যাত্রারম্ভ ঘটল। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যেতে লাগল। পূর্বে একান্নবর্তী সংসার ও সমাজবন্ধন সকলের উপর যে প্রভাব বিস্তার করত তা শিক্ষারই পরিপূরক ছিল। বর্তমানে সেই সামাজিক শক্তি আর কাজ করতে পারছে না। অথচ পূর্বে গৃহ পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর জীবনে যথেষ্ট কাজ

করত। আজ সব কিছুই প্রতিষ্ঠান-সর্বস্ব। সঙ্গীতের ঘরানার স্থান নিয়েছে প্রতিষ্ঠান। সামাজিকীকরণ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন কেননা প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা না পেলে বঞ্চিতেরা চিরকাল বঞ্চিত থেকে যাবে। পরিবর্তন মুহূর্তে যে বাধা থাকে এখন বোধ হয় তারই বহিঃপ্রকাশ। গরম থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডায় যাওয়া অনেক সময় ভাঙ্গন আনে। গৃহপরিবেশ থেকে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ বোধ হয় নির্ভরশীলতার উত্তর দিতে পারছে না। তাই এক-একটি ছোট সংসারের কাছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। আবার ছোট্ট সংসারের আবেষ্টনী শিশুকে ভরিয়ে দিতে পারছে না। আজকে বৃদ্ধরা তাঁদের ছোটবেলার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ভালবাসার গৌরব নিয়ে নিজ নাতিকে পরাজিত করছে। আজকে শিশুর কাকা, জেঠা অতিথি। নিজ সম্মান বাঁচিয়ে তাঁদের যেতে হয়। স্নেহের টান গৌণ। এ গৌণ অধ্যায় ফ্যাকাশে হতে হতে প্রায় অপরিচিত অধ্যায় রচনা করে। শতাব্দী পরে যখন এ ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন অভাব-বোধটুকু থাকবে না। কিন্তু এখন যে সন্ধিস্থল। পুরনো ধারার রেশ এখনও জীবন্ত ও কার্যকর। কিন্তু ক্ষেত্র সঙ্কুচিত। মূল কথাটি—ব্যক্তিসত্তার সাথে সামাজিক অঙ্গগুলির সুস্থিত সম্পর্ক। চাকচিক্যময় শৌখিন জিনিসে বাজার ভর্তি হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই প্রয়োগ-বিজ্ঞানের ফসল। এবং উৎপাদকের হাতযশ (?)। কিন্তু স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত দিশেহারা। এগুলো ঘরে শোভা না পেলে স্ট্যাটাস থাকে না। অথচ কিনতে গিয়ে সর্বস্বান্তের দরজায় এসে পৌঁছতে হয়। ফলে ব্যয়ের মাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। বই কেনার পয়সাও থাকছে না। চাকুরি নিত্যবাজার শৌখিন বাজার করে সময়ও থাকেনা বই পড়ার। সমীকরণটা বজায় থাকল। কিন্তু ফল ভোগ করছে আজকে শিশু—আগামী সমাজের ভবিষ্যৎ। জ্ঞানের বহুতর দিক বিচরণের প্রেরণা সে অনুভব করবে না। অনুভব করবে না জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চা কি। জানবে না, শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রবাহ। শিশুর অগোচরে শূন্যতা থেকে গেল। ঘরের চাকচিক্যময় পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে কিন্তু অভিভাবক চাইবে শিশুর কাছ থেকে তাৎক্ষণিক ফল। সারিডন দিয়ে মাথা ধরা কমানোর মত—পরীক্ষার ফল হয় না। এজন্য চাই বছরের পর বছর প্রচেষ্টা। আজকে প্রচেষ্টা দশ বছর পরে ফল দেবে—এজাতীয় সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও কর্মে পড়েছে ভাটা। কিন্তু এ শিশু যুবক হয়ে শূন্য ভাণ্ডার নিয়ে বৃহত্তর সমাজে যাবে তখন এমন ছাপ পড়বে যে সমস্ত দায়িত্ব তার। প্রয়োজন সংযোগ-সেতুর।

১. Impact of Science and Society : Bertrand Russel. ২. The Human Essence : George Thomson. ৩. সভ্যতার সমাপ্তি কি আসন্ন? জয়ন্ত বসু। শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 1982. ৪. Rock Art of the American Indian : Campbell Grant. ৫. ১নং দ্রষ্টব্য।

দ্বীপ থেকে মহাদেশ

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

ইওনেস্কো-র 'The Chairs' নাটকের শেষ দৃশ্যে ভাড়া-করা বাগ্মী অস্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিপুঞ্জে আপনার বক্তব্য জ্ঞাপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরেছিল। নিজেকে জানাতে না পারায় তার যন্ত্রণার শেষ ছিল না। এই যে যন্ত্রণা বাসা বেঁধেছিল তার অন্তরের গভীর গোপনে, সেই যন্ত্রণার মূল কারণ বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার বোধ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনন্ত বিরহ, একের জগতের সঙ্গে অপরের দুস্তর ব্যবধান—এই রোমান্টিকতা নয়; প্রাণপণ প্রয়াস সত্ত্বেও একালের মানুষ আত্মপ্রকাশে এবং অন্যের হৃদয়ে ভাবসঞ্চারে অক্ষম—এই ছিল উক্ত নাটকের বক্তব্য। বিশ শতকের মানুষদের অন্যতম প্রধান ব্যাধিই হ'ল বিযুক্তি বা alienation। অবশ্য 'ব্যাধি' না বলে 'ব্যাধিবোধ' বলাই সংগত ছিল। ব্যাধির বাহ্য প্রকাশ আছে, কিন্তু ব্যাধিবোধের কারণ কিছু বাহ্য ঘটনা হলেও তার জন্ম ও বিস্তার অন্তরঙ্গ সত্য। মানবিক এবং সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড যথা শ্রমের উৎপাদন, আর্থিক এবং সামাজিক সম্পর্কের বৈচিত্র্য আজকের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জন্ম দিচ্ছে এই 'বোধ' যা আমাদের অন্তর্গত রক্তের মধ্যে খেলা করে।

আর্থিক বৈষম্য, শিক্ষাগত পার্থক্য, ভাষা-নির্ভর দূরত্ব, দীর্ঘকাল মানুষে মানুষে ভেদ ও ভেদবুদ্ধি রচনা করে চলেছে। কায়েমি স্বার্থবাদীরা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই ভেদবুদ্ধির মধ্যে metaphysical কারণ অনুসন্ধান করে আসছে। ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সাহায্য করেছে তাদের। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার বোধ একান্তই ব্যক্তিক। অর্থাৎ যথার্থ বিচ্ছিন্ন থাকা এবং বিচ্ছিন্নতা বোধে পীড়িত হওয়া এক নয়। এই দুই-এর মধ্যে প্রথমটি 'বাস্তবিক' এবং দ্বিতীয়টি 'মানসিক'। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির কারণ-কার্যের সম্পর্ক আছে ঠিকই, কিন্তু মানবতাবাদী দর্শনের বিকাশের আগে দ্বিতীয়টির জন্ম হয় নি। ধর্মান্ধ মধ্যযুগে যা শিরোধার্য ছিল, পরবর্তী অধ্যায়ে তা জিজ্ঞাসা ও সংশয় জাগিয়েছে। 'বিযুক্তিবোধ' তাই মধ্যযুগীয় চেতনার ফল অবশ্যই নয়। 'অহং' বা জ্ঞাতা এবং 'বস্তু' বা জ্ঞেয় কোন অপরিবর্তনীয় চিরস্থির সম্পর্কে বদ্ধ নয়। বিবর্তনশীল বস্তু ও ব্যক্তি বিচিত্র সম্পর্কসূত্রে বদ্ধ হয়ে ইতিহাস রচনা করে চলেছে। এই ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় 'জ্ঞেয়' বস্তুর নিয়ন্ত্রণই প্রধান। আর ভাববাদী ব্যাখ্যায় সৃজনক্ষম চৈতন্যই যেহেতু বস্তুকে সৃষ্টি করে তাই 'জ্ঞাতা'র প্রাধান্য। কিন্তু 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞেয়' যেহেতু কেউই চিরস্থির নয় এবং তাদের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ই ঐতিহাসিক

অগ্রগতির সাধারণ কারণ, অতএব যখনই এই নিয়মের ব্যতিক্রমের ফলে কোন-একটি প্রাধান্য পায়, তখনই ব্যক্তিসত্তার নানা সংকট। সংকট সত্য বলেই এই সংকট অতিক্রম করার পন্থাও মানুষ ভেবেছে। মনস্তাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক, শৈল্পিক প্রভৃতি বিবিধ পন্থা মানুষকে ভাবতে হয়েছে। সুতরাং বিযুক্তি, বিযুক্তির বোধ যেমন সত্য, তেমনি সত্য সংকট থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য. প্রথমেই প্রয়োজন অহং-সর্বস্বতার বিলোপ। মানুষের প্রবল অহং-বোধই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে অপরের কাছ থেকে, সমাজের বন্ধন থেকে।

'আমি চিন্তা করি; অতএব আমি অস্তিত্বশীল'—'দেকার্তএর এই মন্তব্যে 'অহং' অশরীরী এবং তার অস্তিত্ব ও সার্থকতা 'মেটাফিজিকাল' বা আধিবিদ্যক। কিন্তু কাণ্ট অহং-এর পরিবর্তনে ও নিয়ত-গতিময়তায় আস্থাশীল। তুরীয়বাদী কাণ্ট স্বজ্ঞাকে প্রাধান্য দেওয়ায় দেকার্তীয় দ্বৈতবাদ গুরুত্ব পায় নি তাঁর কাছে। তাঁর আগে কল্পনা-শক্তিকে কেউই অতটা গুরুত্ব দেন নি। 'কল্পনা' বস্তুসম্পর্কহীন না হলেও নিত্য-বিবর্তনশীল বস্তু-ব্যক্তির স্থান-কাল সাপেক্ষ সম্পর্কে জন্ম নেয়। 'কল্পনা'র প্রাধান্য স্বীকার করার অর্থ ব্যক্তির স্বাধীনতাকেই স্বীকার করা। কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজসম্পর্কহীন নয়। সর্ববন্ধনমুক্ত চিত্তের অবাধ বিস্তারে তুচ্ছ কাল্পনিকতা জন্ম নিলেও সৃজনাত্মক 'কল্পনা'-র জন্ম হয় না। দার্শনিক হেগেল বিকল্পহীন 'আইডিয়া'র প্রকাশ যে সীমার মধ্যে সন্ধান করেছিলেন সেই সীমা 'ফর্ম' বা রূপে গড়া। 'ফর্ম' নিতান্ত ব্যক্তিক নয়, অনেকটাই প্রথাশাসিত। ফর্মে যদি ভাবাবেগের মুক্তি হয়, তবে সে প্রথা নামক ক্রমবিকশিত সত্যের কাছে ব্যক্তির। সুতরাং সৃষ্টির মুহূর্তে অত্যন্ত উন্নত কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কবিও অসামাজিক হতে পারেন না। ভাববাদী কাণ্ট ও হেগেল-এর মত শোপেনহাওয়ারও ব্যক্তিপ্রধান দর্শনের প্রবক্তা হওয়ায় ব্যক্তি-মুক্তির কথাই বলেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'Will-less state of Knowledge' কথাটিতে। জাগতিক ইচ্ছা বা 'Will' মানুষকে প্রতিটি কর্মে প্রাণিত করে। জাগরণে, স্বপ্নে ও কর্মে Will-এর অবাধ গতি। এই Will-এর বিনাশে সুখ, বিকাশে দুঃখ। আত্মহত্যায় Will-এর বিনাশ হয় না। সুখান্বেষণ ভ্রম নয়, সুখের অভাব দুঃখদায়ক--এই বিশ্বাস সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করে। শোপেনহাওয়ার মানুষের সুখান্বেষণে Will-এর তাড়না বা অহং-এর প্রাবল্য লক্ষ্য করেই অহং-এর মুক্তি বা 'Will-less state of Knowledge'-এ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাব্যতা খুঁজে পেয়েছিলেন সংগীতের মধ্যে। কিন্তু শোপেনহাওয়ার-এর সংগীতপ্রিয়তা বা কাণ্ট-হেগেলের কাব্যপ্রিয়তা সব কিছুর মূলে ব্যক্তির মুক্তি বা ব্যক্তির প্রাধান্যে বিশ্বাস।

শোপেনহাওয়ার-এর জন্ম ১৭৮৮ তে এবং মৃত্যু ১৮৬০-এ। এর মধ্যে সন্তসিমোঁ, ফুরিয়ের ও কোঁত-এর আবির্ভাব ও মৃত্যু ; জার্মানীতে ফয়ারবাখ ও কার্ল মার্কস-এর আবির্ভাব। বিবর্তনবাদী ডারউইন, ওয়ালাশ এবং হার্বার্ট স্পেন্সরও এই পর্বের উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব। শোপেনহাওয়ার পর্যন্ত যে সব ভাববাদী দার্শনিকের কথা আগে বলা হল, তাঁরা ব্যক্তির বিকাশের সূত্র খুঁজছিলেন মুখ্যত ব্যক্তির মধ্যে। কিন্তু সিমোঁ. ফুরিয়ের ভাববাদ-নির্ভর সমাজতন্ত্রের সমর্থন জানিয়ে ব্যক্তিকে তার ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে আন্বিত করলেন। সংগঠন, সহযোগিতা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হ'ল ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বা বিযুক্তির নৈরাশ্যবাদী ধারণার বিলোপ সাধন। তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি সমর্থন জানাতে জানাতেই ধর্মের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখলেন তাঁরা, বিশেষত সিমোঁ। ধর্মবিশ্বাসের প্রধান বন্ধন ব্যক্তির জগৎকে বৃহত্তর মানবজগতের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধির সম্পর্কে আবদ্ধ করে। মার্কস বস্তুকে স্থির জড়পদার্থরূপে গণ্য করলেন না। চৈতন্যকে অস্বীকার করে বস্তুর সর্বগ্রাসী প্রাধান্য তিনি মানতেন না। তাঁর মতে, বস্তু ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তি বস্তুকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে। অর্থাৎ বস্তু ও ব্যক্তি পরস্পরসাপেক্ষ সম্পর্কে বদ্ধ। সংগতকারণেই ধ্রুববাদী কোঁতের 'ego' এবং 'non-ego' বা ব্যক্তি এবং বহির্জগতের সমন্বয়-ভাবনার কথা মনে আসতে পারে। কোঁত বৌদ্ধিক জড়তার ফলরূপে অতীন্দ্রিয়বাদ-কে যেমন বর্জন করেছিলেন, তেমনি অস্বীকার করেছিলেন প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্ব। সমাজতত্ত্বকে, তিনি 'সামাজিক স্থিতিবিদ্যা' ও 'সামাজিক গতি বিদ্যা' এই দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। নীতি, পরিবার স্থিতিবিদ্যা' ও 'সামাজিক গতি বিদ্যা' এই দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। নীতি, পরিবার 'সামাজিক স্থিতিবিদ্যা'র অন্তর্গত, অপরদিকে 'সামাজিক গতিবিদ্যা'র আলোচ্য বিষয় সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন। এইভাবে ব্যক্তি ও বৃহত্তর সমাজকে সম্পর্কিত করে কোঁত ভাববাদী দার্শনিকদের ব্যক্তি-সর্বস্বতা থেকে দূরে সরে এলেন। ধর্ম-নির্ভরতা, অতীন্দ্রিয়বাদে নিষ্ঠা, নির্বিকল্প 'আইডিয়া'র আস্থা বেশ কিছুটা আহত হ'ল ডারউইন-ওয়ালাশ-স্পেন্সার-এর বিবর্তনবাদের আঘাতে। মানুষের বিকাশকে জৈবিক বিবর্তনের সূত্রে লক্ষ্য করে তার মন, বুদ্ধি ও আবেগের পর্যালোচনা অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন মূর্তিতে ব্যক্তিকে দেখার প্রবণতার প্রতিবাদ। স্পেন্সার সমাজতন্ত্রের বিরোধী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। কিন্তু ব্যক্তির সুখ, তাঁর মতে, জীবনের সব কিছুর সঙ্গে ভারসাম্যরক্ষার উপর নির্ভরশীল। সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-৫৫) স্পেন্সারের চেয়ে সাত বছরের বড়ো। কিন্তু স্পেন্সারের নীতিবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত সব বই লেখা

ও প্রকাশ হয়েছিল কিয়েৰ্কেগার্ডের মৃত্যুর পরে। শোপেনহাওয়ার-এর দর্শন প্রভাবিত করেছিল তাঁকে। শোপেনহাওয়ার-এর মত সমাজের উপর বিরাগ জন্মেছিল তাঁর। তাঁর মতে, জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। গোষ্ঠী বা জনজীবনের সমর্থন কামনা নেই তাঁর। রাজনৈতিক সম্মানের মুখাপেক্ষী নন তিনি। ঈশ্বর-বিশ্বাসী কিয়েৰ্কেগার্ড ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব যে ব্যক্তির উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল—সে কথা বলেছেন। সুতরাং তাঁর দর্শনও ব্যক্তিমুখ্য। মানব-অস্তিত্বের সার্থকতা তিনি দেখেছিলেন, সীমা ও অসীমের, ক্ষণিক ও চিরন্তনের সমন্বয়ে। অস্তিবাদীরা প্রত্যেকেই (ধর্মবিশ্বাসী বা মানবতাবাদে বিশ্বাসী) মুখ্যত ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের সার্থকতা-সন্ধানী। এই ভাবে অতীন্দ্রিয় জগৎ, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক কখনও রোমান্টিকতা, কখনও বস্তুবাদ, কখনও অস্তিবাদের জন্ম দিয়েছে। ব্যক্তির সার্থকতা সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে অন্বিত হওয়ার মধ্যে? না কি ব্যক্তির নিজের মধ্যেই? এই দুই প্রশ্নে বিভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্নতা ঘটেছে। জন্ম নিয়েছে বিচিত্র তত্ত্ব। ব্যক্তি বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হয় না কদাপি। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য সমাজকে উপেক্ষা করে সার্থক নয়। সমাজ ও পরিবেশের ঊর্ধ্বে ব্যক্তি নিজেকে স্থাপন করতে চায়, এটা ব্যক্তির চিরকালের অভিলাষ। কিন্তু নিজের গৌরবোজ্জ্বল রূপটি সবার উপরে তুলে ধরতে চাইলেও সেই চাওয়ায় সমাজস্থ অপরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। কোনভাবেই সমাজ-বিযুক্ত ব্যক্তিমানসের বিকাশের কথা ভাবা যায় না। তাই অহং-সর্বস্বতার পরম-বিকশিত মুহূর্তে মানুষ বিযুক্তি-বোধের যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। 'সুখ জনতার মাঝে' এই তত্ত্বে বিশ্বাস না থাকলেও 'একাকীর সুখ নেই' এই সত্য বুদ্ধি বা আবেগ দিয়ে বোঝে মানুষ। সুতরাং নিজ মুদ্রাদোষে বা যে-কোন কারণে যে মানুষ আলাদা, তার এই প্রশ্ন মর্মমূল ছিন্ন করেই উচ্চারিত হয়—'তবু কেন এমন একাকী?' সমাজবদ্ধ থাকা মানবপ্রবৃত্তির অন্যতম মূল লক্ষণ বলে একাকীত্বের যাতনাও মানবস্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত সত্য।

একাকী-ত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ সমাজ বেঁধেছিল। অর্থবহ ভাষা যোগাযোগের মাধ্যমরূপে কাজ করেছে। শব্দার্থের ভাষা ছাড়াও চিত্র, নৃত্য এবং ইঙ্গিতবহ ধ্বনি মানুষকে অপরের সন্নিকট হতে সাহায্য করেছে। এসবের প্রধান ভূমিকাই ছিল আনন্দের মাধ্যমে একের সঙ্গে অপরের স্বাভাবিক ব্যবধান দূর করা। অর্থাৎ বিচিত্র শিল্পকর্মের লক্ষ্য ছিল একটাই—একের ভাব অপরের মধ্যে সঞ্চার করে পরস্পরকে কাছাকাছি আনা। বক্তব্য পৌঁছে দিতে বা ভাবসঞ্চারে মানুষ যখনই নিজের অক্ষমতা লক্ষ্য করেছে, তখনই বিযুক্তির বোধ তাকে গ্রাস করেছে। ইওনেস্কো-র

'The Chairs' নাটকের বাগ্মীর সমস্যাও ছিল ভাবসঞ্চারে অক্ষমতা। ভাবসঞ্চারের প্রধান মাধ্যম ভাষা। 'ভাষা' বলতে শুধু শব্দ বোঝায় না। ছবি, গান, নাচ সবই ভাষা। প্রকাশ-মাধ্যমের ভিন্নত্বই এদের বিভিন্নতার কারণ। জ্ঞাপ্য বিষয় বা ভাবকে জ্ঞাপন করে এই সব ভাষা। শুধু জ্ঞাপন নয়, অপরের মধ্যে 'জ্ঞাপ্য' ভাবকে সঞ্চারিত করে দেয় এই ভাষা। প্রথমটিকে ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলেছেন 'Signans' এবং দ্বিতীয়টিকে 'Signatum'. কিন্তু ভাষা-কে যে অর্থে ধরা হোক না কেন, দৈনন্দিনতার সীমায় তাকে বদ্ধ করলে 'জ্ঞাপ্য'কে শ্রোতার কাছে যথাযথ তুলে ধরা যায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ব্লুমফিল্ড সেই কারণেই ভাষার ভূমিকা ব্যাখ্যায় লিখছেন—'Language enables one person to make a reaction (R) when another person has the stimulus'. ব্লুমফিল্ড Language শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করলেও 'Language' এর জায়গায় Colour, Rhythm ইত্যাদি অন্যকিছুও ব্যবহার করা যেত। ব্লুমফিল্ডের বক্তব্য ছিল এই রকম : বাইরের প্রেরণা (S) বক্তাকে বলার প্রেরণা দেয় (r)। তারপর বক্তা যা বললেন তা দ্বিতীয় বক্তার মনে ভাষা-সম্ভব ভাবপ্রেরণা জাগায় (s) এবং অতঃপর তাঁর মধ্যে সক্রিয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে (R)। সাংকেতিক পদ্ধতিতে ভাষার এই কম্যুনিকেশন কর্মটি এই ভাবে রূপ পেতে পারে : SrsR. দেখা যাচ্ছে ব্লুমফিল্ড জোর দিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিক দিকটির উপর। যদিও ভাবসঞ্চারে মনস্তত্ত্বই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে, তথাপি মাধ্যমের সংকেতধর্ম, সংবাদ ও তথ্যবহনের দক্ষতা সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মূল্যবান হতে পারে।

সমাজজীবনে মানুষের অপরের সন্নিকর্ষ লাভ করতেই হয়। সংবাদ, নারী এবং দ্রব্যসামগ্রী আদান-প্রদানের দ্বারা এই কর্মটি সম্ভব বলে ক্লদ লেভি স্ট্রস অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী স্ট্রসের পদ্ধতিতে ভাষাবিজ্ঞান ও অর্থনীতিকে পরস্পরসাপেক্ষ সূত্রে এনে ফেলা যায়। অবশ্যই অর্থনীতি নানাভাবে সামাজিক মূল্যবোধ ও মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়, কিন্তু মানবিক সম্পর্কের বিবর্তনে অর্থনীতি-কে যদি 'ভিত্তি' বলে মানা যায়, তাহ'লে এই ভিত্তির উপর গড়ে-ওঠা দর্শন, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য নামক অধিসৌধ আরও সূক্ষ্মস্তরে ভাবসঞ্চারের কাজ করে যায়। পূর্বেই আমরা 'ভাষা' শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছি। যে-কোন শিল্পই এক অর্থে ভাষা-নির্ভর। শার্লির মতে ভাষার ধর্ম হ'ল 'to commit oneself to a type of rule-governed behaviour'. যাবতীয় শিল্পকর্মেই নিয়মতান্ত্রিক আচরণ চোখে পড়ে, যে কারণে 'শিল্প' বাস্তব থেকে পৃথক। শিল্পের ভাষাই শিল্পকে ভাবসঞ্চারক্ষম করে। সবাই জানে,

ছবির মত হয় না গাছপালা, নদীনালা বা পাহাড়-পর্বত। কিন্তু কেউ যখন তাঁর দেখার অভিজ্ঞতা ছবিতে তুলে ধরেন, তখন ছবিখানাই হয়ে ওঠে ভাবসঞ্চারক্ষম প্রকৃত সত্য। কারণ হল তার 'rule-governed behaviour'. সাহিত্যের ভাবসঞ্চার-ক্ষমতা আরও কিছুটা বিস্ময়কর। আমরা চিন্তা করি ভাষায়, প্রকাশও করি ভাষায়। কিন্তু সাহিত্যের অর্থবহ শব্দসমষ্টি মূলত প্রতীকধর্মী। শব্দকে আশ্রয় করেই সাহিত্যিক তাঁর অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি জ্ঞাপন ও সঞ্চার করেন। দৈনন্দিন পরিচিত শব্দে তাঁর কাজ চলে না। শব্দসজ্জার মধ্যে তাঁকে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করতে হয়। আলংকারিকেরা তাই শব্দার্থের উর্ধ্বে কাব্যার্থকে স্থাপন করেছিলেন। কাব্যার্থের বোধ গড়ে ওঠে। একদিকে কবি-সাহিত্যিক, অন্যদিকে পাঠক, যোগসূত্র কিছু অর্থবহ শব্দ। যদি সেই শব্দের গূঢ়ার্থ একটিই হত তাহ'লে দীক্ষিত-অদীক্ষিত, রসিক-অরসিক সকলের কাছেই কাব্যের অর্থ হত অভিন্ন। কিন্তু একই কাব্য যখন বিভিন্ন পাঠকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভাবসঞ্চারে সক্ষম, তখন কাব্যশব্দের যে অন্য একটি মাত্রা আছে তা মানতে হবে। সুশান সনটাগ (Susan Sontag), সাহিত্যের বিশেষত কাব্যের ভাষার এই মাত্রাকে বলেছিলেন 'silence' বা নৈঃশব্দ্য। অবশ্য তাঁর মতে, এই নৈঃশব্দ্যের দ্বারাই একজন সাহিত্যিক বা কবি 'frees himself from servile bondage to the world, which appears as patron, client, consumer, antagonist, arbiter, and distorter of his work.' কিন্তু সাহিত্যিক যদি এইভাবে ব্যক্তিগত freedm সন্ধান করেন জগৎকে উপেক্ষা করে, তাহলে শব্দগত নৈঃশব্দ্য সাহিত্যকে সাধারণের থেকে দূরবর্তী করে তোলে। কাণ্ট, হেগেল এবং শোপেনহাওয়ার তাঁদের প্রিয় শিল্পকর্মে স্রষ্টাব্যক্তিরই প্রাধান্য বা মুক্তি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত শিল্পকর্মে নৈঃশব্দ্যই নৈঃশব্দ্যকে অতিক্রম করে পাঠকসাধারণকে পৌঁছে দেয় 'to a speech beyond silence'. যেহেতু আমাদের সব ভাবনাই ভাষায় ব্যক্ত হতে পারে না, সেই কারণেই ইঙ্গিত বা না-বলা বাণী অনেক বেশি গুরুত্ব পায় ব্যক্ত শব্দের চেয়ে। কবিতার চেয়ে গদ্যের ভাষা সরাসরি ভাবসঞ্চার করে বলে প্রতীকবাদী ভালেরি উপন্যাসকে 'আর্ট ফর্ম' বলেই গণ্য করেন নি। শিল্প-সাহিত্যের একটা তির্যক তাৎপর্য থাকে, কিন্তু উপন্যাস যা বলে স্পষ্ট, অতএব তার শিল্পগুণ নেই—এই ছিল ভালেরির বক্তব্য। এ মন্তব্যে চরমতা আছে। সাহিত্যমাত্রই সুসজ্জিত বাণীমূর্তি। যে-মুহূর্তে ভাষা গদ্যে বা পদ্যে ধরা দিচ্ছে, সেই মুহূর্তেই বিন্যাসগত পারিপাট্যহেতু নতুনত্ব যুক্ত হচ্ছে। অতএব কবিতা এবং গদ্য দুইই অন্তত ভাষাগত কারণে সাধারণ সংবাদের উর্ধ্বে। সংবাদের ভাষার জ্ঞাপন ছাড়া অন্য ভূমিকা নেই। সুতরাং তাকে যথাযথ

হতে হয়। দ্ব্যর্থবোধক ভাষা সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক। সাহিত্য জানানো ছাড়াও মনকে জাগায় এবং ভাবায়। কিন্তু তা সম্ভব নয় স্রষ্টা ও রসিকের সামাজিক সত্তাকে অস্বীকার ক'রে। 'ফর্মালিস্ট'-দের বিরুদ্ধে ট্রট্স্কির অভিযোগের কারণ ছিল রসিকদের সামাজিক সত্তার প্রতি 'ফর্মালিস্ট'দের অমনোযোগ। যদি এমন হত, অর্থবহ শব্দে নয়, অসংবদ্ধ ধ্বনিপুঞ্জে কোন সাহিত্যিক তাঁর মনের কথা জানাতে পারলে তুষ্ট হন, স্বস্তি পান, তাহলে তিনি তাই করতেন। কিন্তু পাঠককে উপেক্ষা করে নিজের জগতে বদ্ধ থাকতে পারাই চরম সাফল্য, এমন হলে নির্বাক কবি-সাহিত্যিকে বাজার ছেয়ে যেত। তা কোন কালেই হয় নি। আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত থেকেই ভাবসঞ্চার নিয়ে অনুক্ষণ চিন্তা করতে হয়েছে। সাহিত্যিকের প্রধান সমস্যা হল, নিপুণ প্রকাশভঙ্গিতে নিজের অন্তরের ভাব পাঠকের মধ্যে সঞ্চার করা। কিন্তু যেহেতু লেখক ও পাঠকের মধ্যে দূরত্ব আছে, উভয় পক্ষের অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র এবং ভাষাভঙ্গিও স্বতন্ত্র, সুতরাং ভাবসঞ্চারের উপায় কী? ধরা যাক, কলকাতা অঞ্চলের সুশিক্ষিত এক অধ্যাপক-সাহিত্যিক একখানা উপন্যাস লিখলেন এবং সেই উপন্যাস সুদূর গ্রামের এক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পাঠক আগ্রহভরে পড়তে শুরু করলেন। লেখক সাহিত্যের Standard ভাষা ব্যবহার করেছেন, আর পাঠক আঞ্চলিক ভাষা ছাড়িয়ে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন না। তাহলে কি উক্ত উপন্যাস পাঠকের মনে কোনরকম ভাবসঞ্চারে সক্ষম হবে না? সক্ষম না হলে মুষ্টিমেয় রসিকের সমর্থনের দিকে ঔপন্যাসিককে তাকিয়ে থাকতে হবে। অর্থাৎ বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে ঔপন্যাসিক Communication gap রচনা করে ফেলবেন। 'কম্যুনিকেশন' তখনই ঘটে বা সার্থক হয় যখন কেউ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাজাত অনুভূতি এমনভাবে প্রকাশে সক্ষম হয় যাতে জিজ্ঞাসু মনও সেই অভিজ্ঞতার স্বরূপ উপলব্ধিতে সমর্থ হয়। অবশ্য অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও অনুভূতির গভীরতার তারতম্য-হেতু 'কম্যুনিকেশন'-এর বিভিন্ন রূপ হতে পারে। আই. এ. রিচার্ডস ' A theory of Communication' প্রবন্ধে ভাষার প্রতিক্রিয়াগত তারতম্য নিয়ে আলোচনা করলেও একের সঙ্গে অপরের ভাষার দূরত্ব বা ভিন্নতা নিয়ে কিছু বলেন নি। অথচ ভাষার ভিন্নতায় দাতা ও গ্রহীতার যোগসূত্র যে ক্ষীণ হতে পারে, এমন সম্ভাবনাও যথেষ্ট। শিল্পী-ব্যক্তির বহুরূপী হওয়ার অধিকার থাকলেও সর্বজনবোধ্য হওয়া সম্ভব নয়। অতএব যাবতীয় শিল্পকর্মের মধ্যে কাব্য-সাহিত্যকে ভাববাদী কাণ্ট ও হেগেল সর্বোচ্চ আসন দিলেও কোন সাহিত্যিকই তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমস্ত পাঠকের দূরত্ব দূর করতে সক্ষম নন। শোপেনহাওয়ার ছিলেন সংগীতের শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাবান। কিন্তু সংগীত তো শুধু সুর নয়, শব্দও আছে সেখানে। আমাদের দেশে উত্তরবঙ্গের যে

মানুষটি 'ভাওয়াইয়াগানের' রসিক, রবীন্দ্রসংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান তার কাছে উপাদেয় নাও হতে পারে। দেখা যাচ্ছে, যে ভাষা সামাজিক মানুষের সৃষ্টি এবং মানুষকে সমাজবদ্ধ করেছে, সেই ভাষাই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির কারণ। সুতরাং বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের ব্যাপারটি মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই একটি মানুষ, যে-মাধ্যমই অবলম্বন করুন না, সব লোকের কাছে সব কথা পৌঁছিয়ে দিতে পারেন না। তবে যত বেশী সংখ্যক মানুষকে কেউ আকর্ষণ করতে পারবে, তত তার নিজের সঙ্গে জগতের আর সকলের নৈসর্গিক দূরত্ব দূর হবে। পৃথিবীর রাজনীতিবিদেরা, অর্থনীতির বিশারদেরা, শিল্পীরা নানাভাবে সক্ষম হয়েছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনন্ত বিরহের সমুদ্র—এই ভাববাদী সিদ্ধান্তে আঘাত হানতে। কিন্তু কম্যুনিকেশনের শ্রেষ্ঠ উপায় কে বলতে পারে!



রবীন্দ্রনাথের নাটক ও দর্শক-সংযোগ : ইতিহাসের আলোয়

ধীরেন্দ্র দেবনাথ

'শারদোৎসব' (১৯০৮ খ্রী.) ঋতুনাট্যের ভূমিকায় [1] নাটকটির স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের সুরে বলেছিলেন :

পালাটাতে কী আছে ? যুদ্ধ ?
না।
কোনরকমের রক্তপাত ?
না।
আত্মহত্যা ? পতন ও মূর্ছা ?
একেবারেই না।
আদি রস, বীর রস, করুণ রস ?
না, কোনটাই না।

সেকালের প্রচলিত নাট্যরীতির একটি সাধারণ চেহারা এ থেকে পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথের সকৌতুক কটাক্ষে সেই রীতির প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপও ধরা পড়ে। একথা সাধারণভাবে সত্য যে, সেকালের বেশির ভাগ নাট্যকারই এভাবে একটা চড়া সুরের উপর তাঁদের নাটককে দাঁড় করাতে চাইতেন। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলত চড়া সুরের অভিনয়। নাট্যকারদের সাধারণ দর্শককে জয় করার এই সহজ ও নিরাপদ নাট্যকৌশল সাধারণত ব্যর্থ হত না।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটির কথাই ধরা যাক। এটি সেকালের বহুল-অভিনীত একটি সামাজিক নাটক। সাধারণ রঙ্গালয়ের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয়েছিল এই নাটকের অভিনয় (১৮৭২) দিয়েই। নাটকটির একটি দৃশ্যে দেখা যায়—জেলখানার ভিতরে উড়ুনি-পাকানো দড়িতে গোলোকচন্দ্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ, অপর একটি দৃশ্যে—উন্মাদিনী সাবিত্রীর পুত্রবধূ সরলাকে গলা টিপে হত্যা এবং জ্ঞান ফিরে আসার পরে সাবিত্রীর 'সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্বক ভূতলে পতনান্তর মৃত্যু'। সেকালের অত্যন্ত মঞ্চসফল নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' ও (১৮৮৯) এ-ধরনের অনেক অতি-নাটকীয় উপাদানে পূর্ণ। 'জনা' (১৮৯৪) গিরিশচন্দ্রের সুপরিচিত একটি পৌরাণিক নাটক। নাটকটির একটি দৃশ্যে অতি-দ্রুত পর পর এই ঘটনাগুলি ঘটতে দেখা যায়—যুদ্ধরত অর্জুন ও প্রবীরের প্রবেশ, আহত প্রবীরের মৃত্যু, স্বামীর মৃতদেহ দেখে মদনমঞ্জরীর প্রথমে মূর্ছা, পরে মূর্ছা-ভঙ্গে স্বামীর 'পদতলে পতন ও মৃত্যু'।

[1] নাট্যভূমিকাটি গ্রন্থাবলী-সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয় নি

ঠাকুরবাড়ির পরিবেষ্টনীতেই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয়।[২] বয়সে তখন তিনি বালক। কিন্তু সেই পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ রঙ্গালয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে এমন সাক্ষ্য রবীন্দ্রজীবনের ঘটনাবলী থেকে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে বিশেষ আমন্ত্রণে কখনও কখনও সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে গেছেন, এই মাত্র। সেও দু-একটি ব্যতিক্রম[৩] ছাড়া নিজের নাটকেরই (অথবা, উপন্যাসের নাট্যরূপের) অভিনয়। সুতরাং অনুমান করে নেওয়া চলে, নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহবশেই বাংলা নাটকের তৎকালীন ধারার খবর রবীন্দ্রনাথ রাখতেন। তাই 'শারদোৎসব-'এর ভূমিকায় ওরূপ মন্তব্য করতে পেরেছিলেন।

তাঁর নিজের প্রথমদিকের নাটকও অবশ্য বহিরঙ্গে অনেকটাই এই ধারার অনুগামী। তাঁর প্রথম গদ্যনাটক 'নলিনী' (১৮৮৪)। এই ক্ষুদ্রায়তন ভাবপ্রধান নাটকটির উপসংহারেও একাধিক চরিত্রের মূর্ছা, পতন ও মৃত্যু ঘটে। এর কিছু পরে লেখা 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) নাটকেও আত্মহত্যা, ছিন্নমুণ্ড, পতন, মূর্ছা ও মৃত্যুর প্রদর্শনী। পরবর্তী 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকেও এ-ধরনের উত্তেজক উপাদান পরিমাণে কম হলেও কিছু আছে। সুতরাং এই পর্বের রবীন্দ্রনাথও অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবেন না।

অবশ্য উত্তেজক উপাদানমাত্রেই নাটকে বর্জনীয় হতে পারে না। এসবের একটি মনোরঞ্জিনী শক্তি আছে—সাধারণ দর্শককে যা টেনে রাখতে পারে। এ-শক্তির স্থায়িত্ব ও আবেদন যদিও স্বল্প, কিন্তু একধরনের দর্শক-সংযোগ পরিমিত মাত্রাতে হলেও এ ঘটাতে পারে। নাট্যাভিনয়ের প্রথম যুগে উত্তেজক ও অতি-নাটকীয় উপাদান

---

২ ষোলো বছর বয়সে (১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম আর করবো না' প্রহসনে প্রধান ভূমিকাটি গ্রহণ করেন। অভিনয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই, আত্মীয়-পরিজনদের সামনে। বাড়িতে সংগীত-অভিনয়াদির চর্চা নিয়মিতই হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ মাত্র ১৪ বছর বয়সে একটি দীর্ঘ গীতি-সংলাপ লিখে দেন।

বাড়িতে মাঝে মাঝে যাত্রার আসরও বসত। বালক-রবীন্দ্রনাথ যাত্রাভিনয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। কখনও কখনও সেসব যাত্রাভিনয় দেখার সুযোগ মিলেছে। এভাবে বালক-বয়সেই থিয়েটার ও যাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে।

৩ শিশিরকুমারের প্রযোজনায় 'সীতা' ও 'রীতিমত নাটক'-এর অভিনয় রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন।

ব্যবহারের ঝোঁকটা বোধ হয় সর্বদেশীয়। এমন কি, শেক্স্পিয়রের মতো নাট্যকারের রচনায়ও রোমহর্ষক ঘটনার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর নাটকে জীবনবোধের গভীরতা অবশ্যই প্রশ্নাতীত, কিন্তু তাঁকেও জনরুচির কথা ভেবে অনেক উত্তেজক উপাদান ব্যবহার করতে হয়েছিল। বাংলা নাটক চরিত্রচিত্রণে, সংলাপ-রচনায়, জীবনোপলব্ধির গভীরতায় তাঁর থেকে অনেক পিছনে। ফলে বহিরঙ্গের উত্তেজক উপাদানগুলি বাংলা নাটকে অত্যন্ত প্রকট মনে হয়। নাটকের নিজস্ব দাবিতে যখন এসব উপাদান আসে তখন আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু যখন এরা আরোপিত, কিংবা নিছক চমকসৃষ্টির উপায়রূপে ব্যবহৃত, তখন নাটক আশু কিছু সাফল্য পেলেও শিল্প-রূপে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। একধরনের সহজ প্রলোভনের ফাঁদ এর মধ্যে পাতা থাকে। প্রলোভনটা নাট্যকার ও দর্শক উভয় পক্ষেরই। নাট্যকার সস্তা মনোরঞ্জক প্রলেপ ব্যবহারে প্রলুব্ধ হন, কোনো বড়ো 'চ্যালেঞ্জ'-এর ঝুঁকি না নিয়ে নিজের শক্তিকেই শেষ পর্যন্ত খর্ব করে তোলেন, অন্যদিকে আশুতোষ দর্শক সহজ প্রলোভনের নেশায় অনেক বড়ো প্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য সাধারণ দর্শকের মনস্তুষ্টির কথা ভাবতে হয় নি, কারণ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে তিনি নাটক লেখেন নি। তবু প্রথম পর্বে তিনি অনেকটাই প্রচলিত প্রথার অনুকারী—নিজস্ব শিল্পরীতি তখনও খুঁজে পান নি। অবশ্য এর মধ্যেও তাঁর কবি-প্রতিভা ভিতরের দিক থেকে নাটকে কিছু স্বতন্ত্র স্বাদ নিয়ে এসেছিল।

সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকের কথা না ভাবলেও অন্যরকম দর্শকের ছবি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের মনের সামনে ছিল। সেই দর্শকদের কাছে তিনি কিভাবে কতটা পৌঁছোতে পেরেছিলেন, তাঁর মঞ্চ-প্রযোজনার ইতিহাস থেকেই তা জানো সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াস গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় (১৮৮১)। গীতিনাট্য রূপটি তখন খুবই প্রচলিত। ১৮৭৬ সালে অভিনয়-নিয়ন্ত্রণবিধি প্রবর্তিত হবার পর থেকে অনেক নাট্যকারই গীতিনাট্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তবে সাধারণ রঙ্গালয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটকের স্থান সে সব রচনা নিতে পারে নি। ঠাকুরবাড়ির ব্যাপার একটু অন্য রকমের। সেখানে বরাবরই সংগীত ও অভিনয়ের চর্চা হয়ে আসছে। গীতিনাট্যের স্বল্পকালীন অভিনয় দেখবার মতো সমঝদার ও আগ্রহী লোকের সেখানে অভাব ছিল না। ১৮৭৯ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন গীতিনাট্য 'বসন্ত-উৎসব'। ১৮৮০-তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী মিলে লিখেছেন 'মানময়ী'। এই গীতি-নাট্যটিতে রবীন্দ্রনাথের গানও নেওয়া হয়েছিল। পরের বছর—১৮৮১ সালে—রবীন্দ্রনাথ নিজেই লেখেন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্য। এতে একটিনাট্যকথাকে

সুরে গাঁথা হয়েছে, তবু এর প্রকৃতি 'নাট্যীয়'।[৪] দস্যু বাল্মীকির ভিতরকার কবি-সত্তা কিভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হল, এতে দেখানো হয়েছে এবং সেখানেই এর নাট্যত্ব।

'বাল্মীকি-প্রতিভা' বিদ্বজ্জন সমাগম-এর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হয়। সুতরাং দর্শকমণ্ডলীর কাছে পৌঁছোবার একটা লক্ষ্য রচয়িতার মনে ছিল। গীতি-নাট্যের দর্শক অবশ্য একাধারে দর্শক এবং শ্রোতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্যটিতে গীতি-অংশের শক্তির উপরেই বেশি নির্ভর করেছিলেন। দেশি-বিদেশি সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি দস্তুরমতো বিপ্লব এনেছিলেন। সমকালীন সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় দেখে সকলেই খুশি হয়েছিলেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকায় ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, বিহারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় দেখে এতই মুগ্ধ হন যে, একটা গান পর্যন্ত রচনা করে ফেলেন।[৫]

সেদিনের দর্শকমণ্ডলীর অনেকের কাছেই বালক রবীন্দ্রনাথ বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সুতরাং স্নেহের প্রশ্রয় কিছু থাকা অসম্ভব নয়। তবু যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তরুণ লেখক সেদিন অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তার মূল নিশ্চয়ই রচনাটির মধ্যেই ছিল। যাঁদের জন্য এই গীতিনাট্যটি রচিত হয়েছিল, তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ একে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। এই সাফল্য তাঁকে পরে আরও গীতিনাট্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। উত্তরপর্বে গীতিনাট্যের সঙ্গে নৃত্যের সহযোগ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি নতুন শিল্পরূপের প্রবর্তন করেন। এর নাম দেন নৃত্যনাট্য। প্রকৃতি-বিচারে একে বলা চলে 'গীতি-নৃত্য নাট্য'। নৃত্যনাট্যেও নাট্যত্ব থাকে, তবে নৃত্য ও গীতি-নির্ভর হওয়ায় এর নাট্যস্বভাব স্বাধীন ও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

গীতিনাট্য পুরোপুরি নাটক নয়, তবু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র নাট্যিক প্রকৃতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্যবোধ আত্মপ্রকাশের কিছু পথ খুঁজে নিতে পেরেছে। দুটি উপাদানের শক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা নিশ্চিত হয়েছেন—গান এবং জনতা-চরিত্র। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বাল্মীকির দস্যুদলে ছিল কতকগুলি সাধারণ মানুষ। এরাই নানারূপে জনতার অংশ। পরবর্তীকালে এই গান আর জনতা-চরিত্র রবীন্দ্র-নাটকের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

---

৪ '......যদিও তার ('বাল্মীকি-প্রতিভা'র) উপকরণ গান নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না।' (প্রকৃতির প্রতিশোধ, সূচনা)

৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৩।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বছর তিনেক পরে (১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি লেখেন। 'গানের ছাঁচ'[৩] থেকে সরিয়ে এনে নাটককে এবারে তিনি স্বাধীন শক্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। জনতা-চরিত্রের এ-নাটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগ্য-সাধক সন্ন্যাসী একদিকে, আর অন্যদিকে কলরবমুখর প্রাত্যহিক সংসার। এই অকিঞ্চিৎকর কোলাহল-মুখরতার মধ্যেই সন্ন্যাসী অবশেষে জীবনের সত্যকে খুঁজে পেয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে শুরু করে রাজা-অচলায়তন-পর্ব পার হয়ে মুক্তধারা-রক্তকরবী-রথের রশি অধ্যায়েও নানা রূপান্তরে জনতা-চরিত্র তাৎপর্যময় ভূমিকায় দেখা দিয়েছে। ফলে তত্ত্ব-বক্তব্য যা-ই থাক না কেন, রবীন্দ্রনাথের নাটক জনজীবনের সংলগ্নতা কখনও হারায় না।

আর গান তো তাঁর নাটকের দেহে ও আত্মায় জড়িয়ে আছে। তিনি নিজে গান রচনায় পারদর্শী, গানে সুর দিতেও পারেন এবং অভিনয়ের জন্য তাঁর নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী ছিল না বলে গান-জানা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমস্যা নিয়েও তাঁকে ভাবতে হয় নি। তিনি নিজে যাঁদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে ও জোড়াসাঁকোয় অভিনয় করতেন, সে-দলে এমন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাব ছিল না। তাই গানকে তিনি তাঁর নাটকে প্রচলিত ছকের ঊর্ধ্বে বিশেষ তাৎপর্যময়তা দিতে পেরেছেন। এসব গান যথাযথভাবে উপস্থাপিত হলে নাটকের সঙ্গে দর্শকের যোগ দ্রুত ও নিবিড় হয়ে উঠতে পারে।

নাট্যগীতির বিরুদ্ধে সাধারণ কতকগুলি আপত্তির কথা শোনা যায়। এ-প্রসঙ্গে সেগুলির বিচার করে দেখা যেতে পারে। গান নাটকের গতি ব্যাহত করে, গান অভিনয়-মাধ্যমের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়ে রসগ্রহণে বাধা ঘটায়, গান চলাকালে সহ-অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় অস্বস্তি বোধ করে ইত্যাদি। এসব অসুবিধা কিছু আছে ঠিকই। তবে এর অন্য দিকও আছে। গান নাট্যক্রিয়ায় সাহায্যও করতে পারে—সে-ক্রিয়া সবসময় বাইরে দৃশ্যমান না হতে পারে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত হয়ে চলে। দর্শকের চেতনায় অনেক সময় সংলাপের চেয়েও বড়ো রকমের ধাক্কা দেবার ক্ষমতা রাখে গান। অবশ্য তেমন গান যদি নাট্যকার লিখতে পারেন। সে-শক্তি রবীন্দ্রনাথের নিঃসন্দেহে ছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ী-প্রযোজিত 'তপতী' নাটকের অভিনয় দেখে একজন নাট্যসমালোচক যে-মন্তব্য করেছিলেন এ-প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে, '…রবীন্দ্রনাথের গানের সুর রঙ্গমঞ্চের উপরে যে রকম জমতে পারে, আর কারুর দেওয়া সুর বোধ হয় তা পারে না। রবীন্দ্রনাথের

৩. প্রকৃতির প্রতিশোধ, সূচনা।

সুরের ভিতরে যে অনায়াস গতি আছে, নাটকীয় ক্রিয়াকে এগিয়ে দেওয়ার পক্ষে তা অতিশয় উপযোগী।'[৭] সহ-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যে-অসুবিধার কথা বলা হয়ে থাকে তার খুব গুরুত্ব নেই। সে-অসুবিধা তো গানের বদলে কোনো দীর্ঘ সংলাপ উচ্চারণের সময়েও ঘটতে পারে। দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী এ-ধরনের অসুবিধার মুখোমুখি হবার কৌশল নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিতে জানেন।

নাটকের প্রথম উদ্ভব অভিনয়ের তাগিদে। অভিনীত হবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই নাটক লেখা হত। নাটককে তাই বলা হয়েছে 'দৃশ্যকাব্য'। সুতরাং নাটক লিখবার সময়ে এ-প্রশ্ন নাট্যকারের মনে থাকত—কোনো একটি ঘটনাকে মঞ্চে কতটা দৃশ্যমান করে তোলা সম্ভব হবে, কিংবা উচিত হবে। ক্রমে মঞ্চে আধুনিক শিল্পকৌশল এল—চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মঞ্চের পক্ষে পিছিয়ে থাকা সম্ভবও ছিল না। নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকল। ফলে অসম্ভব ও অনুচিত দৃশ্য উপস্থাপন সম্পর্কে আগেকার অনেক ধারণাই বদলে গেল। অভিনয়ের জন্য নাটক আধুনিক মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও অন্যান্য শিল্পকৌশলের সাহায্য নিতে শুরু করল। দর্শকের সঙ্গে নাটকের সংযোগ-সাধনে এদের ভূমিকা সহায়কের। কোনো জিনিস দৃশ্যমান করে তুলতে পারলে দর্শকের মনে তার ছাপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন তাঁর নাটক প্রযোজনা করেছেন তখন কিছু কিছু শিল্পকৌশলের সাহায্য তিনিও নিয়েছেন। তবে সাধারণভাবে তিনি মঞ্চসজ্জায় সরলতারই পক্ষপাতী ছিলেন।[৮] তাঁর বিখ্যাত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটিতে (১৯০২) এ-সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। নাটকেও তিনি খুব চমকপ্রদ শিল্পকৌশল প্রয়োগের কোনো ইঙ্গিত দিতেন না। 'রক্তকরবী' নাটকে রাজার জালায়ন, 'মুক্তধারা' নাটকে ভৈরব মন্দিরের ত্রিশূলাগ্র চূড়ার বিপরীতে অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রশীর্ষ অমোঘ ও সংযত সংকেত-প্রয়োগের দুটি সার্থক উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের কথা ভেবে, কিংবা তাদের অনুরোধে নাটক লেখেন নি। লিখেছেন তাঁর শিল্পী-মনের তাড়নায়, কখনও বা অন্তরঙ্গজনদের তাগিদে—নিজেদের মধ্যেই অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। অল্প দু-চারটি নাটক বাদে তাঁর সব নাটকই শান্তিনিকেতনে বা জোড়াসাঁকোয় অভিনীত হয়েছে। (প্রধান নাটকগুলির মধ্যে 'রক্তকরবী'র অভিনয় রবীন্দ্রনাথ করে যেতে পারেননি। নন্দিনীর ভূমিকায় উপযুক্ত কোনো অভিনেত্রী পাননি বলে সম্ভব হয়নি।) নাটকের পরিচালনায় এবং প্রধান

৭. নাচঘর, ৩রা মাঘ, ১৩৩৮।

৮. অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' বইটিতে এমন অনেক অভিনয়ের বর্ণনা আছে।

ভূমিকায় প্রায়শ রবীন্দ্রনাথ নিজেই থাকতেন। সুতরাং তাঁর নাটকের অভিনেয়তা নিয়ে তাঁর মনে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেহ ছিল না। অভিনয়ের সাফল্যে, দর্শকদের অভিনন্দনে সেকথা প্রমাণিতও হয়েছে।

এ-সাফল্য অবশ্য অনায়াস-লব্ধ নয়। অভিনয়-ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর অবসরবিনোদন জাতীয় ব্যাপার হতে পারেনি। পরিচালক-রূপে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেমন দক্ষ ও নিয়মানুবর্তী, তেমনি ধৈর্যশীল। সংলাপ উচ্চারণ, মঞ্চে প্রবেশ, অবস্থান ও প্রস্থান, অভিব্যক্তি প্রভৃতি সব দিকেই তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকত। ছোট ভূমিকাগুলির দিকেও রবীন্দ্রনাথ যথোচিত মনোযোগ দিতেন। অভিনয়ের সামগ্রিক সাফল্য কাউকে বাদ দিয়ে বা কোনোদিক অবহেলা করে অর্জন করা যায় না, এ তিনি ভালোই জানতেন। রবীন্দ্রনাথের পরিচালন-দক্ষতার অনেক বিবরণই জানা যায়। এখানে একটির বিস্তৃত উল্লেখ করা হল। রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় 'নটীর পূজা' অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে—১৯২৬ সালের ৭ই মে। মহারানী লোকেশ্বরীর সহচরী মল্লিকার ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতী অমিতা সেন। তিনি লিখেছেন : 'সকলের পাঠ শেখাবার সময় দিনের পর দিন গুরুদেবের যে অপূর্ব অভিনয় দেখেছি তা রঙ্গমঞ্চে একটি বিশেষ ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখার থেকে তো এতটুকু কম আকর্ষণীয় নয়। পাঠ বলবার সময় প্রথমেই তিনি আমাদের উচ্চারণের উপর বিশেষ মনোযোগ দিতেন। সকলের উচ্চারণ বিশুদ্ধ হতেই হতো। তারপর, সে-যুগে তো মাইকের সাহায্য পাওয়া যেত না, এইজন্যে গলার স্বর আমাদের ততখানি চড়াতে হতো যাতে দর্শকের শেষ সারি পর্যন্ত সবাই শুনতে পায়। কথার শেষের দিকে সকলেরই গলার স্বর একটু নেমে আসতে চায় ; গুরুদেব সেদিকে বিশেষ নজর রাখতেন। ...রাজকন্যাদের ছোট ছোট পাঠ তিনি এতোটুকু অবহেলা করতেন না। ধৈর্য ধরে বারেবারে পাঠ বলিয়ে তিনি অভিনয়ের ঠিক সুরটি মেয়েদের ধরিয়ে দিতেন।...

নাচটির সম্বন্ধে গৌরীদিকে (নটীর ভূমিকাভিনেত্রী) গুরুদেব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন, গানের কোন্ কলিতে মনের কী ভাব ব্যক্ত হয়ে উঠবে, কোন্ কলিতে নটী তার গায়ের অলঙ্কার একে একে খসিয়ে ফেলবে। নটীর পোশাকটি, মাথার মুকুটটিও নৃত্যের কমনীয় ভঙ্গীতে খুলে বৈরাগ্যের অনাসক্ত ভঙ্গীতে ত্যাগ করবে।' [৯]

সমকালীন ব্যবসায়িক থিয়েটারের বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে ও অভিনয়ে ভিন্ন একটি ধারা নিয়ে এসেছিলেন। এসব অভিনয় ঠাকুরবাড়ি ও শান্তিনিকেতনের গণ্ডী

৯. 'নটীর পূজার পূজারিণী'—দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮৫, পৃ, ১৭৭— ।

ছাড়িয়ে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে পারলে নবনাট্য আন্দোলনের জন্ম অনেক আগেই ঘটত। তবু এর বীজ এসব রবীন্দ্র-নাট্যপ্রয়াসের মধ্যেই ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিনয়-প্রতিভাও তাঁর নাট্যপ্রযোজনাগুলির সাফল্যের মূলে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতো অভিনেতা মনে করতেন—রবীন্দ্রনাথই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।[১০] নাট্যাভিনয়ে অভিনেতাই নাট্যকার ও দর্শকের মধ্যে সংযোগ-সেতু। গল্প-উপন্যাস-কবিতার মতো নাটকে রচয়িতা সরাসরি দর্শকের কাছে পৌঁছোতে পারেন না। অভিনেতার মাধ্যমেই তাঁকে পৌঁছোতে হয়। নেপথ্য থেকে অভিনেতাকে অবশ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন পরিচালক, কিন্তু দর্শক তাঁকে দেখতে পায় না। শুধু অভিনেতাকেই সে চেনে—প্রত্যক্ষভাবে তাঁর মাধ্যমেই নাটকটাকে সে পাচ্ছে। (নাটকের পাঠ্যমূল্যের একটা দিকও আছে। পরে সেদিকটিও আলোচনায় আসবে। আপাতত আমরা অভিনয়ের দিক থেকে নাটকের দর্শক-সংযোগের সমস্যাটি বিচার করে দেখতে চাইছি।) সুতরাং অভিনেতার ক্ষমতার উপরেও নাটকের সাফল্য-ব্যর্থতা অনেকখানি নির্ভর করে। শক্তিশালী নাটকও এই মধ্যবর্তীদের (পরিচালক-অভিনেতা) অযোগ্যতায় দর্শকের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছোতে বাধা পেতে পারে। আর এই ব্যর্থতার দায় তখন বহন করতে হয় নাট্যকারকেই, তাঁর নাটককেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে যেখানে প্রযোজক-পরিচালক, সেখানে অবশ্য কোনো সমস্যা হয়নি। তাঁর অভিনয়ে, পরিচালনায় তাঁর নাটকগুলি পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে পেরেছে।

কিন্তু এসব অভিনয়ের দর্শকসংখ্যা যেমন ছিল সীমাবদ্ধ তেমনি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। জোড়াসাঁকোয় বা শান্তিনিকেতনে যাঁরা রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয় দেখে উচ্চ প্রশংসা করেছেন, তাঁরা শিক্ষায়, রুচিতে, রসসংস্কারে একটি বিশেষ স্তরের মানুষ। রবীন্দ্র-নাটক গ্রহণের পক্ষে তাঁদের অনেকের মনই ছিল অনুকূল। তাছাড়া যেসব অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে অংশ নিতেন সেখানে তাঁর মঞ্চে-উপস্থিতিই দর্শকের উপর সম্মোহ বিস্তার করত। সে-প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কঠিন। আর দর্শক ব্যক্তিগতভাবে যদি হন রবীন্দ্রানুরাগী, তাহলে তো ফলটা সহজেই অনুমেয়। এ-অবস্থায় নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব নয়। এ-ধরনের কিছু সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে বিপুল পরিমাণ সমকালীন সাক্ষ্য থেকে একথাটিও মেনে নিতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকই একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল। কলকাতায় জোড়াসাঁকো ভবনে ও নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে বিশেষ উপলক্ষে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে

১০ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'মনে এলো'। অমল মিত্রের 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশির কুমার' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৩।

ফাল্গুনী, শারদোৎসব, বিসর্জন, রাজা ও নটীর পূজা নাটকের কয়েকটি অভিনয় হয়েছিল। সাধারণ দর্শকও টিকিট কেটে সে-অভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছেন। কোনো কোনো নাটকে রবীন্দ্রনাথও অংশ নেন (ফাল্গুনীতে অন্ধ বাউল, শারদোৎসব-এ সন্ন্যাসী, বিসর্জন-এ জয়সিংহ)। সব অভিনয়ই উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছিল, তবু দু-এক রাত্রির অভিনয় থেকে সাধারণ দর্শকের প্রতিক্রিয়া আর কতটুকুই বা জানা সম্ভব!

সমাজের এই বিদগ্ধ, রুচিশীল মানুষদের প্রশংসা সত্ত্বেও কি রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো অতৃপ্তি ছিল? সাধারণ রঙ্গালয়গুলি তাঁর নাটক সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়নি। এ নিয়ে তাঁর মনে অভিমান থাকা অসম্ভব নয়। তাই বোধ হয় তিনি শরৎচন্দ্রকে তাঁর 'ষোড়শী' নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন—'আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম, কেননা নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।'[১১] প্রসঙ্গত তিনি একথাও বলেছিলেন—'বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই।' এ-চিঠি যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন (৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৩) ততদিনে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত তাঁর প্রায় সমস্ত বিখ্যাত নাটকই প্রকাশিত হয়ে গেছে। নিজেদের মহলে প্রশংসিত অভিনয়ও হয়ে গেছে। সুতরাং নাটক লিখতে না পারার কথাটা ওঠেই না। একে বিনয়[১২] বা অভিমান প্রকাশ, অথবা দুইই বলে মনে করা যেতে পারে।

৪

রবীন্দ্রনাথের নাটককে সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম নিয়ে আসার চেষ্টা করেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তার আগে দু-একটি বিচ্ছিন্ন, পরিকল্পনাহীন অভিনয় হয়ে থাকলেও তা গুরুত্বহীন। এমারেল্ড থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 'রাজা ও রানী' নাটক অভিনয় এমন একটি উদাহরণ (৩০শে নভেম্বর, ১৮৮৯)।[১৩]

---

১১ পত্রসংকলন, শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ, দশম সম্ভার, পৃ. ৩৬৮।

১২ শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকের প্রশংসা করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। নিজের সম্পর্কে হয়তো তাই আগেই বিনয় প্রকাশ করেছেন।

১৩ এ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'এমারেল্ড থিয়েটার রাজা ও রানী নিয়েছিল। পাবলিক অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস অভিনয় করে। গিরিশ ঘোষ ছিলেন তখন তাতে, সে আবার এক মজার ঘটনা। এখন, আমাদের যখন রাজা ও রানী অভিনয় হয়, সে সময়ে একদিন কী করে পাবলিক অ্যাক্ট্রেসরা ভদ্রলোক সেজে অভিনয় দেখতে ঢুকে পড়ে। আমরা কেউ কিছু জানিনে। আমরা তো তখন সব ছোকরা, বুঝতেই পারিনি কিছু। তারা তো সব দেখেশুনে গেল। এখন পাবলিক স্টেজে রাজা ও রানী অভিনয় করবে, আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। আমরা তো গেছি, রানী সুমিত্রা স্টেজে এল, একেবারে মেজো-জ্যাঠাইমা। গলার সুর, অভিনয়, সাজসজ্জা, ধরন-ধারণ, হুবহু মেজো-জ্যাঠাইমাকে নকল করেছে। মেয়েদের আরো অনেকের নকল করেছিল। রবিকাকাদের নকল করতে পারবে কী করে!'

(ঘরোয়া, অবনীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩৯-১৪০)

৫

রবীন্দ্রনাথের নাটককে যথোচিত দায়িত্বে সাধারণ মঞ্চে নিয়ে আসবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা সেকালে দুর্লভ ব্যাপার ছিল। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, রবীন্দ্র-সাহিত্যের মুগ্ধ পাঠক শিশিরকুমার যখন অধ্যাপনা ছেড়ে সাধারণ মঞ্চে যোগ দিলেন, তখন রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়ের মহৎ প্রলোভনে তিনি ধরা পড়েন। ছাত্রাবস্থাতেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে (১৯১১) য়্যুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সদস্যেরা রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করেন। কেদারের ভূমিকায় ছিলেন তরুণ শিশিরকুমার। সেদিনের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন।[১৪] এরপর একসময়ে শিশিরকুমার অভিনয়ের আকর্ষণে যখন মঞ্চকেই বরণ করে নেন, তখন রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথা তিনি ভোলেননি :

মনোমোহন নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার-প্রযোজিত 'সীতা' নাটকের অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন (১৯২৪)। শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে 'চিরকুমার সভা'-র অভিনয়ের অনুমতি দেন। এজন্য প্রয়োজনমতো নাটকের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করে দেন। তাঁর নতুন নাটক 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করার অধিকারও তিনি শিশিরকুমারকেই দেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই-একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি।' কিন্তু ব্যাপারটা নিশ্চয়ই একপক্ষীয় নয়, উভয়পক্ষীয়। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ যেমন বুঝেছিলেন শিশিরকুমারের হাতে তাঁর নাটকের যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষিত হবে, তেমনি শিশিরকুমারও সাধারণ দর্শকের কাছে রবীন্দ্র-নাটকের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। দর্শকরুচি স্থির, অনড় একটা বস্তু নয়—নাট্যাভিনয় সেই রুচিকে তৈরি করে নিতে পারে, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এ-বিশ্বাস শিশিরকুমারের যেমন ছিল, তেমনি রবীন্দ্র-নাটকের মধ্যেও তিনি এমন কিছু লক্ষণ দেখেছিলেন যাতে তাঁর মনে হয়েছিল এ-নাটক সাধারণ দর্শকের কাছেও পৌঁছোতে পারে। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুটি নাটকের কোনোটিই শিশিরকুমারের পক্ষে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। 'চিরকুমার সভা'-র

---

১৪. অমল হোমকে একটি চিঠিতে (২৩ শে মাঘ, ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'তোমার ইনস্টিটিউটের বন্ধুদের জানিও তাঁদের অভিনয় আমার খুব ভালো লেগেছিল। বৈকুণ্ঠের খাতার এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।'

(অমল মিত্র, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১)

অক্ষয়-চরিত্রে যে ধরনের গায়ক-অভিনেতা শিল্পীর প্রয়োজন, তা তিনি যোগাড় করতে পারেননি। আর 'রক্তকরবী'র ক্ষেত্রে নন্দিনী-চরিত্রের উপযুক্ত অভিনেত্রীও তিনি পাননি।

শিশিরকুমার-প্রযোজিত প্রথম রবীন্দ্র-নাটক 'বিসর্জন', তারপর-'শেষ রক্ষা'—দুটি নাটকই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'শেষ রক্ষা'-র শেষ দৃশ্যে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে শিশিরকুমার বাংলা মঞ্চে দর্শক-সংযোগের ক্ষেত্রে একটি আধুনিক রীতির সূচনা করেন। 'চিরকুমার সভা' শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করতে না পারায় আর্ট থিয়েটার এটি নিয়ে নেন। নাটকটি অভিনয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে, যদিও সেখানে কিছু সস্তা ভাঁড়ামিকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তবে মোটের উপর রবীন্দ্র-নাটক যে সাধারণ দর্শকের কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে, এসব অভিনয়ে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল।

উৎসাহিত হয়ে শিশিরকুমার এরপর ধরলেন 'তপতী'—'রাজা ও রানী'-র আমূল রূপান্তরিত সংস্করণ। নাটকটি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে এর একাধিক অভিনয়ও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেবের ভূমিকায়—তাঁর বয়স তখন ৬৮। শিশিরকুমার এ-নাটক অভিনয় না করে পারেননি। অভিনয় হল (২৫ শে ডিসেম্বর, ১৯২৯) এবং সমালোচকদের উচ্চ প্রশংসায় শিশিরকুমার অভিনন্দিত হলেন। বিক্রমদেবের ভূমিকায় শিশিরকুমার তাঁর সকল পূর্ব-খ্যাতি ম্লান করে দিলেন। ১৯২৪-এর পর এটা ১৯২৯। শিশিরকুমারের প্রতিভা আরও পরিণত। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে আছেন জীবন গাঙ্গুলী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রবি রায়, শৈলেন চৌধুরী, প্রভা ও কঙ্কাবতীর মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সরাসরি গান শিখে নিয়ে সংগীত-পরিচালক সংগীত-শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিপাশার ভূমিকায় কঙ্কাবতীর অভিনয় ও গানের প্রশংসা করেছেন অনেকেই। গান কিভাবে নাট্যক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তাও অলক্ষিত থাকেনি। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট, আলোক-সম্পাত, পোশাক-পরিচ্ছদ—কোনোদিকেই ত্রুটি ছিল না, তবু নাটক চলেনি। মাত্র কয়েক রাত্রির পরেই দর্শকের অভাবে অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়।

কেন এমন হল, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। হয়তো 'শেষ রক্ষা'-র মতো প্রহসন বা 'বিসর্জন'-এর মতো সহজ আবেগ-উদ্দীপক নাটক, সাধারণ দর্শককে যেভাবে খুশি করতে পারে, 'তপতী' নাটকের সে-শক্তি নেই। মনে হয়, শিশিরকুমার একটু বেশি আশাই করেছিলেন। 'তপতী'র মতো জটিল, মনস্তত্ত্বমূলক নাটক জোড়াসাঁকোর বাড়ির দর্শকেরা নিতে পারে, কিন্তু সাধারণ দর্শকের পক্ষে তা নিশ্চয়ই গুরুপাক। 'রাজা

ও রানী'তে যা ছিল মানবিক স্তরের কাহিনী, রূপান্তরিত 'তপতী'-তে তা যেন সুদূর অধ্যাত্মলোকে নির্বাসিত। মৃত্যু-বিচ্ছেদের উর্ধ্বে, অমৃতলোকচেতনায় নাটক যেখানে শেষ হয়, সাধারণ বোধ সেখানে পৌঁছয় না। প্রথম রাত্রির অভিনয়-প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পরেও দর্শকেরা বসে ছিল। তারা বুঝতেই পারেনি যে নাটক শেষ হয়ে গেছে। তারা অন্য কোনো সমাপ্তির প্রত্যাশায় ছিল। শেষে শিশিরকুমারকে এসে জানাতে হয়েছিল যে অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।[১৫] রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এরপর থেকেই সরব হয়ে ওঠে।

৫

শিশিরকুমার এরপর রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ করেন। উপন্যাসের নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন। অভিনয়, মঞ্চ-উপস্থাপন সব দিকেই শিশিরকুমারের প্রতিভার উজ্জ্বল স্পর্শ ছিল। কিন্তু তবু যোগাযোগ 'জনপ্রিয়' হয়নি। রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'নব নাট্যমন্দিরে যোগাযোগ দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন সুসম্পূর্ণপ্রায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না—তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতাদের মনস্তুষ্টি না হয়ে থাকে তবে সেজন্যে নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ীকে দোষ দেওয়া যায় না।'[১৬]

এ-সময়ে আর্ট থিয়েটারও রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। নির্দেশনায় ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা নরেশ মিত্র। 'গোরা' যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তবু মৌলিক নাটক ও উপন্যাসের নাট্যরূপ ঠিক সগোত্র নয়। নাট্যরূপের অভিনয়ের সাফল্য-ব্যর্থতাকে তাই বর্তমান আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন হবে না।

শিশির ভাদুড়ীর পর সাধারণ রঙ্গালয় আর রবীন্দ্র-নাটকের দিকে এগিয়ে আসেনি। মাঝে-মধ্যে 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা'র অভিনয় অবশ্য হয়েছে। কারণ এ-অভিনয়ের ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত, আর বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমন্বয়ে অভিনয় হলে তো কথাই নেই। এরপর এগিয়ে এল নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা নাট্যগোষ্ঠী 'বহুরূপী'। এর কর্ণধার শম্ভু মিত্র রবীন্দ্র-নাটকের অপরিসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক আর শম্ভু মিত্রের গ্রুপ থিয়েটারের দর্শক অবশ্য এক নয়। দুটি থিয়েটারের দর্শকের শ্রেণীচরিত্র,

---

১৫ অমল মিত্র, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার', পৃ. ৩০-১।
১৬ ঐ, (উদ্ধৃতি) পৃ. ৫৪।

নাট্যরুচি ও মানসিকতা অনেকটাই আলাদা। সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শককে রাতারাতি রবীন্দ্র-নাটকে দীক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়—অন্তত সব ধরনের নাটকে নয়। তুলনায় 'বহুরূপী'র দর্শকের একটা বড়ো অংশ একটু প্রাগ্রসর। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যাভিনয়ে যে শ্রেণীর দর্শক পেয়েছিলেন তাকে আর একটু বৃহৎ, আর একটু মধ্যবিত্ত স্তরে ছড়িয়ে দিলে গ্রুপ থিয়েটারের দর্শকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা অবশ্য বাস্তবে এতটা সরল ছিল না—অনেক বাধা ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে 'বহুরূপী'কে এগোতে হয়েছিল, দর্শকরুচিকে গড়ে তুলতেও হয়েছিল। তবু তিরিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশকে অবস্থাটা একটু অনুকূল ছিল বই কি! ভারতীয় গণ-নাট্যসংঘের (১৯৪৮-এ বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলবার আগে পর্যন্ত শম্ভু মিত্রও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একটা নতুন নাট্যচেতনা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্র-নাটক থেকে সে-সুর আলাদা, তবু এই নতুন চেতনা রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণে পরোক্ষে কিছু সহায়তাও করেছে।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবশ্য তখন প্রবল প্রতাপে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও অনেকটা গতানুগতিক ধারায় সামাজিক নাটকের অভিনয় চলছিল।[১৭] তবু 'নতুন ইহুদী'র মতো নাটকও মঞ্চে এসে গেছে। স্বল্প পরিসরে হলেও একটা ভিন্ন রুচিও গড়ে উঠছিল। একে রবীন্দ্র-নাটকের অভিমুখে চালনা করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে 'বহুরূপী'র। অনেক বাধা সামনে ছিল, অনেক প্রশ্ন তাঁদের নিজেদের মনেও ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত

---

১৭ বহুরূপী-র প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৪৮) থেকে 'রক্তকরবী' প্রযোজনা (১৯৫৪) পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকের একটি তালিকা (স্বপন মজুমদার-কৃত) যুক্ত হয়েছে শম্ভু মিত্রের একটি আলোচনায়। সেই তালিকা থেকে প্রধান নামগুলি দেখানো গেল :

বাংলার প্রতাপ, রাণা প্রতাপ, বঙ্গে বর্গী, সাজাহান, মিশরকুমারী, গৈরিক পতাকা, সিরাজদ্দৌলা, চাঁদ বিবি, রিজিয়া, রাজসিংহ, চন্দ্রগুপ্ত, কেদার রায়, চন্দ্রশেখর, বিজয়নগর, সমুদ্রগুপ্ত, ঝান্সীর রানী, তখৎ-এ-তাউস, আলমগীর, দেবলা দেবী, রণজিৎ সিং, পদ্মিনী, ঝিন্দের বন্দী, রঘুবীর।

কর্ণার্জুন, কারাগার, মীরাবাই, জনা, নরনারায়ণ, সাবিত্রী, চাঁদসদাগর।

কালিন্দী, প্রফুল্ল, চরিত্রহীন, পরিচয়, নৌকাডুবি, দুইপুরুষ, পথের দাবী, বিজয়া, দেবদাস, ষোড়শী, চন্দ্রনাথ, দ্বীপান্তর, কঙ্কাবতীর ঘাট, স্বর্ণগোলক, প্রশ্ন, শ্যামলী, কেরানীর জীবন, জীবনটাই নাটক, ভোলা মাস্টার, বলিদান, নতুন ইহুদী প্রভৃতি। (রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা, ভাষ্যকার : শম্ভু মিত্র, লিপিকার : চিত্তরঞ্জন ঘোষ, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৯৫৭, পৃ. ১০৯—১১১।)

সেসব কাটিয়ে উঠেছেন তাঁরা। বহুরূপী-প্রযোজিত রবীন্দ্র-নাটকের তালিকাটি এরূপ: চার অধ্যায় (১৯৫১) [উপন্যাসটি প্রায় নাটকাকারেই লেখা, তাই নাট্যরূপে'চার অধ্যায়' সহজেই মূলের অনুগত], রক্তকরবী (১৯৫৪), স্বর্গীয় প্রহসন (১৯৫৫) [ক্ষুদ্রায়তন কৌতুক-নাটক], ডাকঘর (১৯৫৭), মুক্তধারা (১৯৫৯), বিসর্জন (১৯৫৫) এবং রাজা (১৯৫৫)।[১৮]

রবীন্দ্র-নাটকের ভাষা মঞ্চের উপযোগী নয়, এমন একটি সাধারণ ধারণার কথা শোনা যায়। চার অধ্যায়, রক্তকরবী ও রাজার অভিনয়ে সে-ধারণা ভিত্তিহীন প্রমাণ করে দিয়েছেন 'বহুরূপী'। এসব অভিনয় দর্শকদের কিভাবে নাড়া দিয়েছিল কিংবা আজও দেয়, নাট্যানুরাগীদের সেকথা অজানা নয়। শম্ভু মিত্র একটি প্রশ্নোত্তরে একবার বলেছিলেন: 'রবীন্দ্র-নাটকের ভাষা যদি মঞ্চের উপযোগী না হয় তো আমরা সেটা মঞ্চের ওপর বললামই বা কী করে, আর দর্শকেরা সেটা হৃদয়মন দিয়ে বুঝলেনই বা কী প্রকারে?"[১৯]

সংলাপ-উচ্চারণে 'বহুরূপী' এমন একটা কথোপকথনের ভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন যাতে তা স্বাভাবিক শোনায়। এ-ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না, অভিনয়ের ভিতর দিয়েই তা প্রকাশ পায় এবং তাকে বুঝে নিতে হয়। 'বহুরূপী' দেখিয়ে দিয়েছেন, রবীন্দ্র-নাটকের ভাষা যতই কাব্যময় হোক না কেন, তার মধ্যে এমন একটি 'মহৎ সহজতা' আছে যার ফলে সে-ভাষা ভাব-সঞ্চারে সম্পূর্ণ সক্ষম ও উপযোগী।

এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় শম্ভু মিত্রের একটি দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করতে হচ্ছে।[২০] রবীন্দ্র-নাটকের অভিনেয়তা কোথায়, এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন:

'অভিনেয় কথাটা বোধ হয় দু-অর্থে ব্যবহার হয়। এক বিষয়টা সম্পর্কে; আর অভিনেতাদের অভিনয় করার সুযোগ আছে কিনা সেই সম্পর্কে। তা, এই লেখাগুলোকে যখন সাহিত্যপদবাচ্য বলে ধরা হয় তখন নিশ্চয় বিষয় সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ যেটুকু সেটা হল অভিনেতাদের অভিনয়ের সুযোগ পাওয়া সম্পর্কে, সেটা তো ফলের দ্বারাই প্রমাণ হয়েছে বলে আশা করি।

আমার মনে হয়, একটা নাটক অভিনেয় হয়ে উঠতে পারে দু-দিক দিয়ে। এক,

---

১৮ স্বর্গীয় প্রহসন-এর নির্দেশক ছিলেন অমর গাঙ্গুলী, ডাকঘর-এর নির্দেশক তৃপ্তি মিত্র। বাকিগুলির নির্দেশনায় ছিলেন শম্ভু মিত্র।

১৯ ঐ, পৃ. ১১৩।

২০ 'রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা', ভাষ্যকার: শম্ভু মিত্র, লিপিকার: চিত্তরঞ্জন ঘোষ। দেশ, সাহিত্যসংখ্যা।

চরিত্রগুলো যদি গভীরভাবে আঁকা হয়, যাতে তাদের চরিত্রের গভীরপ্রদেশ পর্যন্ত উন্মোচিত হয় ; আর, চরিত্রগুলো হয়তো ততো নিপুণভাবে ফোটানো নয়, সংলাপও হয়তো কিছু জায়গায় আড়ষ্ট, কিন্তু সেই চরিত্রগুলোই এমন জটিল ঘটনায় মুখোমুখি হয় যে সেই ঘটনাগুলোর সংঘাতেই দর্শকদের মনকে একেবারে মূলে নাড়া দেয়।

এই দুটোই কি রবীন্দ্রনাথের নাটকে নেই ? নন্দিনী, ফাগুলাল, বিশু, চন্দ্রা, সুদর্শনা, সুরঙ্গমা, কাঞ্চীরাজ, সুবর্ণ—এদের চরিত্র কি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অপার সুযোগ দেয় না ? আর, 'রক্তকরবী'র ঘটনা বা 'রাজা'র ঘটনাগুলো কি জটিল নয়, যাতে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নানা স্তরে সেগুলোকে অর্থময় করে তুলতে পারে ? চার অধ্যায় কি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে একটা চ্যালেঞ্জের মতো নয় ? তবে চালু মোটা দাগের অভিনয়ে এগুলো তো করা যায় না। এর জন্যে কলাশিল্পী হতে হয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। আমরা বিনীতভাবে সেই চেষ্টা করেছি মাত্র।'

শম্ভু মিত্রের এ-মন্তব্যকে নিছক-তাত্ত্বিক বলে মনে করার কারণ নেই, রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, আবার তাকে প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। সুতরাং তাঁর অভিমতটি নিঃসন্দেহে মান্য। এর সঙ্গে আর-একটা কথা যোগ করা যেতে পারে, অভিনেয়তার প্রশ্নটিকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর দিক থেকে ছাড়াও দর্শকের দিক থেকেও বিচারের অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ, দর্শকের কাছে নাটককে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে কিনা সেদিকটিও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। 'বহুরূপী'র অভিনয়ে সেটিও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথেও নাট্যধর্মের অভাব নেই এবং মঞ্চের অভিনয়ে নাট্যধর্মের সঙ্গে কাব্যধর্মের প্রতিষ্ঠা দেওয়াও সম্ভব ; এবং দর্শক একে গ্রহণ করতেও পারে। 'রাজা'-র মতো আধ্যাত্মিক বক্তব্যমূলক সাংকেতিক নাটকের মঞ্চরূপায়ণও তাই সফল হতে পেরেছে।

আধুনিক কালের মঞ্চাভিনয়ে আবহসৃষ্টি, মঞ্চস্থাপত্য, দৃশ্য-পরিকল্পনা প্রভৃতির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। শুধু সংলাপ-নির্ভর অভিনয়ে ভাবগূঢ় নাটকের বক্তব্য পুরোপুরি হয়তো প্রকাশও পায় না। 'বহুরূপী'কেও মঞ্চকলার বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবতে হয়েছিল। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। 'রক্তকরবী'-র মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন খালেদ চৌধুরী। এ-নাটকে ত্রিস্তর-মঞ্চ পরিকল্পনা করা হয়েছিল—চরিত্রগুলির শ্রেণীগত বৈষম্য বোঝাতে এবং সেটা নাটকেরই প্রয়োজনে। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : 'যক্ষপুরীর সমাজ বহুস্তরে বিভক্ত, এখানে ছোটরা নিচে থাকে, বড়রা উপরে। এবং সমস্ত মিলিয়ে সমাজটার এমন একটা জগদ্দল পাথরের মতো চেহারা আছে যেটা ভারী আর কঠিন। 'রক্তকরবী'র মঞ্চসজ্জায় সেই নিষ্প্রাণ পাথরের কাঠিন্য

ঋজুরেখার পরিকল্পনায় ধরবার চেষ্টা হয়েছিল।'[২১] তেমনি উপযুক্ত আবহনির্মাণও যে অভিনয়কে কিভাবে সাহায্য করতে পারে, 'বহুরূপী' তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। 'চার অধ্যায়'-এ প্রতি দৃশ্যের শেষে গুলির শব্দ ও কোরাসে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি, দূরাগত ট্রেনের হুইস্ল্-এর শব্দ, শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর কালো যবনিকার পশ্চাৎপটে বারোটা বাজার অমঙ্গলসূচক সংকেত, সাদা আলোর বিভিন্ন তারতম্যে ব্যবহার প্রভৃতির সাহায্যে এমন একটি আবহ তৈরি করা হয়েছিল যা বিষয়বস্তু ও অভিনয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। 'রক্তকরবী'তেও আবহসৃষ্টিতে অনুরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আলোক-সম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন তাপস সেন। তাঁর মতে—'রক্তকরবী নাটকের প্রায়-অসম্ভব মঞ্চপ্রয়াসকে শ্রীশম্ভুমিত্র সম্ভব করতে পেরেছিলেন অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত-সহ প্রতিটি অঙ্গের সার্থক সমন্বয়ে।' [২২]

'বহুরূপী'র উদাহরণে উৎসাহিত হয়ে সাম্প্রতিক কালে আরও কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু নাটক (কখনও বা উপন্যাস বা ছোটগল্পের নাট্যরূপ) মঞ্চস্থ করেছেন। শৌখিন নাট্যাভিনয়েও রবীন্দ্রনাথকে কখনও কখনও গ্রহণ করতে দেখা গেছে। 'মালিনী', 'গৃহপ্রবেশ', 'মুক্তধারা' 'বিসর্জন', 'বাঁশরি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' 'মাল্যদান', 'দালিয়া' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। কোনো প্রযোজনাই হয়তো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়—কেউ কেউ হয়তো রবীন্দ্র-নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারটাকে আভিজাত্যের পরিচয়রূপে দেখেছেন, তবু রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে একটি গ্রহণশীল মনোভাবের ক্রমপ্রসার যে ঘটছে, সেকথা সম্ভবত বলা যায়।

৩

তবু এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয় মুখ্যত গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যেই

---

২১ খালেদ চৌধুরী, 'মঞ্চসজ্জা: প্রাথমিক দায়িত্ব', পরিচয়, পৌষ, ১৩৭২ (সুনীল দত্তের 'জীবনধর্মী নাট্য-প্রয়োজনার রূপ ও রেখা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৯-১৪০)

২২ তাপস সেন, থিয়েটারে নতুন আলো, পরিচয়, পৌষ, ১৩৭২ (ঐ, পৃ. ১২৭)

বহুরূপী সব অভিনয়ে অবশ্য সমান সফল নন। রবীন্দ্রনাথের সব নাটক তাঁরা মঞ্চস্থও করেন নি। প্রত্যেক নাট্যগোষ্ঠীরই শক্তি ও প্রবণতার একটা সীমাবদ্ধতা থাকেই। 'বহুরূপী'রও ছিল। এর মধ্যেও তাঁরা প্রমাণ রেখেছেন যে রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে প্রচলিত অনেক ধারণাই মিথ্যা। রবীন্দ্র-নাটক মঞ্চোপযোগী নাটকই। রবীন্দ্রনাথের কমেডি-প্রহসনের অভিনয় যদিও তাঁরা করেন নি কিন্তু এদের দর্শক-জয়ের ক্ষমতা নতুন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

সীমাবদ্ধ। আর গ্রুপ থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক প্রধানত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যে 'বহুরূপী' গোষ্ঠী রবীন্দ্র-নাটককে জনপ্রিয় করে তুলতে যথেষ্ট সফল হয়েছেন তাঁদের অভিনয় কলকাতার মঞ্চেই আবদ্ধ। সেসব অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ের মতো নিয়মিতও নয়। দু-তিন মাস বাদে একটি অভিনয়। কখনও ব্যবধানটা আরও বেশি। কলকাতার থিয়েটারপ্রেমী দর্শকদের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশেই প্রেক্ষাগৃহ তাই সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের মতো নিয়মিত অভিনয় হলে চিত্রটা কেমন হত বলা যায় না। প্রশ্ন জাগে, এসব অভিনয়ের দর্শকেরা শিক্ষাসংস্কৃতিগত কোন্ স্তরের মানুষ? সাধারণ থিয়েটারে যাঁরা ভিড় করেন তাঁদের কতটা অংশই বা এখানে আসেন? রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে দুই শ্রেণীর দর্শকের প্রতিক্রিয়ায় কি ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? রবীন্দ্র-নাটকের পুনরভিনয়ে আগ্রহী দর্শকের সংখ্যাই বা কিরূপ? (সাধারণ রঙ্গালয়গুলি যখন কলকাতাতেই, তখন শুধু রবীন্দ্র-নাটককে গ্রামে নিয়ে গিয়ে আলাদা করে গ্রাম্য মানুষদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন নেই।) দর্শক-সংযোগের বিষয়টিকে সম্যক্‌ভাবে বুঝতে হলে এ-ধরনের অনেক পরিসংখ্যানের প্রয়োজন।

আপাতত শুধু এটুকু বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত শৌখিন নাট্যাভিনয়ের দর্শক, শিশিরকুমার-প্রযোজিত রবীন্দ্র-নাটকের সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক এবং বহুরূপী-প্রযোজিত নাটকের গ্রুপ থিয়েটারের দর্শক—এঁদের শ্রেণীচরিত্র, রুচি ও মানসিক কর্ষণা ভিন্ন, রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে এঁদের প্রতিক্রিয়াও তাই এক নয়। একই নাটক—যেমন 'বিসর্জন'—তিন শ্রেণীর দর্শকের সামনেই অভিনীত হয়েছে, কিন্তু তার আবেদন ও দর্শক-সংযোগ স্বভাবতই একরূপ হয়নি। শুধু দর্শকের শ্রেণীচরিত্রেই নয়, প্রযোজনার পার্থক্যেও এর কারণ সন্ধান করতে হবে।

বিভিন্ন পর্বের এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হয়ে এলেও রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে চূড়ান্ত কথাটি বলা এখনও সম্ভব নয়। দু-পাঁচটি 'বহুরূপী'রই বা রবীন্দ্র-নাটককে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার সাধ্য কতটুকু! অথচ ভরসা করার মতো আশ্রয় তো অন্য কোথাও দেখাও যাচ্ছে না। 'বহুরূপী'র সাফল্য সত্ত্বেও সাধারণ রঙ্গালয় তো এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে তাদের ঔদাসীন্য বজায় রেখেই চলেছে। অনুমান করা চলে, এ-নাটকের ব্যবসায়িক সাফল্য সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়। কিন্তু সে-নিশ্চয়তার বোধ আসবেই বা কিভাবে! তারা যদি ঝুঁকি না নেয়, দর্শকের রুচি তৈরি করার দায়িত্ব না নেয়, তাহলে তো এ-অবস্থাই চলতে থাকবে। গ্রুপ থিয়েটার দর্শকরুচি তৈরি করে দেবে, আর সাধারণ রঙ্গালয় তাকে নিজের অনুকূলে কাজে

লাগাবে, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। দর্শকরুচি সম্পর্কে যে-অভিযোগ এনে সাধারণ রঙ্গালয় নিজের দায়িত্ব এড়াতে চায়, সে-বিষয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। রবীন্দ্র-নাটক যে সাধারণ দর্শকের কাছে অরুচিকর, এমন কথা বিনা তথ্য-প্রমাণে আজ অন্তত আর মেনে নেওয়া চলে না। শিশিরকুমারের 'তপতী' অভিনয়ের অনুরূপ অভিজ্ঞতা কখনও ঘটতেও পারে। কারণ সব শিল্প সকলের জন্য নয়, সব নাটকও সকলের জন্য নয়। এমন কি, সব নাটকই হয়তো সমান অভিনয়যোগ্য নয়। তবে ব্যাপারটা প্রমাণসিদ্ধ হওয়া চাই। পূর্বসংস্কার বা অনুমান নয়, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত চাই। আসলে এই মন-গড়া, সুবিধাজনক সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি তাদের খুশিমত নাটক দর্শকদের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। দীর্ঘকাল আগে (১৯০৬) ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় গিরিশ-যুগের নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন—আমাদের দেশে দর্শকের রুচির স্বাধীনতা নেই, নাট্যশালাগুলিই দর্শকরুচিকে নিয়ন্ত্রণ করছে,[২৩] সে-অবস্থার এখনও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

রবীন্দ্র-নাটক প্রযোজনায় ব্যবহারিক কিছু অসুবিধা অবশ্য আছে। অনেক নাটকেই রবীন্দ্র-সংগীতে দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রয়োজন হয়। সব সময়ে এমন শিল্পী হাতের কাছে পাওয়া যায় না। শিশিরকুমারের সেই অক্ষয়-সংগ্রহের সমস্যা একালেও রয়ে গেছে। গ্রুপ থিয়েটারেও—বহুরূপীর প্রযোজনায় 'বিসর্জন' নাটকে জয়সিংহের গলায় গান বাদ পড়ে। 'রাজা' নাটকে রাজা ও রানী সুদর্শনার গানও বাদ পড়ে। এতে দর্শক-সংযোগের একটা বড়ো উপকরণই ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু অবস্থাটা মেনে না নিয়ে উপায়ও থাকে না। সে-ক্ষতির অনেকটাই অবশ্য 'বহুরূপী' তাঁদের অভিনয়ে পূরণ করে দিতে পারেন। সাধারণ রঙ্গালয়গুলি এতটা স্বাধীনতা নিতে ভরসা পায় না। তাছাড়া, 'বহুরূপী' রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়ে এমন একটা উঁচু মান তৈরি করে দিয়েছেন যে, এদের কাছে সেটিও একটা ভয়ের বড়ো কারণ হয়ে রয়েছে। এভাবে কখনও নিজেদের সংকীর্ণ ব্যবসায়িক স্বার্থে, কিংবা কখনও আত্মপ্রত্যয় ও দূরদৃষ্টির অভাবে, কখনও ঝুঁকি নেবার সাহসের অভাবে, কখনও বা ব্যবহারিক কোনো অসুবিধার দরুন সাধারণ রঙ্গালয়গুলি রবীন্দ্র-নাটককে বর্জন করে চলেছে। এদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত এ-অবস্থাই চলতে থাকবে এবং রবীন্দ্র-নাটক বহু দর্শকের কাছে পৌঁছোবার সুযোগই পাবে না। আর সুযোগ না পেলে তার দর্শক-

২৩ ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালা', সম্পাদনা, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত ও ডঃ বিষ্ণু বসু, পৃ. ৯৯।

সংযোগের ক্ষমতায় সম্যক্ পরীক্ষাও হবে না। রবীন্দ্রনাথের দেশে সুযোগের অভাবে যদি এই সংযোগ ঘটতে না পারে, তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে! আর দর্শকের রসগ্রহণের অক্ষমতায় যদি এটা ঘটে, তবে সেটাও হবে দুঃখজনক। কারণ এই অক্ষমতাটা মানব-চিত্তের স্থায়ী লক্ষণ নয়। নাটক দেখতে দেখতে নতুন দৃষ্টি তৈরি হয়, নতুন বোধ গড়ে ওঠে। এর একটা পরীক্ষা হওয়া উচিত।

তবে অভিনেয়তার দিকটি মেনে নিলেও অন্য সমস্যা থাকবেই। বাস্তবে আজ থেকে অনেক কাল পরেও একটি বৃহৎ সংখ্যক মানুষ রবীন্দ্র-নাটক থেকে দূরেই রয়ে যাবেন—কোনো-না-কোনো ভাবে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে। এ-অবস্থাটা যখন অনিবার্য, সেক্ষেত্রে নাটকের অন্যবিধ সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখা যেতে পারে। সব নাটককেই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা করতেই হবে (প্রচলিত সংজ্ঞায় নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য), এ-সংস্কার ত্যাগ করা দরকার। বর্তমান কালে প্রায় সব দেশেই নাটকের সংখ্যা যেরূপ বেড়ে গেছে এবং যেহেতু এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে মঞ্চের সংখ্যা বাড়েনি, তাই অনেক নাটকই শেষ পর্যন্ত অনভিনীত থেকে যাবে। এ-অবস্থায় নাটকের পাঠ-অভিনয়-রীতির প্রবর্তন করা যেতে পারে। মঞ্চাভিনয়ের মতো অতটা শক্তি যদিও এর নেই, তবু এর সম্ভাবনাকে বেশ খানিকটা কাজে লাগানো সম্ভব। এছাড়া, পাঠ্য সাহিত্যরূপেও নাটককে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করা দরকার। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে পাঠকের সংখ্যাও একালে অনেক বেড়ে গেছে। নাটক যদি পাঠ্য সাহিত্যরূপে এই বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠীর রসপিপাসা মেটাতে পারে—অর্থাৎ দর্শক-সংযোগের বদলে যদি পাঠক-সংযোগ ঘটাতে পারে, তবে সে-সার্থকতার মূল্যও কম নয়। একটি নাট্যাভিনয় একই সঙ্গে অসংখ্য দর্শককে নাড়া দিতে পারে, সে-ব্যাপারটা এতে ঘটবে না, গণচেতনামূলক নাটকের সম্মিলিত দর্শকসমাজের উপর উত্তেজক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সুযোগও এতে থাকবে না সত্য, কিন্তু অভিনয়ের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পাওয়ায় এর অন্য ধরনের সুবিধা বেড়ে যাবে। বিদেশী নাটকের ক-টা অভিনয় আমরা দেখতে পাই, অথচ পাঠ্যসাহিত্যরূপে তাদের আস্বাদ-গ্রহণে কোথাও তো বাধা ঘটে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকও মহৎ সাহিত্যমূল্যে অনায়াসেই পাঠকদের আকর্ষণ করে নেবে। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ও অনেক সময় যে-সংযোগ ঘটাতে পারেনি, হয়তো পাঠকের একক মানস অভিনয়ে সে-সংযোগ ঘটতে পারবে, অথবা তাঁরা যেভাবে যতটুকু সংযোগ ঘটিয়েছেন, তার চেয়ে আরও নিবিড়ভাবে ঘটতে পারবে।

সংযোগের মাত্রা ও ভাষাবৈচিত্র্য

আশিস্‌কুমার দে

আমরা বাংলা বললেও সকলে এক রকম বাংলা বলি না। কলকাতায় যেমন আদর্শ চলিত বাংলা চালু আছে বলে মনে করি, তাও সব জায়গায় এক জাতীয় নয়। সচ্ছল মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যে বাংলা বলে তা হল বাংলার স্বীকৃত উচ্চারণ (রিসিভড প্রোনান্‌সিএই শেন)। ঐতিহ্য-অর্থ-শিক্ষাহীন ছেলেমেয়ে বা বয়স্কদের মুখে যা শোনা যায় তা হল অশুদ্ধ বাংলা (নন-স্ট্যাণ্ডার্ড)। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিন্যাস, শিক্ষার হেরফের, ঐতিহ্য বা ঐতিহ্যহীনতা ভাষার উচ্চারণের মানক হয়ে যায়। আবার কলকাতার আশেপাশে ও দূরে যে বাংলা শুনি তাও কলকাতার আদর্শ বাংলার সঙ্গে দুস্তর ফারাকওয়ালা। বরেন্দ্রী বা কামরূপী বাংলা প্রথম শুনলে মনে হবে এ যেন অচেনা ভাষা। এই স্থানগত ভাষা-স্বাতন্ত্র্যের নাম উপভাষা। স্বাতন্ত্র্য কোনকালেই মর্যাদা পায় না অধিকারভোগীর কাছে। ফলে কলকাতায় অশিক্ষিত, গরীব মানুষের উচ্চারণ যেমন আমাদের উপহাসের কারণ, তেমনি উপভাষাগুলোও আমরা অবজ্ঞা করি. ভেবেও দেখি না যে, আমাদের মতো স্বচ্ছন্দেই উপভাষী তার প্রয়োজনীয় যোগাযোগ উপভাষার মাধ্যমে মেটায়। কি কারণে ভাষার এই ভাগাভাগি, তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

প্রথম যে কারণটা চোখে পড়ে, তা হল সংযোগের মাত্রাভেদ বা ঘনত্ব (ডেন্‌সিটি অব্‌ কম্যুনিকেশন)। মানুষ সারাজীবনই ভাষা শেখে। প্রথমে মা-বাবা, সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে, পরে কর্মজীবনের সঙ্গীদের থেকে। তাই তার ছোটবেলায় জানা ভাষার উচ্চারণ-ছক অবিরত পাল্টায়। শহরে এসে উপভাষী মানুষ সংযোগের তাগিদেই নিজের উপভাষাকে আড়াল করে আদর্শ চলিত বলার চেষ্টা করে। অশিক্ষিত হলে এবং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের নীচের স্তরে থাকলে এ চেষ্টা কখনও সফল হয় না। শিক্ষা ও অর্থের কৌলীন্য আছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবশ্য সফলতার পরিমাণ বেশী হবে। তবু কর্মজীবনে আদর্শ চলিতের বাক্যস্রোতে মাঝে মাঝে দুয়েকটি উপভাষী শব্দ বা বিশেষ বাকভঙ্গি মানুষটির উপভাষী পরিচয় জানিয়ে দেয়। বাড়ীতে বা আত্মীয়স্বজনের বেলায় উপভাষার প্রয়োগে এই মানুষটিকেই স্বচ্ছন্দ হতে দেখি। এভাবে কলকাতার লোক নিজেদের উপভাষা ও আদর্শ ভাষার মধ্যে সমতা আনে। এ যেমন শাহরিক সংযোগের দিক, তেমনি উপভাষা অঞ্চলে গিয়ে নানান কাজে সেখানকার ভাষা ব্যবহার না করা অসুবিধাজনক। চলিত

বাংলা ও উপভাষী অন্য উপভাষা আবার আয়ত্ত করে। ভাষা শেখা এবং ভাষা বদল (শিফট্ অব্ ল্যাংগুয়েজ) কখনই শেষ হয় না। সব ক্ষেত্রেই দেখছি সংযোগের তাগিদে, ব্যবহারিক প্রয়োজনেই ভাষাবৈচিত্র্য আসে।

কিন্তু উপভাষা কি? কেমন করে এর জন্ম? সংযোগের মাত্রা উপভাষা অঞ্চলের সীমান্তে কি রূপ আনে? অর্থনীতি, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস কি নূতন কোনো ভাষারূপ সৃষ্টি করে? অসামাজিক মানুষরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগে কোন্ ভাষা বলে? এরকম প্রশ্ন ও উপ-প্রশ্নের সংখ্যা অনেক। প্রশ্নগুলির পূর্ণ সমাধানের পরিসর এখানে না থাকলেও সামান্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

উপভাষা বলতে অঞ্চল বা স্থানের তফাতে আদর্শ ভাষার রূপবদল ঘটে। সেখানের আদি বাসিন্দার উচ্চারণ-পদ্ধতি (অন্য ভাষার প্রভাবও সম্ভব), সামাজিক অভিপ্রয়াণের মাত্রা (রেঞ্জ অব্ সোশ্যাল মবিলিটি), মূল ভাষা-সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্নতা (সোশ্যাল এলিয়েনেশন), যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব (ল্যাক অব্ ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম), ভূপ্রকৃতির বিশেষত্ব সব কিছু দায়ী হয়ে যায়। এককালের একটি মূল ভাষাভাষী গোষ্ঠী নানা কারণে পৃথক হতে থাকে। তবে আমরা মূল ভাষা বলে যা মনে করি তা আসলে উপভাষাগুলির সাধারণ বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা। এ কারণে আদর্শ চলিতের মূলে বিশেষ উপভাষা সক্রিয়। প্রকৃতপক্ষে ভাষার আলোচনা যে উপভাষারই আলোচনা, এই মত ক্রমশ স্বীকৃতি পাচ্ছে। তাই একেবারে আদর্শ চলিত ভঙ্গী কখনই পাই না। তবে উপভাষাগুলির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপগত এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনক্রমে যে সাধারণ রূপের আদর্শায়ন করি, তাকেই আদর্শ ভাষা বলি। উপভাষা তখন হয়ে যায় স্থানীয় বা আদর্শহীন ভাষা (নন-স্ট্যাণ্ডার্ড)। স্থানিক ভাষা-বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পেতে উপভাষার ব্যাকরণ লেখা যায়, যার মূল ছাঁদ আদর্শ ব্যাকরণেরই ছাঁচে গড়ে উঠে।

উপভাষার সীমান্ত অঞ্চলে ভাষিক সংযোগ একটু ভিন্ন প্রকারের। দুটি উপভাষাই নিজেদের সামান্য বৈশিষ্ট্য মেনে একটি প্রান্তিক উপভাষা গড়ে তোলে। এই নবভাষা দুই উপভাষীদেরই সংলাপে সাহায্য করে। যেমন হাওড়া-মেদিনীপুর-হুগলির সীমান্ত অঞ্চলে যে বাংলা প্রচলিত, তা ঐ অঞ্চলগুলির মানুষদের কাছে সহজবোধ্য। আবার ২৪-পরগণার গঙ্গাসাগর এলাকা মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে বলে এবং অন্য নানা কারণে হলদিয়া-গেঁওখালির সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে এখানকার উপভাষায় পূর্বী রাঢ়ীর মেদিনীপুর অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য দুর্লভ নয়। আবার মেদিনীপুরের রাঢ়ী বাংলাকে এখানকার উপভাষীরা সহজে বোঝে। এখানে জলপথের সংযোগ এবং সামাজিক

অভিপ্রয়াণ সক্রিয় হয়েছে। এই ধরনের উপভাষার তরলতার (ফ্লুইডিটি অব্ ডায়ালেক্ট) পাশে আরও দুটি পরিস্থিতির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ী ভাষী অঞ্চলের (দঃ মেদিনীপুর) সন্নিহিত এলাকা হল ওড়িয়াভাষী অধ্যুষিত। পশ্চিম বাংলার এই সীমান্ত সে কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ীও ওড়িয়া প্রভাব এড়াতে পারে নি। দক্ষিণের দণ্ডভুক্তি শ্রেণীর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়খণ্ডী পূর্ব বা মধ্য মেদিনীপুরের মানুষের কাছে সুবোধ্য নয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক ভৌগোলিক উপভাষা বিভাগের তুলনায় ভাষার সংযোগ (ল্যাংগুয়েজ কন্ট্যাক্ট) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণ ভাবে জেলা বা স্থানওয়ারী উপভাষাকল্পনা আমরা যে ভাবে মানি, উপভাষা কিন্তু গভীরে গোপনে তার চেয়ে জটিল। উপভাষার সীমান্তবর্তীরূপ, অন্য ভাষাঞ্চলের সঙ্গে বাংলা উপভাষার যোগ তাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। কামরূপী উপভাষাতেও রাঢ়ী ও হিন্দী শব্দের দেখা মেলে। হিন্দী এলাকা সন্নিহিত হলেও রাঢ়ের উপভাষার সঙ্গে এর আংশিক মিল যে ঠিক কি কারণে হল তা বলা কঠিন। বরং এর উত্তর অঞ্চলদুটির মানুষের মধ্যে কোনো এক সময়ের সংযোগের মধ্যে তা খোঁজাই সঙ্গত।

উপভাষাকে স্থানীয় বা আদর্শহীন (নন-স্ট্যাণ্ডার্ড) রূপে সবসময় বিচার করা যায় না। কারণ আদর্শ চলিত থেকে উপভাষার ব্যাকরণ-শব্দ মাঝে মাঝে এত আলাদা যে আদর্শকে উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সমাহার না বলে একে আরেকটি উপভাষা বলা উচিত। উপভাষা বলতে তাই একই ভাষার ব্যাকরণগত, শাব্দিক, ধ্বনিগত ভেদ বুঝি না বরং ভাষাবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ বলতে পারি। এই সূত্রেই অর্থনীতি ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম স্তর সৃষ্টি করে, সেগুলিও ব্যাপকার্থে উপভাষা। অর্থের পরিমাণ অনুসারে ধনী-গরীবের ভাষা ভিন্ন হতে বাধ্য। ব্যক্তির বাকরীতি, উচ্চারণভঙ্গির মধ্যে যেমন তার শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় পাই, তেমনি ধনী ও নির্ধনের ভেদও স্পষ্ট হয়। এটা সম্পূর্ণত অর্থনৈতিক সুবিধা কে কতটা পাচ্ছে, সহকর্মী-বন্ধু-প্রতিবেশীরা কে কোন আর্থিক-সামাজিক স্তরের, তাই একজনের সামাজিক ভাষা তৈরি করে। সামাজিক বিধিনিষেধ, সামাজিক দূরত্ব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা একই সঙ্গে সমাজের ভাষাকে নানা উপস্তরে বিভক্ত করে। সব মিলিয়ে সমস্ত সামাজিক শ্রেণী যে যে ভাষা ব্যবহার করে, তা হল সামাজিক শ্রেণীভাষা (সোস্যাল ক্লাস ডায়ালেক্টস)। অনেক সময় সমাজের উপরতলায় গৃহীত একটি ভাষাকৌশল সমাজের নীচুতলার ছড়িয়ে পড়তে পারে, আবার বিপরীতটাও হতে পারে। গণতন্ত্র ও নির্বাচনের নানা বিশেষ শব্দাবলী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে সমাজের নীচু স্তরে

ক্রমশ চালু হচ্ছে। আবার আর্থিক দিক থেকে ক্ষমতাহীন সামাজিক স্তরও ক্ষমতাশালী মানুষদের ভাষায় শাব্দিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উত্তেজনা বা ঝগড়ার মুহূর্তে উচুস্তরের মানুষ অনায়াসে নিজের আর্থিক শক্তির আবরণ খুলে ক্ষমতাহীন মানুষের ভাষাকে বেছে নেয়। নিমকহারাম বা হারামজাদা বড় সহজে শব্দে গতিশক্তি সঞ্চার করে। অন্যদিকে 'ডিস্‌কো' শব্দটি উচ্চাবিত্তের উত্তেজক গান নাচের আসর থেকে সব্জীওয়ালার মুখে পৌঁছে গেছে। যদিও শব্দটির সঠিক মানে জিজ্ঞেস করতে উচ্চশিক্ষিত মানুষকেও দেখেছি। বেতার, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রতিদিনই নূতন নূতন শব্দের উৎপত্তি ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে হাজির হচ্ছে। তবে লক্ষ্য করার মত যে বিদেশী শব্দগুলো বেশী পরিমাণে এই সচলতা পায়। কেননা বাকি শব্দগুলি (সংস্কৃত বা আদর্শ বাংলা) হয় অভিজ্ঞতার জগতে নূতন কিংবা ইতিমধ্যে উপভাষিক রূপান্তরলাভ করেছে।

পেশা-কর্মজীবন আদর্শ ও উপভাষা দুই জায়গাতে বিশেষ শব্দকোষ, বাক্যাংশ' বাক্রীতি তৈরী করে। একে আমরা পেশাগত বা কর্মগত শব্দভাণ্ডার (রেজিস্টার) বলতে পারি। এর মধ্যে কর্মের একরূপতা, গোষ্ঠীবন্ধন এবং নানা পরিভাষাও এসে পড়ে। প্রথমে পেশাগত উপভাষা নিয়ে আলোচনা করা যাক। কারুশিল্পী, ব্যবসায়ী, যন্ত্রবিদ, উকিল, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী—সব দেশের লোকের গোষ্ঠীভাষা আলাদা। যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতিও ক্রমশ এই গোষ্ঠীভাষাকে মূল ভাষা থেকে পৃথক করছে। শিল্পীর কাছে ইজেল-ক্যানভাস-প্যালেট-জল রং-তেল রং-মোজাইক ছবি-গ্রাফিক্স শব্দগুলি বিশেষভাবে তাঁর কর্মজীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। আবার উকিলের কাছে (নীচু কোর্টের) 'ফীজ' মানে তার প্রাপ্য টাকাকড়ি হলেও হাইকোর্টে ঐ দক্ষিণার নাম 'গিনি বা মোহর। অর্থাৎ একই পেশা হলেও কর্মস্থলের পার্থক্যে একই বস্তুর বিচিত্র নাম হতে পারে। ড্রাইভার কণ্ডাক্টরদের কাছে চেসিস (চ্যাসিস, স্থাণী), বডি, লাইনিং, সেল্‌ফ বিশেষ অর্থবহ। কিন্তু এর একটা লক্ষ্যণীয় দিক আছে। একই ধরনের পেশা হলেও পেশাগত ভাষার সামান্য পার্থক্য দেখি। মিনিবাসের কর্মীদের কাছে, ঠেলা বা রিকসা গাড়ি নয়, 'টানা' (গাড়ি), নিজেদের বাস 'গাড়ি', বড় বাসচালকের কাছে 'মিনি'। ড্রয়িং শব্দটি শিল্পীর এবং যন্ত্রবিদের কাছে অর্থে আলাদা। ঘুড়ি বিক্রেতার কাছে ময়লা, ময়ূরপংখী, বামনা, পেটকাটা, দ'তে (সবগুলিই ঘুড়ির আকৃতি- রংয়ের নানা নাম), কাঁপ বিশেষ অর্থবহ যা ক্রেতার কাছেও সত্য।

সামাজিক মানুষের ভাষা-উপভাষার পাশে অসামাজিক মানুষরা তাদের মধ্যে

কিভাবে ভাব বিনিময় করে, তাও বাক সংযোগেরই প্রশ্ন। এখানে আদর্শ চলিত, উপভাষাগুলি কারোরই নিয়ম না মেনে সামাজিক লোকের অবোধ্য শব্দাবলী, বাকরীতি তৈরি করা হয়। একে সংকেত-শব্দ (কোড ল্যাংগুয়েজ) বলাই ভালো। যেমন, কটি/গ্যানা/পেটো (= বোম), চার অঙ্গুলি (= ছিনতাই করে যে), তোল্লাবাজ (= স্যুটকেশ, মোটঘাট সরায় যে), সুতলি (= সোনার হার), গজ (= ছুরি), হাওয়া (= চলে যা), তিক্রমবাজ (= হটকারী). চেম্বার (= পিস্তল, রিভলবার), মার কাটারি (= দারুণ উত্তেজক), পান্‌জি (= পাঁচ টাকা), দহলা (= দশ টাকা), এগ্‌গি (= এক টাকা), দুগ্‌গি (= দুটাকা)। শেষের সংখ্যাশব্দগুলো তাস খেলা থেকে আসা যা অসামাজিকেরা জুয়া হিসাবে খেলে। সমাজের অর্থনৈতিক ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে সংকেত-শব্দ বহু পরিমাণে ভদ্র ভাষার এলাকাতে ঢুকে পড়ছে। তরুণদের মুখে শোনা বহু শব্দ এই অসামাজিক সংকেত শব্দ থেকে নেওয়া। এগুলিকে অপ-শব্দ বা ইতর-শব্দ না বলে তাই সংকেত-শব্দ বলাই ভালো। অসামাজিক মানুষের শক্তিমত্তা, আর্থিক ক্ষমতা, দুঃসাহসী কাজের প্রবণতা এবং ভদ্রজনের অবোধ্য ভাষার আকর্ষণ (রহস্য বা গুপ্ত রাখার জন্য) এভাবে সংকেত-শব্দকে সামাজিক ভাষার গণ্ডীতে তুলে আনছে। যেমন, রেলা (= অহংকার, অতি চালাকি), চাম্পি (= সুন্দরী মেয়ে)।

আমাদের সংযোগের আলোচনায় মহিলাদের ভাষা নিয়ে কিছুটা চিন্তা করা দরকার। ঠিক নারী-ভাষা (উইমেনস্ ল্যাংগুয়েজ) বলে কিছু নেই। কিন্তু পুরুষ-নারীর স্বভাবের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই এই বিভেদ ঘটিয়েছে। আগে ধারণা ছিল 'দি উইমেন হ্যাভ ওয়ার্ডস এণ্ড ফ্রেজেজ হুইচ্ দি মেন নেভার ইউজ, অর দে উড বি লাফ্‌ড টুয়র্ন। এর মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে। পুরুষের মুখে 'মাগো', 'এমা' শুনলে লালিমা পালের ভাবনা আসে। কিন্তু আদর্শ চলিত সম্পর্কে স্ত্রী-পুরুষের ভাষাচেতনা সম্পূর্ণ পৃথক। দু-চারটে নিষিদ্ধ শব্দ বা গোষ্ঠীশব্দকে নারীভাষা আখ্যা দিতে পারি না। শুনতে অবাক লাগলেও মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশী সামাজিক মর্যাদা সচেতন, তাই ভাষার পরিবর্তক গুলি (ল্যাংগুয়েজ ভেরিয়েবল) সেখানে বেশী সঠিকরূপে প্রযুক্ত হয়। নরউইচের ছেলে-মেয়েদের এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে পুরুষেরা নিজেদের উপভাষা বা সামাজিক শ্রেণীশব্দকে আড়ালে রাখার মানসিকতায় ভোগে (কভার্ট 'প্রেস্টিজ) বিপরীতে মহিলারা সামাজিক মূল্যবোধকে মুখের ভাষাকে মর্যাদা দেয় (নর্মাল প্রেস্টিজ)। ইংলিশ ফ্রেঞ্চভাষী ছাত্রীরা ছ মাসের মধ্যে ইংরাজীর স্বীকৃত উচ্চারণ শিখলেও ছাত্ররা শিখতে পারে নি। বরং তারা স্বীকৃত ইংরাজী উচ্চারণকে মেয়েলি মনে করে তাদের গলায় নকল করেছে। দুটি উদাহরণে পুরুষদের

ভাষা-ধারণা (ল্যাংগুয়েজ অ্যাটিচুড) আলাদা। কখনও মর্যাদাকর ভাষা তাদের কাছে আপন, কখনও বা মিশ্র ভাষা। বাংলায় ঠিক এইরকম সমীক্ষা না হওয়ায় উদাহরণ দেওয়ার অসুবিধা আছে। তবে শোনার কান থাকলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করি যে মেয়েরা নর্মাল প্রেস্টিজেরই ভক্ত। আবার বিশেষ কারণে কভার্ট প্রেস্টিজও আসে। যশোরের উপভাষী এক বৃদ্ধার টেপ-ইনটারভিউ নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তিনি কিছুতেই আদর্শ চলিত ছেড়ে নিজের স্বাভাবিক ভাষা বলছেন না। এখানে ভাষাবিজ্ঞানের ভাষিক অ-নিরাপত্তা (ল্যাংগুয়েজ ইনসিকিউরিটি) এবং সামাজিক শ্রেণীচেতনার (সোশ্যাল ক্লাশ-কনশাসনেস) সূত্র মনে রাখতে হবে। তবে ভাষাসমীক্ষায় মহিলারা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা পুরোনো এবং অপ্রচলিত শব্দ, বিশেষত্ব মেয়েরা যতটা সংরক্ষণ করে রাখে, পুরুষরা তা পারে না। কারণ মেলামেশার পরিধি।

বাকসংযোগের ক্ষেত্র (ডোমেইন) এবং বক্তার সামাজিক চরিত্র (রোল) বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। এছাড়া ভাষান্তরী সংযোগও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রবন্ধে সে সব কথায় প্রবেশ করব না। তবে এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে আদর্শ চলিত বা উপভাষা ব্যবহারকারী কেউ থাকতে পারে না। আদর্শ চলিত আমাদের গড়ে পিটে নেওয়া সংযোগরক্ষাকারী উপভাষামাত্র (লিংক ডায়ালেক্ট)। তার মধ্যে এবং অন্যান্য উপভাষায় বৈচিত্র্যের সংখ্যা কম নয়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "পূর্ব পশ্চিম, যে দিক হতেই আসুক না কেন, একবার কলকাতার হাওয়া খেলেই দেখেছি সেই ভাষাই লোকে কয়।" (বাঙ্গালা ভাষা, ভাববার কথা) এটি যেমন সত্য, তেমনি অঞ্চলগুলিতে গিয়ে জনসংযোগ করতে হলে, মানুষের সহযোগিতালাভে সেই উপভাষার সাহায্য নিতে হয়। পল্লী-বাসীর কাছে উপভাষা কিংবা বিশেষজ্ঞের কাছে গোষ্ঠীভাষা বা অপরাধীর কাছে সংকেত-শব্দ তাদের মনের দরজা খুলে দেয়। চলিত বাংলা উপভাষার অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ায় বাধা দেয়। সংক্ষিপ্ত এই আলোচনাটি আমাদের বাকসংযোগের ব্যবহারিক সচেতনতা, ক্ষেত্র, গোষ্ঠী ব্যক্তির ভূমিকা এবং ভাষিক বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য লেখা। ভাষাবিজ্ঞানী এ ধরনের সাদামোটা কথায় অখুশী হবেন আর সচেতন সামাজিক বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাবেন এবং প্রশ্নসংকুল হবেন—এইটুকুই লেখকের প্রত্যাশা।

———

আন্তরিক সংযোগের সন্ধানে

পুষন গুপ্ত

১. প্রচণ্ড অনাবৃষ্টিতে গ্রামের নদী আর পুকুর শুকিয়ে ফুটিফাটা। চাষের জল দূরে থাক, খাবার জলটুকু পর্যন্ত নেই। বাবার থানে মানত, বলি, পুজোআচ্ছা হয়ে গিয়েছে—আকাশে মেঘ জমেনি। অতঃপর চরম অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা সরে দাঁড়িয়েছেন। ডাক পড়েছে বাহাত্তুরে ওঝার। চাঁদ মাঝ আকাশে এলে শুরু হয় পুকুর প্রদক্ষিণ। নৃত্যরত ওঝার প্রতিটি পদক্ষেপে ধুলোর ঝড় ওঠে। গ্রামবাসী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে।

২. নতুন স্যাটেলাইট টাউনশিপের বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে-থাকা দর্শকের সামনে চাপা গোঙানি তুলে এসে দাঁড়াল পুলিশভ্যান। রাস্তার দুপাশে ফাঁকা মাঠে গড়ে উঠেছে অজস্র দোকান, দড়ির ঝুড়ির ভেতর ডানা ঝাপটাচ্ছে মুরগি। তৎপর পুলিসের লাঠির আঘাতে ভেঙে পড়তে থাকে ঝোপড়ার চালা, সিগারেটের ট্রে তুলে দৌড় দেয় দোকানী, ভাতের হোটেলের উনুন গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ১৫ মিনিটের নিখুঁত অপারেশনে ভ্যানে উঠে যায় কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি করা টেবিল আর বেঞ্চি। দিগন্ত পর্যন্ত ফাঁকা মাঠে এবার দেখা যায় স্টেডিয়ামের লোহার কমপ্লেক্স। পুলিস চলে গেলে, ছিল-এখন-নেই দোকানের চৌহদ্দিতে বসে কিশোর দোকানী নির্বিকার মুখে ভাত মাছের ঝোল খেতে থাকে।

৩. দুপাশে আড়াআড়ি বাঁশে টাঙান দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেহাতি বালিকা। সারাক্ষণ নিচে ঢোলবাদক 'মাদারিকা খেল'এর সর্দারের সঙ্গে তার এক দুর্বোধ্য কথোপকথন চলতে থাকে। সার্কাসের চোখ-ধাঁধান আক্রোবেটিকসের তুলনায় মাদারি বা স্টেলে'র ট্রাপিজ অবশ্যই প্রাথমিক স্তরের। কিন্তু যা দর্শককে আকর্ষণ করে তা এর মুভমেণ্টস এবং ঝুঁকি গ্রহণের সহজাত ক্ষমতা।

নন্দনতত্ত্বের কোন সংজ্ঞাগত বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, উপরিউক্ত তিনটি ঘটনার মধ্যে থিয়েটারের[১] উপাদান আছে। সকলেই মেনে নেবেন। কিন্তু এই প্রতিবেদন শিল্প সম্পর্কে নয়, শিল্পের সংযোগ-সমস্যা সম্পর্কে। ফলে আর এক পা এগিয়ে বলতে হবে, উপাদান নয়, ঐ তিনটি ঘটনাই থিয়েটার।

সংযোগ কোন দ্বিতীয় সত্তা নয়, যা যুক্ত হওয়া মাত্র ঘটনার চরিত্র বদলে যাচ্ছে। একটি অজ্ঞাত কোণ থেকে আলো জ্বলে উঠছে মাত্র।

প্রশ্ন ক. কেন অজ্ঞাত? খ. ঐ আলোর স্বরূপ কি?

সংযোগ ক্ষমতার বিষয়টি ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হবার সুযোগ বেশি, ফলে এ দেশে প্রায়ই একে জনপ্রিয়তার সঙ্গে গোলমাল করে ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যা সহজে বোধগম্য তা সহজে সংযোগ সাধনে সক্ষম, এমন একটি অবদমনপ্রিয়[২] মানসিকতারও জন্ম নিয়েছে।

একই সঙ্গে একটি ব্যবসায়ী থিয়েটার,দেশখ্যাত অভিনেতা অভিনীত আর্ট থিয়েটার, এবং একটি ঐতিহাসিক যাত্রা সমান জনপ্রিয় হতে পারে। কিন্তু জনপ্রিয়তার ভিত্তিটি তৈরি করে দর্শকের কামনা-চরিতার্থতা বা উইশ-ফুলফিলমেণ্ট। এই উইশ-ফুলফিলমেণ্ট অবশ্য নানা স্তর থেকে জন্ম নিতে পারে—সমাজ-পরিবর্তন বিষয়ে, মানুষের সততা বিষয়ে, নারীর সতীত্ব বিষয়ে, প্রেমের মহত্ব বিষয়ে, শান্তির জয়গান বিষয়ে, গরীবের বড়লোক হওয়া বিষয়ে, দুষ্টের দমন বিষয়ে, অহংকারীর পতন বিষয়ে, বিজ্ঞানীর আদর্শ বিষয়ে, শিক্ষকের একনিষ্ঠতা বিষয়ে, রাজনীতিকের শঠতা বিষয়ে, বেশ্যার ধর্ম বিষয়ে, পুরোহিতের নাস্তিকতা বিষয়ে, রাষ্ট্রদ্রোহিতা বিষয়ে, এবং নাটকের নীতিবাক্যটি বিষয়ে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য শ্রেণীবিশেষের কামনায় এর চেহারা পালটাতে বাধ্য। কিন্তু তার সঙ্গে গোষ্ঠীগত কামনার কোন সম্পর্ক নেই।

জনপ্রিয়তার স্তরভেদ আছে। সমস্ত জনসাধারণ কোন অবস্থাতেই কোন বিশেষ বস্তুতে আকর্ষণবোধ করে না। অধিক সংখ্যক জনগণ বলতেও আদতে কিছুই বোঝায় না, কারণ কোন সর্বনিম্ন সংখ্যা চিহ্নিত করা নেই।

অতএব 'সাধারণের জন্য নয়' এমন নাট্যাভিনয়ও জনপ্রিয় হতে পারে। দান্তে'র ডিভাইন কমেডি বা রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী একটি বিশেষ শ্রেণী, ধরা যাক বুদ্ধিজীবীদের কাছে অবশ্যই জনপ্রিয়। গোষ্ঠীটি ছোট। এই গোষ্ঠীর রসবোধ, সমাদর ক্ষমতা, ও স্ফুট সমালোচনা আপাতভাবে খুবই সংবেদনশীল। এই রুচিশীল[৩] শিল্পবোধ একটি জটিল ফাঁদ মাত্র। যেহেতু সংবেদনশীল অতএব লোভনীয় তো বটেই। কিন্তু মূলত এক্ষেত্রে যা আদানপ্রদান তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, অভিনয় দক্ষতা, দর্শন, আঙ্গিকজাত কারুকার্য, ও সংলাপের ব্যঞ্জনা।

শিল্পপ্রেমিকেরা অবশ্যই বলবেন, ব্যাস—এই তো যথেষ্ট। যদি আমার সৃষ্টি দর্শকের কাছে শিল্পগত তাৎপর্য পায় তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল। একজন শিল্পী সবসময়েই সেখানে পৌঁছতে চান।

কিন্তু মজা হল থিয়েটার সাহিত্যসৃষ্টি, সিনেমা-নির্মাণ, বা চিত্রাঙ্কন নয়। এ কোন একক শিল্পীর তন্ময়তাজাত নয়। থিয়েটারের যৌথ শ্রম প্রতিমুহূর্তে উপস্থিত দর্শকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এক বিশেষ দূরত্ব থেকে যে দীর্ঘমাত্রা শুরু হয়, সেখানে থিয়েটার ও

জীবনযাপন সমার্থক। থিয়েটার কিছু অংশ নির্বাচন করে মাত্র, তা অবশ্যই হয়ে ওঠে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ঈশপস ফেবলসের মত কোন নীতিবাক্য প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, বস্তুত মঞ্চে সঞ্চারশীল অভিনেতারা এক প্রণিপাত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন মঞ্চের বাইরে উপবিষ্ট দর্শকদের সঙ্গে তাদের সমবেত অভিজ্ঞতার যোগসূত্র স্থাপনে। যৌথ জীবনযাপনের প্রধান শর্তই তাই। যেহেতু এ কেবল একটি 'মেসেজ' প্রচার নয়, ফলে মাধ্যম আপাত দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম ও জটিল হতে বাধ্য।

'একা মানুষ' এই যুগল শব্দ দুটি সম্বন্ধে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। থিয়েটারে এই একক মানুষকে প্রতিষ্ঠার জন্য মাথা খাটিয়ে ব্যঞ্জনাময় সংলাপ ও 'লোকি' আলোক সম্পাত, যা এককত্বকে মূর্ত করে তুলবে, তার অনবদ্য ব্যবহার আমরা দেখেছি। অর্থাৎ ৬৫০ দর্শক সমেতপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তা একজন একক মানুষের অভিজ্ঞতার, অভিনেতার। করতালিতে প্রেক্ষাগৃহে পায়রা উড়লেও এ কথা কি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া যাবে যে ঐ অভিনেতা ও তার একাকীত্ব পরিস্ফুট করার ব্যাপারে সহযোগী অভিনেতারা কোন্ সংযোগ সাধনে সফল? এ একমাত্র লিরিক কবিতাতে সম্ভব।

এরপর যে প্রশ্নটি অবশ্যম্ভাবী, তা হল বিংশশতাব্দীর শেষার্ধে কামনায় এ কি একজাতীয় রোমান্টিক নসটালজিয়া নয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে, বিজ্ঞানসম্মত বিবর্তন, সভ্যতা অনুসারী সমাজবদ্ধতা ও কম্প্যুটারাইজড জীবনযাপন কিছু নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এগোচ্ছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বস্তুত আধুনিক মানুষ সর্বতোভাবে ঐ যৌথজীবন-যাপনের বিপরীতে দাঁড়িয়ে। তার পক্ষে ফিরে আসা অসম্ভব, অযৌক্তিক ও প্রকৃতি-বিরোধিতার শামিল এ-অবস্থায় অন্বেষণ শুরু হতে পারে যদি ঐ বিচ্ছিন্ন মানুষ মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষম হয়। প্রয়োজন সূত্র সংগ্রহের। সূত্রাদি, বলাবাহুল্য জোট বেঁধে ধরা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেই। কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্নও নেই। ফলে মানবিক সম্পর্কের গভীরতম তলদেশ থেকে[৪] প্রতীক উঠে আসে, অর্থের ধ্বংস হয়, অর্থের নবজন্ম ঘটে। অতএব এই শিকড় সন্ধানে কোন রোমান্টিক বিলাস নেই। যা আছে তা গূঢ়মুখিতা।[৫]

শিল্প জন্ম নেয় সংস্কৃতির একেবারে প্রাথমিক স্তর আর অবচেতন থেকে। ফলে শিল্প বর্বর, প্রতীকময়, শরীরী, স্বয়ংসম্পূর্ণ চরমানন্দদায়ী এবং গভীর। সভ্যতা আদিশিল্পের গায়ে কোন পোশাক চড়াতে পারে নি। কিন্তু সভ্যতা শিল্পকে পণ্যে পরিণত করতে পেরেছে। 'শিল্প শিল্পের জন্য' এবং 'শিল্প মানুষের জন্য' দুটি আপ্তবাক্যই সংস্কৃতি প্রেমিক-দের সৃষ্টি, যা সর্বদা 'অসাংস্কৃতিক'দের উদ্দেশে প্রচার করা হয়ে থাকে। দুটি

আপ্তবাক্যেই শিল্পকে একটি বিচ্ছিন্ন, তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যঞ্জনাময় 'ভাব' হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শুরু হল শিল্পের মূল্য বিচার। এইভাবে'[৬] অবদমিত শিল্প জমিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যায়।

বিশেষ সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে গোষ্ঠীবদ্ধতাকে কেন্দ্র করেই থিয়েটারের সৃষ্টি। লোককথা, রিচুয়্যাল, নাচ, যৌনতা, বিচার, প্রতিরক্ষা, রোগমুক্তি এবং নিষ্ঠুর ও আনন্দদায়ক উৎসবের মধ্যেই থিয়েটার তার কাঠামকে গড়ে তুলেছে। উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে জীবনযাপন ও সংযোগের, যাকে বলে গ্রন্থিবন্ধন ঘটেছে। সেই স্তরে কোন নন্দনতত্ত্ব ছিল না।

আজও একটি বাউল মেলা[৭] অথবা ছোনাচ পারফর্মারদের দিক[৮] থেকে কোন শিল্পকলা নয়। এই নাচ বা মেলা গোষ্ঠীর উদ্দীপনা ও দর্শন তো বটেই, কিন্তু এর তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে ফোকলোর এর মোটিফ বা মুখোসের রং অথবা বাউলগানের শব্দার্থ নিয়ে মাথা খোঁড়খুঁড়ি করলে বড় রকমের গোলমাল হয়ে যাবে। প্রতি মুহূর্তে হয় যাচ্ছেও। আমাদের টেকনলজিকাল কমুনিকেশন নেটওয়ার্ককে কলা দেখিয়ে এক বিকল্প স্তরে এরা চালিয়ে যাচ্ছেন আন্তরিক সংযোগ। সেদিক থেকে এ মেলা বা আসর একটা সমাবেশের ভূমিকা পালন করছে। এ কারণেই, থিয়েটার সম্পর্কে এত আলোচনা ও পরীক্ষার পেছনে যে প্রেরণা কাজ করে যায়, তা হল থিয়েটার সরাসরি এই সব গোষ্ঠীনৃত্য ও রিচুয়্যাল থেকে উঠে আসায়, আধুনিক সময়েও এর সংযোগ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। সম্ভবত এই সম্ভাবনা থেকে যাওয়ায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে থিয়েটারকে সম্পূর্ণ 'বিচ্ছিন্ন' করে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

পদ্ধতিগত আলোচনায় যাবার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের আরোপিত তত্ত্ব কি মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে, তা আগেই দেখা গিয়েছে। বস্তুত একজন শিল্পবোধসম্পন্ন নির্দেশকের অঙ্গুলি হেলনে পুতুল নাচ সদৃশ অভিনেতাদের সবিশেষ অনুকরণ থিয়েটারকে যথেষ্ট 'একা' করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশে, বিশেষত আমেরিকায়, ফ্রান্সে, পোলাণ্ডে এবং লাতিন আমেরিকায় গোষ্ঠীবদ্ধ থিয়েটার এবং উৎস-সন্ধানের কাজ চলছে। আর রিহার্শাল, অর্থাৎ পরিচালকের চক দিয়ে আঁকা নির্দিষ্ট খোপে দাঁড়িয়ে বকবকম নয়। কাজ চলছে ওয়ার্কশপ পদ্ধতিতে। যেখানে অভিনেতা অভিনেত্রীরা নিজস্ব চেষ্টায় আগে গড়ে তুলতোচাইছে নিজেদের মধ্যে এক আন্তরিক সম্পর্ক। সমষ্টিগতভাবে উঠে আসছে ইমপ্রোভাইজড্ প্যাটার্ন। এ হল সেই অনুশীলন—যা পাসটাইম নয়, খুচরো সংস্কৃতি নয়, পেশাদারী বেনিয়াবৃত্তি নয়, সমাজ পরিবর্তনের ব্রত নয়, যা একসঙ্গে 'বেঁচে ওঠার' সামাজিক তাৎপর্যটি স্পষ্ট করে।

এই প্রকরণের মাধ্যম অবশ্যই শরীর[৯]। শরীর যে ভাষা আয়ত্ত করে তা যে অপেক্ষাকৃত জটিল, প্রতীকময়—সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্ভবত শারীরিক ভঙ্গীই আন্তরিকভাবে ইঙ্গিতবহুল, যা ভাষার দ্বিমাত্রিক সীমারেখাকে অনেক বেশি দূর করে দেয়। আমি আধুনিক সভ্যতার মানুষ। আমার সংযোগের জন্য রয়েছে ভাষা। এই আত্মতৃপ্তি আমাদের ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন করেছে। শরীর, মানে এখানে কণ্ঠস্বরের মড্যুলেশন বা আঙুলের মুদ্রা নয়, বলা বাহুল্য।

শারীরিক অনুশীলন[১০] আধুনিক লোকাচারের যথার্থ বিশিষ্টতার কাছে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। লোকাচার সতর্ক করে সেই সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে যার একদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রয়োজনীয়, বাস্তবপীড়িত মূল্যবোধ, অন্যদিকে সমাহিতের[১১] দুজ্ঞের্য়তা।

থিয়েটারের মাধ্যম শরীর, যা সংযোগ-সঞ্চারকারী—অবশ্যই দর্শক ও পারফর্মারের অভিজ্ঞতা ও সম্পর্ক বিষয়ে—তা এই প্রতিবেদনের বিষয় হতে পারে না। কারণ এই প্রকরণ পরবর্তী সমস্যার দ্বার উদ্ঘাটন করে মাত্র।

বরং, পাঠক, লক্ষ্য করুন এই প্রতিবেদনের শুরুতে বর্ণিত তিনটি ‘থিয়েটার’। যেহেতু পাঠক একজন নন, ধরে নেওয়া যেতে পারে ‘আর্কিটাইপের’ সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে এই গবেষণার শুরুতে, আমরা শুরু করেছি শূন্য, অর্থাৎ বস্তুহীন থেকে। পাঠকের সুবিধার্থে আমরা যৌথ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই।

---

১. থিয়েটার শব্দটিই ব্যবহার করা হবে। কারণ ‘নাটক’ অর্থে নয়। ‘নাটক’ এর সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের একাত্মতা আছে। এখানে ‘পারফরমেন্স’ এর অনুষঙ্গ প্রয়োজন।

২. বোধগম্যতার তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব নেয় পারফর্মারেরা। এক্ষেত্রে বোধগম্যতা যা একাধারে অপর পক্ষের মাধ্যম-সচেতনতা—তা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করছে পারফর্মারেরা, সমালোচকেরা, এলিটেরা, কম্যুনিস্টেরা এবং মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ারা। এই তত্ত্ব ফলে উপরিউক্ত শ্রেণীগুলির অবদমনস্পৃহাকে চরিতার্থ করে।

‘The oppressed having internalized the image of the oppressor and adopted his guidelines, are fearful of freedom.’ Pedagogy of the oppressed : Paulo Freiri.

৩. ডিভাইন কমেডি বা রক্তকরবী বা এই জাতীয় কোন কিছু সম্পর্কে এটি কোন বক্রোক্তি নয়। দর্শক ও অভিনেতার সংযোগ-স্তরে শিল্পবোধ কোথায় এবং কিভাবে কাজ করে এটি সেই সূত্রে। এর সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই।

৪. ‘The Theatre restores to us all our dormant conflicts and all their powers and gives these powers names we hail as symbols and behold ! Before our eyes is fought a battle of symbols...for there

can be theatre only from the moment when the impossible really begins and when the poetry that occurs on the stage sustains and superheats the realized symbols.' The Theatre And Its Double : Antoin Artaud.

৫. 'নসটালজিয়া' শব্দটিকে গৃহমুখিতা অর্থে যদি মেনে নেওয়া যায়। গৃহমুখিতা শব্দে অবশ্যই স্মৃতিকাতরতার তাৎপর্য নিহিত।

৬. ক. 'Art challenges the prevailing principle of reason : in representing the order of sensuousness it invokes a tobooed logic—the logic of gratification as against that of reasan.' Eros And Civilisation : Herbert Mercuse.

খ. 'Art is perhaps the most visible return of the repressed—not only on the individual but also on the generic-historical level.' Ibid.

গ. 'Return of the repressed'. Moses and Monotheism : Sigmund Freud.

৭. এমন মেলা যেখানে গণমাধ্যমের দালালেরা—টি. ভি-ক্যামেরা, স্পুল টেপ, ভিডিও নিয়ে এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ক্যাসেট, সুপার ৮ মুভি ও স্টিরিওফোনিক অ্যামপ্লিফায়ার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েনি।

৮. আমরা যতই শিল্পকলা, গ্রামীণ শিল্প, আদিবাসী শিল্প বলে চিৎকার করে যাই না কেন—।

৯. 'The performer is like the athlete. They both live inside their bodies. Bodies are psychophysical systems—and we want to make them whole...what is to be whole ? It is to be receptive, open, able to contact your own feelings and be alert to the feeling of others.' Radicalism, Sexuality, & Performance : The Drama Review T44 : Richard Schechner.

১০. We began to search, to look for different types of contact in these exercises. How could we transform the physical elements into elements of human contact ? A great play with one'e partner, a living dialogue with the body, with the partner we have evoked in our imagination or perhaps between the parts of the body where the hand speaks to the leg without putting this dialogue into words or thought. These almost paradoxical positions go beyond the limits of naturalism.' Towords a poor theatre : Jerzy Grotowski.

১১. সমাহিত শব্দটির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। বরং কিছুটা ধ্যানমগ্ন আত্মস্থতার সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

বানানবিধি ও গণশিক্ষা

তুষারকান্তি মহাপাত্র

'পিকিং' নাম বদলে হল 'বেজিং'। এ-নিয়ে চীনে বাক্-বিতণ্ডা কতটা হয়েছিল অথবা আদৌ হয়েছিল কিনা জানা নেই ; তবে বঙ্গদেশ হলে কাজটা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। পিকিং শব্দ সংস্কৃত কিনা (অনুস্বার তো আছে), সংস্কারের বা পরিবর্তনের মধ্যে কোন গূঢ় কারণ আছে কিনা, আদপে কোনো সংস্কার বাঞ্ছনীয় কিনা, এমনতর নানা প্রশ্নে সংস্কার-ইচ্ছাটাই বাতিল হয়ে যেত। তাৎক্ষণিক অসুবিধার কথা চিন্তা করে প্রয়োজনকে আমরা এভাবেই অস্বীকার করে এসেছি। অথচ আমরা চাই শিক্ষার প্রসার।

এককালে শিক্ষা ছিল প্রয়োজনীয়, আজ অপরিহার্য। ব্যক্তির উন্নতি, সামাজিক কল্যাণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়, একথা আমরা জানি এবং মানি। ফলে শিক্ষাকে কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বয়স্ক শিক্ষা, গণশিক্ষা, জনসংযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য আমরা চেষ্টাও করি।

স্বাভাবিকভাবে আজ চাই সহজ, সরল ও সুনির্দিষ্ট উপায়। ভাষা যেহেতু শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রধান বাহন, তাকে এড়িয়ে শেখানো যায় না। তাড়াতাড়ি অন্তত কাজচলা গোছের ভাবে ভাষা আয়ত্ত হলে বিষয় শিক্ষায় দ্রুত মনোযোগ দেওয়া যায়—এ কথাটা সবসময়েই মনে রাখতে হয়। কারণ ভাষা, যা বিষয়কে জানার উপায়, তার জন্যে বেশি সময় ব্যয় করার মত অপর্যাপ্ত অবসর আর আমাদের নেই। শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিমাণ বেড়েছে, প্রথম শিক্ষার্থী আজ আর শুধু শিশুরা নয়, বয়স্করাও—যাদের সময়ের একান্ত অভাব। তাদের অনেকেরই লেখার আগ্রহ নেই, প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন খুব কম সংখ্যক। এঁদের সবাইকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে, তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য জ্ঞানে অভিজ্ঞ হতে সাহায্য করতে চাইলে, ভাষা শিক্ষার সহজ উপায় ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মনে রাখতে হবে, বয়স্কের সম্বল অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা—নিত্য ভাষা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা। অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে মুখে মুখে চলে তাঁদের ভাষাচর্চা ও শিক্ষা। ব্যাকরণ তাঁরা জানেন না, কিন্তু ব্যবহার করেন, যেমনভাবে শিখেছেন, জেনেছেন এবং অভিজ্ঞতা থেকে ধরতে ও বুঝতে পেরেছেন সেভাবে। এতে ভুল বা ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু এই শেখা ও ব্যবহারের মধ্যেই একটা নীতি ও রীতির ইঙ্গিত আছে যা প্রকৃতপক্ষে ভাষার প্রকৃতিগত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে তাকেই উপায় হিসেবে গ্রহণ শিক্ষার কাজকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেই ব্যাকরণের জন্ম। আধুনিক-পূর্ব যুগে মূলত তারই সূত্র ধরে ব্যাকরণ রচিত হয়েছে বারে বারে। বার বার যেটা ঘটেছে তা অস্বীকার করতে চাই বলেই বিপত্তি ডেকে আনি, সংস্কারের বিরোধিতা করতে পিছপা হই না। মনে করি ব্যাকরণ এক শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করে, যা ধর্মোপদেশের মতো অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ব্যাকরন ধর্মগ্রন্থও নয়, মহাপুরুষের দেওয়া আপ্তবাক্যও নয়, সাধারণ লোকের ব্যবহারে নিহিত ভাষার বৈশিষ্ট্যমাত্র। তার কাজ ভাষার প্রকৃতি-নির্দেশ এবং তার শুচিতা রক্ষা। নিত্যপরিবর্তিত হলে তা যেমন ক্ষতির কারণ হয়, তাকে চির-অপরিবর্তনীয় ভেবে নিলেও তা তেমনি ক্ষতিকারক।

প্রথম যেদিন ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল, লোক-সাধারণের ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য দিয়েই সে রূপ পেয়েছিল। আজ তা পঠিত বা অনুসৃত হয় না, কারণ ভাষার রূপ ও প্রকৃতি তারপর বহু-পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানের রীতির সঙ্গে তার কোনো ক্ষীণ যোগসূত্র থাকতে পারে, কিন্তু তা শুধু বিশেষজ্ঞের গবেষণার খোরাক হয়ে আছে। পাণিনিকে (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতক) আমরা মানি এবং মেনে চলা উচিত মনে করি। কিন্তু সেই পাণিনি তো বৈদিক ভাষার ব্যাকরণকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি। আজ আমরা সংস্কৃত ভাষার প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি, পাণিনির বৈদিক ভাষার প্রতি ততটা শ্রদ্ধা ছিল না বলেই কি আমাদের বিশ্বাস? তিনি তো ব্যাকরণ রচনার সময়ে সমসাময়িক ভাষার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সে-ভাষার বৈশিষ্ট্যে বৈদিক ব্যাকরণের যেটুকু অস্তিত্ব ছিল শুধু সেটুকুই মর্যাদা পেয়েছিল তাঁর বিধিবদ্ধতায়। যা অপ্রচলিত তা বর্জিত হয়েছে, যা প্রচলিত তা-ই হয়েছে গৃহীত—এভাবেই রচিত হয়েছিল 'অষ্টাধ্যায়ী'। ভাষার প্রকৃতি বদলায় কিন্তু তার ব্যাকরণ অপরিবর্তিত থাকে, এমন বিশ্বাসের পরিচয় অন্তত পাণিনি রাখতে পারেন নি। কাত্যায়ন (খ্রীঃ পূঃ ৩য়) ও পতঞ্জলিও (খ্রীঃ পূঃ ২য়) পাণিনির ধারাকেই অব্যাহত রেখেছিলেন। অপ্রচলিত বৈশিষ্ট্য অযুক্ত থেকেছে তাঁদের রচিত বিধিতেও। রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'ও (খ্রীঃ ১৮৩৩) সেকালের বাংলা ভাষার রূপ ও প্রকৃতি নির্ভর। এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখার সুযোগ তিনি পান নি, কিন্তু ব্যাকরণের মধ্যেই সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার যোগ সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন :

'গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাঁহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌড়ীয় ভাষাতে উচ্চারণে আইসে না, কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন, তখন ঐ সকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়।'

বাংলা ভাষায় অব্যবহৃত ধ্বনিগুলি ('ণ য ব ষ, ঋ ৠ ঌ, ৡ অং অঃ এই কয় অক্ষর সংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না') তাঁর ব্যাকরণে স্থান পেয়েছিল বাংলায় 'সংস্কৃত পদ ব্যবহারে'র সময় এগুলিকে 'লিখিবার প্রয়োজন হয়' বলে। বাংলাভাষায় 'সংস্কৃত পদ' এখনও ব্যবহৃত হয়, চিরকালই হবে। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'ও অপরিবর্তিত রূপে গৃহীত হবে কিনা সেটাই বিচার্য। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে বর্তমান কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। বিদ্যাসাগর বাংলা ব্যাকরণ রচনায় উৎসাহিত হলেন না বটে, কিন্তু 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগেই সংস্কৃত অক্ষরগুলির দু'একটিকে বিসর্জিত করে (ৠ, ৡ) বাংলা ধ্বনিরূপ জাত নতুন বর্ণ (ড়, ঢ়, খণ্ডত) সংযোজন করলেন। সংস্কারের একটা দিক এ পর্যন্ত এসেই থেমে থাকল। কারণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করলেন, অসংস্কৃত শব্দের নতুন বিধি রচনা করেও অনৈতিহাসিকভাবে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যকে সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলতে চাইলেন।

বিদ্যাসাগর ও সুনীতিকুমার, এঁদের মধ্যবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যাকরণ না লিখেও বাংলা ভাষার রূপ ও প্রকৃতির নানা সত্য-পরিচয় নানা নিবন্ধে উন্মোচন করলেন। সংস্কারের নানা দিক তাঁর সুমন্ত্রণায় উন্মুক্ত হল। রামমোহনের ভাবনার জবাবও মিলন তাঁর চিন্তায় :

বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামতো বানাইয়া লয়। লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। উর্দু ভাষায় পারসি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাঁচেই চতুর ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে হিন্দির বৈমাত্র সহোদর বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। * * * বাংলায় সংস্কৃত শব্দ ক'টা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন্ বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কী ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। (বাংলা ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব) রবীন্দ্রনাথের আলোচনা থেকে সুনীতিকুমারের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কিছু মতামতও কারণসহ পাওয়া গেল :

বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান।

সংস্কৃতভাষার সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার

প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান করিব জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ-কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। (বাংলা ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব)

এভাবে বাংলা ও সংস্কৃতের গরমিলের এবং আপাতমিলের অজস্র উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বাংলা ব্যাকরণের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করলেন।

কিন্তু ব্যাকরণ তো শিশু-শিক্ষার্থীর পথ্য, চাপে পড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাদের অনেক কিছু গিলতে হয়। সুতরাং সমস্যা থাকলেও তাদের নিয়ে অসুবিধা হয় না তেমন। অসুবিধা দেখা দিল শিক্ষিতজনের ক্ষেত্রেই। দুবেলা যাঁদের লেখাপড়া নিয়ে থাকতে হয় বানান নিয়ে তাঁরা পড়লেন বিপদে। বানান নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যাকরণ দিয়ে। বানানে বৈষম্য ব্যাকরণের কারণে। ব্যাকরণ না মেনে চলল বানানে বিশৃঙ্খলা। উপযুক্ত ব্যাকরণের অভাব এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণ হল।

রবীন্দ্রনাথ, যিনি ভাষা-ব্যবহারে নৈরাজ্য অপছন্দ করেন সবচেয়ে বেশি, নিজের প্রয়োজনে বানানের একটা খসড়া বানালেন। এতেই সন্তুষ্ট না হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বানান সংস্কারে ব্রতী হতে তিনি উৎসাহিত করলেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পরিভাষা সমিতি' গঠন করে বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা রচিত হচ্ছিল। তারই কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে আরও পাঁচজনের নাম যুক্ত করে গঠিত হল 'বানান সংস্কার সমিতি' (১৯৩৫)। সমিতির প্রস্তাব অনুসারে 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রকাশিত হল (১ম ও ২য় সংস্করণ ১৯৩৬, ৩য় ১৯৩৭) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রবীন্দ্রনাথ এই চেষ্টাকে স্বাগত জানালেন, 'বানানের নিয়ম'-এর বিধিগুলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে মন্তব্য করলেন, এই 'দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে' ব্যাপারটা থামবে না। দ্বিধা ঘুচিয়ে তিনিই নিজস্ব লেখায় আরও কিছু সংস্কার প্রবর্তন করলেন।

শুদ্ধ বানান জানার আর একটি ক্ষেত্র অভিধান। বানানের নিয়ম এর নীতিগুলি তাতে উদ্ধৃত হল, কিন্তু উদাহরণগুলি ছাড়া নিয়ম অনুযায়ী বানান উল্লিখিত হলনা। বাংলা ব্যাকরণের মতো তাও হল অসম্পূর্ণ।

বানানলোকে শেখে, দেখে অথবা ব্যাকরণের নিয়ম জেনে। ব্যাকরণ থাকল শৈশব কৈশোরের পাঠ্য হয়ে, দেখার ক্ষেত্র পত্রপত্রিকা, গ্রন্থ এবং প্রামাণিকভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় বানানে প্রভাব বিস্তার করল,

নিয়মভাঙা বানান প্রচলিত হল সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে। তার কারণ অবশ্য শুধুই রবীন্দ্র-প্রভাব নয়, রবীন্দ্রনাথ অনুসৃত নীতি, যা বাংলাভাষার প্রকৃতির অনুসারী।

ব্যাকরণের নিয়ম যখন মনে পড়ে না তখন অভ্যাস ও দেখার প্রভাবের সঙ্গে প্রভাবিত করে উচ্চারণরীতি। কোনো দেশের ভাষাই পুরোপুরি উচ্চারণানুগ নয়; তবে উচ্চারণ থেকেই বানানের জন্ম বলে সব ভাষাতেই বানান কমবেশি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে। সুতরাং বানান যদি যথাসম্ভব উচ্চারণানুগ হয়, বানান নিয়ে জটিলতা, বানানভুলের সম্ভাবনা, স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শ দিয়ে চালিত হয়েই বানান সংস্কার করেছিলেন। এই পন্থা যে ভাষাবিজ্ঞান সম্মত তাতে সন্দেহ নেই। তবুও অনেকে আজও এই নীতির বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের যুক্তি কোনো নীতিভিত্তিক নয়, দু-একটি দৃষ্টান্ত ভিত্তিক। যেমন, ইংরেজি ভাষার বানানে অনৈক্য আছে এবং সেই অনৈক্য দূর করার চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি, সুতরাং বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা নেই। ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কার-চেষ্টা বিশেষ সফলতা অর্জন করেনি বলে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা নেই এমন ধারণা-পোষণের মধ্যে আর যা-ই থাক যুক্তি নেই। বরং সেই অভিজ্ঞতা থেকে সংস্কারের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনটাই বোধহয় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, তাঁরা একথাও ভুলে যেতে চান যে পৃথিবীর সব ভাষারই সংস্কার অল্পবিস্তর হয়েছে এবং হচ্ছে।

বাংলা বানানের জটিলতা ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা বানানের নিয়ম পুস্তিকা। ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ এবং অকারণ জটিল। বানানের নিয়ম পুস্তিকায় গৃহীত নিয়মগুলি অপূর্ণাঙ্গ এবং বিকল্প-ব্যবস্থার দ্বারা অনর্থক অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত। তাছাড়া কিছু কিছু নিয়ম প্রচলিত হলেও কিছু নিয়ম পালনে আমরা আজও উৎসাহিত হই নি, এমন কি অভিধান সংকলকেরাও হন নি।

নিয়মের জটিলতা দূর করে বানানকে যথাসম্ভব উচ্চারণানুগ করলে ভাষাশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা অনেক পরিমাণে দূর হয়। এখানে যথাসম্ভব কথাটি গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং কোনো অবস্থাতেই উপেক্ষনীয় নয়। কারণ, উচ্চারণ অনুযায়ী বানান কখনো কোনো ভাষায় সম্ভব হবে না। উচ্চারণ থেকে বানানের সৃষ্টি বলে এবং উচ্চারণ দিয়ে বানান নিয়ন্ত্রিত হয় বলে উভয়ের যথাসাধ্য যোগ বাড়তি পরিশ্রম, অনর্থক সময়ব্যয় এবং অকারণ জটিলতা থেকে আমাদের রক্ষা করে।

পদ্ধতি যত সহজ হবে উপায় ছেড়ে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ তত তাড়াতাড়ি করা যাবে। সুতরাং সব ধরনের শিক্ষার্থীর পক্ষেই সহজ পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু

বর্তমানে সহজ পদ্ধতির কথা আমাদের ভাবতে হচ্ছে অন্য আরও একটি কারণে। সভ্যতার বিকাশ ও শিক্ষার বিস্তার এখন সব মতাবলম্বী লোকেরাই চান। শিক্ষার প্রসার যেমন শিশুশিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে হবে, তেমনি অশিক্ষিত বয়স্ক জনকে তাঁদের প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার দ্বারাও করতে হবে। সে উদ্যোগ শুরু হয়েছে, কিন্তু বানান, যা ভাষার শরীর, তার সংস্কার না করেই।

গণশিক্ষা, জনসংযোগ ইত্যাদির প্রতি আমরা যত বেশি নজর দেব ভাষার সরলতা, বানানে সাম্য ও সরলতার প্রয়োজনীয়তা ততই অনুভব করতে বাধ্য হব। কারণ, অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিতের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সহজ পদ্ধতি ছাড়া সম্ভব নয়। শিশু মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে কোনো ক্রমে রক্ষা পেতে পারে। শিক্ষিতজন যেমন চলছে তেমনিভাবে কাল কাটিয়ে সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু বয়স্কজনের পক্ষে জটিলতা সত্ত্বেও ভাষা আয়ত্ত করার সময় নেই, ইচ্ছাও নেই। প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তাঁরা সবসময় সচেতন নন। সুতরাং তাঁদের শিক্ষিত করতে আন্তরিকভাবে চাইলে সহজ পদ্ধতি গ্রহণ ছাড়া উপায় থাকে না।

সমস্যাটা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে গদ্যের ব্যাপক ব্যবহারে বানানে কিছুটা সাম্য ছিল। কিন্তু চলতি বাংলা, মুখের ভাষা, যতটা প্রয়োজনীয় ততটাই স্বেচ্ছাচারমূলক। মুখের ভাষার সঙ্গে তাল রেখে বানান বদলালে বানান-এর নিত্য ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, যা শিক্ষার কারণেই কাম্য নয়। সেজন্যেই, আঞ্চলিক ভাষা সত্ত্বেও যেমন একটা আদর্শ কথ্যরীতি (Standard Colloquial dialect) আমরা কথাবার্তা ও আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, তেমনি নানা উচ্চারণ-রীতি সত্ত্বেও একটা আদর্শ বানানরীতি অনুসরণ করাটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

অনেক সংস্কারপন্থীর মতে সাধু ভাষা থেকে কথ্যভাষার পরিবর্তনটা যেহেতু মূলত বিশেষণ, ক্রিয়া ও অনুসর্গ-ঘটিত, সুতরাং সংস্কারটা এই তিন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেই সমাধান এসে যাবে। তাতে সমাধানের অনেকটা ক্ষেত্র রচিত হবে সত্য কিন্তু পুরো সমস্যার ক্ষেত্র এ-টুকুতেই সীমিত নয়।

তৎসম শব্দের বানান প্রায়শ নির্দিষ্ট হলেও সর্বত্র নয়। অনেক শব্দে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ই বা উ-র বিকল্প বানান অভিধানে গৃহীত। নতুনত্বের মোহে আমরা উভয় বানানকেই প্রশ্রয় দিয়ে থাকি (সূচি-সূচী)। কখনো কখনো দীর্ঘস্বরের প্রভাবে হ্রস্বস্বরের রূপান্তরীকরণ স্থায়ীরূপ লাভ করে (টী/টি) কখনো আবার হ্রস্বস্বর প্রবণতায় অভিধানে অগৃহীত বানানও ব্যবহৃত হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে যায়। অযুক্ত অর্থে উহ্য বানান বাংলায় এ-ভাবেই এসেছে এবং ব্যাকরণ সম্মত উহ্য বানান বোধহয় রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই

সর্বশেষ দেখা যাবে। উহ্য বা ছাত্রী (মহিলা ছাত্র অর্থে) ব্যাকরণের শাসন না মেনে বাংলাভাষায় যেভাবে এসেছে সেভাবে না হোক, বিকল্প বিধান বর্জন করেও তৎসম শব্দকে বাংলা অভিধানে স্থান দেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বিকল্প বর্জনের সময় দীর্ঘস্বর গ্রহণীয় নয় কেন, অর্থাৎ 'সূচি'র পরিবর্তে 'সূচী' বানান—বিশেষ দীর্ঘ-ঈ-কার লেখা যখন সোজা (আমরা তো সহজ করতেই চাই) এবং বৈজ্ঞানিক-রীতি সম্মত। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব নয়। ভাষাবিজ্ঞানের মূল কথা প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করা এবং তাকে যথাসাধ্য গুরুত্ব দেওয়া। উনিশ শতক থেকে এতাবৎ দীর্ঘস্বরের হ্রস্বস্বরে রূপান্তর, পরিবর্তন, বিবর্তন ঘটেছে, বিপরীত রীতি কখনো দেখা যায় নি ; সুতরাং হ্রস্বধ্বনিই বাংলাভাষার স্বীকৃত ধ্বনির মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। উচ্চারণ-প্রবণতাতেও তার সাক্ষ্য মেলে, কারণ বানান ও ধ্বনির সমতারক্ষা ভাষামাত্রেরই বৈশিষ্ট্য। উচ্চারণ-প্রকৃতি বদলায়, কখনো আবার আপাত বৈপরীত্যও ডেকে আনে, কিন্তু হ্রস্বস্বরকে দীর্ঘস্বরে পরিণত করার প্রবণতা আজও দেখা যায় নি।

একজাতীয় তৎসম শব্দের বেলায় আরও জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। ইন্-ভাগান্ত এই শব্দগুলির রূপপরিবর্তন বাংলা বানান ভুলের অন্যতম কারণ। মন্ত্রিন্, সহযোগিন্, প্রতিযোগিন্, উপকারিন্ ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত ; বাংলায় তাদের রূপ মন্ত্রী, সহযোগী, প্রতিযোগী, উপকারী। সংস্কৃত নিয়ম মেনে এই শব্দগুলি থেকে মন্ত্রিসভা, সহযোগিবৃন্দ, প্রতিযোগিবৃন্দ, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, উপকারিতা ইত্যাদি শব্দ বাংলায় প্রচলিত। কোন্ কোন্ শব্দ ইন্‌ভাগান্ত, কখন তাদের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়ে যায় জানা না থাকায় 'প্রতিযোগীতা, সহযোগীতা' ইত্যাদি বানান চোখে পড়ে। উপযোগী, প্রতিযোগী ইত্যাদি শব্দকে বাংলা শব্দ ধরলে উপযোগীতা, প্রতিযোগীতা, মন্ত্রীসভা ইত্যাদি বানান লেখা যায়। তা না হলে মন্ত্রিন্ ইত্যাদি শব্দের অস্তিত্ব বাংলাতেও স্বীকার করতে হয় অথবা সমাসের ক্ষেত্রে বাংলামতে দীর্ঘ ঈকার যুক্ত করার বিধি মেনে (মন্ত্রীসভা) প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে loak words হিসেবে উপযোগিতা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি লেখা যায়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে হ্রস্বস্বর কোনো কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বরকে স্বীকৃতি সমাধানের পথ হতে পারে না, আর দীর্ঘস্বরের স্বীকৃতি তো ধ্বনিস্বভাবের বিরোধিতা। ব্যাপক সংস্কার ধ্বনিস্বভাব বিরোধী হলে সংস্কারের উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ হয়ে যায়।

তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে মূলানুগ বানান নিয়ে একসময়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দেবপ্রসাদ ঘোষ ও ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও 'বানান

বর্ণন, সোণা/স্বর্ণ, কাণ/কর্ণ বানান চলেনি, সুতরাং পুজো, পুব-এর বেলায় আর তাঁদের পথ অনুসরণ না করে রবীন্দ্রনাথকে মান্য করলেই বাংলাভাষার প্রকৃতিটিকে মানা হয়।

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে সমস্যা মূলানুগ উচ্চারণ ও গৃহীত বানান নিয়ে। 'প্যারিস' ও পারী উভয় রূপে আবির্ভূত হলে শহরটিকে চেনা দায় হয়ে ওঠে মনে হয় শহর তো একটা নয়, দুটো ; সুতরাং গৃহীত উচ্চারণের ও বানানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নবাগত শব্দের বানান নির্ধারণ করাই উচিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। পরিভাষা সংগ্রহ ও রচনার কাজে আমরা বিশেষ মনোযোগী। ভারতীয় সব ভাষাতেই বোধহয় তার সমান তোড়জোড় চলছে। তার নীট ফল একটি শব্দের বোলটি না হলেও অন্তত কয়েকটি শব্দে রূপান্তর। এতে National integration এর কাজ ত্বরান্বিত হয় অথবা ব্যাহত হয় একটু ভেবে দেখা দরকার। একটি পরিভাষা যদি ভারত জুড়ে গৃহীত হত আশাকরি সর্বভারতীয় শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে অনেক অনর্থ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত—গণশিক্ষার প্রসার এবং জন-সংযোগের পক্ষেও তা সুবিধার কারণ হত।

শব্দমাত্রেই তার পরিচিত আকৃতিতে আমাদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে। নানা বেশের মতো নানা বানানে তার আবির্ভাব তাকে সহজে চেনায়, সঠিক চেনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা যত স্বল্প, শিক্ষার সঙ্গে যোগ যতটা ক্ষীণ, এই চেনার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা তত কমে যায়। 'রঙ্গীন ছবি' কথাটা হয়তো ছবির বর্ণাঢ্যতার ইঙ্গিত দিতে পারে, কিন্তু 'রঙ্গীন' রং অথবা 'রঙ্গ' কোনোটিকেই বিশেষভাবে জানাতে পারে না। রঙিন দিনের ভাবনা যদি আমরা ভেবেই থাকি, একের ভাবনা সহস্রের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা যদি আমাদের জেগেই থাকে, জনসমুদ্রে জোয়ার তোলার আকাংক্ষা যদি দেখা দিয়ে থাকে, তবে সহজ বানানে, বিকল্পহীন বানানে, যথাসম্ভব উচ্চারণভিত্তিক বানানে তা করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

পুরাতন সাহিত্য ঃ গণসংযোগের সমস্যা

বিজিতকুমার দত্ত

আমার প্রবন্ধের শিরোনাম যে একটা সমস্যা হতে পারে সেকালের কবিদের তা জানা ছিল বলে মনে হয় না। কবিরা কবিতা রচনা করেন পাঠকের জন্যে। পাঠকের তৃপ্তিই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আধুনিক কবিতা রচিত হয়েছে অন্যকালে। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, 'লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ'—কথাটা অনেকেই মনেতে চান না। অনেকে বলবেন লেখকের রচনার উচ্ছ্বাস আত্মগত, পাঠকেরা তা আড়ি পেতে শুনে থাকেন। পাঠকের সঙ্গে কবিকর্মের সংযোগ কিভাবে ঘটতে পারে সে নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছে অনেক—এখনও সে তর্কের অবসান হয় নি। কিন্তু সেকালে কবিতার চেহারাটা ছিল একটু অন্যরকম। কবিতার আনন্দযজ্ঞে গান, নাচ, দৃশ্য সকলেরই অবারিত দ্বার ছিল। আধুনিক কবিতা গান থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং তা পাঠ্য। সেকালে কবিতা ছিল মিশ্র। সেকালের অধিকাংশ কবিকর্ম শ্রোতার চোখ, কানকে মান্য করেছে। কবিদের সংযোগের কথা বিশেষ ভাবতে হয় নি। কবিতার ফর্মটাই এমন ছিল যা শ্রোতাকে মুহূর্তে অন্তরঙ্গ করে নেয়।

কবিতার সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার যোগ ঘনিষ্ঠ। এই উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ গড়ে উঠেছে। সেই সমাজের চাওয়া-পাওয়া নিয়েই কবির কবিকর্ম। এমন বিষয় কবিরা গ্রহণ করেন যার চাহিদা সমাজের কেবল একজনের নয়—সমষ্টির। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে এই সমষ্টির আশা-আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। সুতরাং সংযোগের সমস্যা আলোচনা কালে বিষয়কে বাদ দিয়ে কেবল ফর্মের প্রতি মনোযোগী হওয়টা সঙ্গত বলে মনে হয় না। তাছাড়া কবিতার দেহ ও আত্মা অভিন্ন। আমি এই আলোচনায় উভয় দিকেই লক্ষ্য রেখেছি।

কোনো কোনো কবি সেকালেও এমন কিছু রচনা করেছেন যা 'বিরলে' বুঝতে হবে। মন্ত্র, তন্ত্র এবং মন্ত্রতন্ত্রঘেষা রচনা বিশেষ গোষ্ঠির জন্যে। রূপক, পারিভাষিক শব্দ (সন্ধা অথবা সন্ধ্যা শব্দ/পংক্তি) এসব রচনায় প্রচুর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে লুইপাদের কীর্তন শুনিয়েছেন—শ্রোতাও ছিল মোটামুটি। কিন্তু এ কীর্তনের অন্তঃপুরে কজন পৌঁছতে পেরেছিলেন আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আউল-বাউল-কর্তাভজা সঙ্গীত এই জাতীয় নয়। এরা যে রূপকের আশ্রয় নিয়েছে সে রূপক একেবারে ঘরের, যার সঙ্গে মানুষ ঘনিষ্ঠ। চর্যাগীতিতেও পরিচিত রূপক আছে এবং তারই ধারাস্রোত হয়ত আউল-বাউল ইত্যাদি সঙ্গীতে মিশেছে। এমন কি

রবীন্দ্রনাথেও তার ধ্বনি শোনা যায়। সেদিক থেকে এসব গানের শ্রোতাসংযোগ ঘটত সন্দেহ নেই। চর্যার মিষ্টিক আবেদন আর বাউলের মিষ্টিসিজম এক জাতীয় কিনা আমার সন্দেহ আছে। বাউল সংসারকে অসার ঘোষণা করতে গিয়ে সংসারের মায়ামোহের কথা বলেছেন, কখনও কখনও মায়ামোহের বন্ধন-উত্তীর্ণ এ অচিনপুরের নেশা শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে নিশ্চয়ই। সেই অচিনপুরের সীমার প্রতীক নারী-পুরুষ। এই প্রতীকের মূল্য শ্রোতার কাছে অনেকখানি।

যাই হোক আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যের যে বিশিষ্ট দুটি ধারা তার সম্বন্ধে আলোচনা করি। মঙ্গলকাব্যে পাই—

শ্রবণ মঙ্গল কথা দেবীর পূজায় গাথা
বিপদে পরম প্রতিকার।
এই ব্রত-ইতিহাস শুনিলে কলুষনাশ
কলিকালে হইলে প্রচার ॥

এরপর নারদীয়পুরাণের দোহাই দিয়ে কবি কলিকালের কাহিনী শুনিয়েছেন। সেখানে আশার বাণী নেই। মহীপাল নীচ হবে, লোক হবে ধর্মে পরাঙ্মুখ এবং বেদের নিন্দা একালের বৈশিষ্ট্য হবে। পরপীড়া, কৃতঘ্নতা, অধর্ম, অপাত্রে মান আর কুলবধূ স্বতন্ত্র হবে। বিত্তায় মতি হবে না। দ্বিজেরা শূদ্রের আচরণ করবে। নিষিদ্ধ মাংসে অভিরুচি, ব্রাহ্মণে অশুচি, লোভ, পরান্নের প্রতি আগ্রহ দেখা দেবে। ব্রাহ্মণ অভব্য হবে। লোহা, লাক্ষা, লোন দ্রব্য বেচে প্রচুর ধন সঞ্চিত করবে। শূদ্রের শিষ্য হবে ব্রাহ্মণ। লোক হবে ভিক্ষা-জীবী। অকালমরণ, দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, শোক লেগে থাকবে। পরকে হিংসা করবে এবং আত্ম-শ্লাঘায় মুখর হবে মানুষ। পুত্র পিতাকে হিংসা করবে, ছাত্ররা গুরুকে হিংসা করবে। রাজা প্রজাকে পীড়ন করে অর্থ আত্মসাৎ করবে। প্রজারা পালিয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ মৎস্য, মাংস খাবে। পাঁচ বছরেই নারী গর্ভবতী হবে ইত্যাদি। সমকালীন জীবনের এই দৈন্যের চিত্র মানুষকে পরকাল সম্বন্ধে উৎসাহিত করে সন্দেহ নেই। কবিদের যাঁরা পোষ্টা ছিলেন তাঁরা সম্ভবত এই-ই চেয়েছিলেন। মানুষ ভুলে থাক তার বর্তমান কালের কথা—কেননা বর্তমান তো এই। এই বর্তমানকাল কে চায় বলুন? আমাদের প্রশ্ন, এসব কথা নির্বিচারে মেনে নিল কেন শ্রোতারা? প্রতিবাদে মুখর হয় না কেন মানুষের ভাষা? তখন বুঝতে পারি, এ সবের উপর প্রলেপ আছে ধর্মের—যে ধর্ম ভয় ও ভীতির যন্ত্র। কেননা লোকাচারকে যদি মেনে নিই, যাকে রঘুনন্দন শাস্ত্রের বন্ধনে বেঁধেছেন, তাহলে একেই সত্য বলে মানতে হয়। অবাধ বিশ্বাসে সাধারণ মানুষ তখন একেই সত্য বলে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু এহো বাহ্য, মঙ্গলকাব্যগুলিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কথা আছে। আছে দেশ-কালের কথা। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই কবিদের দেশ চেতনা সম্বন্ধে। সমাজের রীতিনীতি, চালচলন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভালোবাসা-মমতা, স্নেহের সুন্দর উদ্‌ঘাটন মঙ্গলকাব্য। আমরা আমাদের পেয়ে যাই মঙ্গলকাব্যের বিবরণে। কেবল তাই নয়, দেশের পশুপাখী, গাছ-গাছালির যে তালিকা মঙ্গলকাব্যে বিধৃত সে-সবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন কবিবৃন্দ। তারা আমাদের ঘরের কাছের বস্তুকে নয়ন মেলে দেখতে পেরেছেন এই কাব্যে। সংস্কৃতির অন্তর্গত এই সব চিত্র। দেশ মানে তার বস্তুপ্রকৃতি, নদনদী, বাসস্থান। একথা প্রায়ই বলা হয় মঙ্গলকাব্যে কতকগুলি প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা আছে। যেমন বিবাহঘটিত অনুপুঙ্খ বিবরণ, সন্তান জন্মের খুঁটিনাটি তথ্যের উল্লেখ মঙ্গলকাব্যে পাই। আমাদের কাছে এই বিশদ বর্ণনা আজ ক্লান্তিকর মনে হয়। কেননা পরিবার-পরিকল্পনায় এই বিবরণ রীতিমত অশ্লীল মনে হতে পারে। কিন্তু এক সময় তো তা ছিল না। তখন জনসমস্যার চাপ কি রকম ছিল আমরা জানি না। কিন্তু নবজাতক সেকালের সমাজে অভ্যর্থিত। একটু ভালোভাবেই স্বাগত। কুমারীর জননীপদবীতে উত্তরণ কল্যাণের প্রতীক। সুতরাং সে পর্যায়টুকুর বিশদ বিবরণ শ্রোতার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেবে সন্দেহ নেই। আবার নবজাতকের সংস্কার সম্বন্ধেও একই মন্তব্য করতে পারি। নবজাতককে কেন্দ্র করে যে পারিবারিক অনুষ্ঠান তা সামাজিক মর্যাদা লাভ করত। উৎসবের মধ্যে গ্রাম-জীবনের স্পন্দন শোনা যেত।

ই. এম. ফর্স্টার তাঁর Aspects of the novel বইতে কয়েকশ্রেণীর উপন্যাস-পাঠকের কথা বলেছিলেন। কেন আমরা উপন্যাস পড়ি? বলা বাহুল্য এর উত্তর আলঙ্কারিকদের কাছে একটা হলেও (আনন্দের জন্যে) বাস্তবে দেখা যাবে এর উত্তরও পাঠকভেদে ভিন্ন। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ—এই প্রবচনের দোহাই দিয়ে বিষয়টিকে সরল করে দেখবার কোনো কারণ নেই। বস্তুত একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার চলতে চলতে যখন উপন্যাস পড়েন, অথবা মনিবকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে একজন ড্রাইভার যখন ক্লান্তিকর বিশ্রামটুকু উপভোগে উপন্যাস পড়েন, অথবা বাড়ীর গিন্নী যখন ছেলে-মেয়েদের স্কুলে এবং কর্তাকে কাজে পাঠিয়ে দিয়ে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার ওষুধ হিসেবে উপন্যাস পড়েন কিংবা একজন সমাজজিজ্ঞাসু পাঠক উপন্যাস পড়েন তখন আমাদের ভাবতে হবে যে প্রত্যেক পাঠক তার নিজের বিষয়টুকু উপন্যাসে পেয়ে যান। যিনি গল্পের জন্যে পড়েন তিনি গল্পের বস্তু উপন্যাসে পাবেন, যিনি চরিত্র রচনা দেখতে চান তিনি তাই উপন্যাসে পাবেন, কেউ বা পাবেন প্লটের কৃতিত্ব। কেউ বা পড়েন

আপনার মুখ আপনি দেখার আগ্রহে। উপন্যাসের পাঠক সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। উপন্যাসের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করার কারণ মঙ্গলকাব্যগুলি উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত রচনা বলে। এই মঙ্গলকাব্যই কাব্যের বিভিন্ন শাখাগুলিকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল। গল্পের জীবনকে গ্রাস করে এই কাব্য কখনও কখনও ছদ্মবেশী রূপ ধরেছে। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের শ্রোতাও নানান ধরনের ছিল। যতদূর বুঝি আসরে গ্রামের কর্ষণজীবী ও অকর্ষণজীবী উভয় সম্প্রদায়ই শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। সকলেই নিজের নিজের ভোজ্য পেতেন এই নিমন্ত্রণে। সেজন্য শ্রোতার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের সেতুবন্ধ রচনা করা খুব দুরূহ হত না। কবিরা কি এই সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন? নিশ্চয়ই। এবং সেইটিই গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই জানি কর্ষণজীবী এবং অকর্ষণজীবী দুই শ্রেণীর মানুষ আছে সমাজে। কবিকে অকর্ষণজীবী শ্রেণী জমি, বিত্ত দিয়েছে। আমরা আশা করতে পারি এমন কিছু তিনি লিখবেন না যা অকর্ষণজীবীর স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে। তার আয়োজনও মঙ্গলকাব্যে প্রচুর। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধনপতি সদাগরের কথা। ধনপতির পায়রা ওড়ানোর সংবাদ এবং এই লেখার সূত্রে প্রেমলীলার ঘটনা কবি বিশদ করেছেন। ধনপতির দাম্পত্য জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চমৎকার চিত্র কবি দিয়েছেন। তাঁর বাসরঘরের কেলি-প্রসঙ্গ কবি সাড়ম্বরে শ্রোতার গোচর করেছেন। সমুদ্রযাত্রার বিরাট আয়োজনের বর্ণনাও বাদ পড়েনি। বণিকসমাজের এই বর্ণনা কর্ষণজীবী সম্প্রদায় কিভাবে গ্রহণ করত? কৃষিভিত্তিক সমাজে যারা উদয়াস্ত খেটে উৎপাদনকে টিকিয়ে রেখেছিল তারা বণিকের খেলায় মেতে উঠবে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু শক্ত হোক আর যাই হোক শ্রোতার প্রতিবাদ তো আমরা শুনিনি। কিংবা এসব বর্ণনা-চিত্রকে সেইসব শ্রোতা উপেক্ষা করত কি? আমাদের মনে হয়, না। বিত্তের অভাবই বিত্তবানের খেলায় তার আগ্রহ জাগাত। তার অজান্তে যে বাসনা সে লালন করে এসেছে, সেই লালিত বাসনারই প্রত্যক্ষ রূপ দেখতে পেত ঐ খেলায়। মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগের রোমান্স। রোমান্স এক অর্থে পলায়ন। এই পলায়ন বাস্তবজীবন থেকে। বাস্তবজীবনে পল্লীবাংলার চেহারাটা কি ছিল? অকারণে উজ্জ্বল চিত্র এঁকে লাভ নেই। নিরুপদ্রব, শান্ত জীবন ছিল নিশ্চয়ই। এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন-এর কথা এখানে নিশ্চয়ই স্মরণে রাখছি। কিন্তু আসলে দীর্ঘকাল ধরে সমাজের অপরিবর্তন মানুষের মনেও একটা জড়তা এনে দেয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় যখন নূতনকে বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না, বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা যখন প্রকৃতিকে আয়ত্তের মধ্যে আনার কোন উৎসাহ নেই, তখন

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অক্ষয় করে রাখবার দিকেই সামন্ত প্রভুদের লক্ষ্য থাকবে। এবং সমাজযন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবিত হবে। এরকমই একটা উপায় সাহিত্যে রোমান্সসৃষ্টি। আমরা মঙ্গলকাব্যগুলিতে রোমান্সের সাক্ষাৎ মুহুর্মুহু পাই। এক ধরনের দৈবে বিশ্বাস এই রোমান্সেরই প্রকাশ বলা যেতে পারে। কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, নগরপ্রাপ্তি এইরকম ঘটনা ছাড়া আর কি? কিংবা ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের একের পর এক এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীগুলি তো রোমান্স-ই। যে অলৌকিক বলে লাউসেন সব বাধা অতিক্রম করে তা বাস্তব জগতে সম্ভব নয়। ইউরোপীয় নাইটদের মতোই কালকেতু বীরত্ব-প্রদর্শন করে কন্যারত্নও লাভ করে। এই পাওয়ার শেষ নেই মঙ্গলকাব্যে। শ্রীপতি সিংহলে পত্নী পায়, বেহুলা লখিন্দরকে পায়, সনকা শেষ পর্যন্ত সবই ফিরে পায়। আবার না-পাওয়ার দিকটাও কম নয়। গুজরাট রাজ্যের পতন হয়, বাসর ঘরে সর্প দংশন ঘটে, হাসান-হোসেনের বিপর্যয় দেখা যায়, চাঁদসদাগর চরম দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হয়, ধনপতি জেলে পচতে থাকে। রোমান্সের রাজ্যে এইসব ঘটনা শ্রোতার চিত্তকে কখনও করুণায় ভারাক্রান্ত করে, কখনও আশার আলেয়ার টেনে নিয়ে যায়। সিংহলে বাণিজ্য করতে সেই সময়ে কোনো বাঙালী বণিক যেতেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। বড় জোর কেউ কেউ ভারতবর্ষের মধ্যেই বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে আনাগোনা করতেন। এই সিংহল হচ্ছে আমাদের রূপকথার দেশ। সেই দেশে যেতে নানা বাধাবিঘ্ন পেরোতে হয়। কমলে-কামিনীর রূপক অর্থ নিশ্চয়ই আছে, ধর্মীয় অর্থও আছে, কিন্তু একথা কি অস্বীকার করতে পারি সমুদ্রযাত্রার ভয়াবহতা ঐ কমলেকামিনী রূপকের মধ্যেই আছে? এসব পেরিয়ে সিংহলেও কম নির্যাতন সহ্য করতে হয় না ধনপতি-শ্রীপতিকে। আবার চাঁদের নৌকো ডুবে যাওয়া—এও তো বাস্তবের কাছ ঘেঁষে আমাদের বিপদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। গুজরাট রাজ্য যে ভাবে ধ্বংস হয় তা-কি বন্যা, মারী দুর্ভিক্ষের কথা মনে করিয়ে দেয় না? অথবা লাউসেনের এ্যাডভেঞ্চারে অঘোরবাদল আসার মানেটা কি? এও তো বাঙালীর প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা। তবে ঘটনাগুলি ঘটছে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবতাদের সূত্রে। যখন দেবতায় আমাদের বিশ্বাস অনড় (এই শিক্ষা মরচে পড়ে সমাজের গায়ে লেগে আছে) তখন সেই স্বপ্নরাজ্যেই আমরা পাওয়া না-পাওয়ার কথা শুনতে চাই। জীবনের উদ্দেশ্য যখন সঙ্কীর্ণ, জন্মমৃত্যুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—তখন ঐ রাজ্যের ইশারা আমাদের উত্তেজিত করবে বৈকি। এও পাঠাকের সঙ্গে সাহিত্যের একরকমের যোগ স্থাপন করা—একে মানি বা না-মানি। এই প্রসঙ্গেই দেবতা-নির্ভর কৃষিভিত্তিক সমাজের কথা

আসে। মধ্যযুগের ধর্মের যে চেহারাটা আমরা দেখতে পাই তার দুই ধারা। এক লৌকিক, দুই পৌরাণিক। কবিরা এই দুইকে মেলাতে চেয়েছেন। সমাজেও এই মিলনাকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছিল। অতএব পুরাণ-শাসনের পাশাপাশি এসেছে লৌকিক দাবি। এ ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে দেখতে পাই। সব বাদ দিয়েও যে দুটি কাহিনী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে তা হল দান ও নৌকালীলা। এই নৌকাবিলাস উনিশ এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাধারণের কাছে সমাদৃত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সমান্তরালে এক সময়ে প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠে লৌকিক কাহিনীর ধারা চলেছিল। একথা ঐতিহাসিকরা প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন। রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা, ব্রতগীত, ছড়া-গানে মানুষ ভোজ্য বস্তু যথেষ্ট পেয়েছে। এর কিছু আমরা সংকলনগ্রন্থে (প্রাকৃত পৈঙ্গল, গাহা সত্তসঈ) পেয়েছি কিছু অনুমান করে নিতে হয়। মধ্যযুগ তাই নবসাজ পরল। বলাবাহুল্য মানুষের দাবিতে কবিবৃন্দ সানন্দে সাড়া দিয়েছিলেন। এই কারণেই কানু (কৃষ্ণ), রাই (রাধিকা), বেহুলা (বিধুরা), লহনা, খুল্লনা এ নামগুলিতে সংস্কৃতের জামাজুতো পরাননি কবিরা। সাহিত্যের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচিত হচ্ছে এইভাবে। মঙ্গলকাব্যে আমরা লোককথার বিস্তার দেখতে পাই একটু তির্যকভাবে। দেবতারা যে আচরণ করেছেন তাতে লৌকিক ভাবনাই গুরুত্ব পেয়েছে। চণ্ডী-মনসার বিসদৃশ কলহ, অথবা দেবীর প্রচণ্ড জেদ (গোর্খবিজয় কাব্যে দেবীর উলঙ্গ হয়ে থাকা), মনসার নেতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র, চণ্ডীর পদ্মার সঙ্গে ডিপ্লোমেটিক কথাবার্তা—ইত্যাদিতে দেবতাদের লোকসংস্কারের অঙ্গীকার লক্ষ্য করা যায়। সকলেই বলেছেন (দু-একজন প্রতিবাদী আছেন) মঙ্গলকাব্য ব্রতগীতের কালোচিত সংস্করণ। ব্রতগীতে টোটেম, টাবু, যাদু, ফেটিশ ইত্যাদির মুহুর্মুহু উল্লেখ তো সকলের জানা। ঐসবকে কেন্দ্র করে মানুষের কল্পনা মুক্তি পেত ব্রতগীতে। অবনীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে সে কল্পনার বিস্তারকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা মঙ্গলকাব্যেও এসবের উপস্থিতি দেখতে পাই। এসব কাব্য যে জনসাধারণের মনোহরণ করতে পেরেছিল বিষয়বস্তুর মধ্যেই তার কারণ মিলবে। আবার ব্রতগীতের স্পিরিটও মঙ্গল-কাব্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ব্রতগীতে একটি মাত্র কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া পাই। 'আমরা পূজা করি পিঠালির চিরুনি / আমাদের হয় যেন সোনার চিরুনি।' অথবা 'রণে বণে এয়ো হব / কালে পুত্রবতী হব।' মঙ্গলকাব্যেও কি আমরা এই ভাবনারই বিস্তার দেখি না? রঞ্জাবতীর পুত্রকামনা তো এই। মঙ্গলকাব্যে পুত্রলাভ এই ব্যাপারই। আবার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে নারীরা যখন এয়ো হবার কামনা জানায় ব্রতগীতে, তখন মঙ্গলকাব্যে

স্বামী-পুত্রদের বাণিজ্যে পাঠিয়ে স্ত্রীদের কামনা হচ্ছে তারা যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে—এও একই ব্যাপার। ঘরে দারিদ্র্যের ভয়াবহতা, তবুও সোনার চিরুনির আকাঙ্খা। মঙ্গলকাব্যে সেই আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি, প্রতিষ্ঠান, প্রতিক্রিয়া। ব্রতগীত যৌথমনের সৃষ্টি। এমন হতে পারে প্রাগৈতিহাসিক যাযাবর জীবনের আশা-আকাঙ্খা এই গীতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মঙ্গলকাব্যে যখন এই নদী এসে পড়ল তখনও নদীর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল না। শ্রোতৃবৃন্দের বৃহত্তর অংশ এই কাব্যে তার স্বাদ পেয়েছে। এই কারণেই রাত্রি জেগে এসব শোনার আগ্রহ শ্রোতাদের ছিল। ভুলে যাচ্ছিনা এই সঙ্গে ধর্মীয় ভয় ভীতি এবং ভক্তি ছিল নিশ্চয়ই। বেহুলার স্বর্গে নৃত্যরতা রূপ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতে আমাদের উৎসাহ জাগায় না। ভেবে দেখলে এখন কি বলব না কি এই দৃশ্যে কুলবধূর লাঞ্ছনাই দেখতে পাই না? কিন্তু সেকালের জনমানস সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিল বিনা আজ তা জানাবার উপায় নেই। তারা হয়ত স্বর্গের দেবতাদের তুষ্টিবিধান এবং স্বামীবর লাভকেই সনেন্দে গ্রহণ করেছিল। এসব অংশেও শ্রোতাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। বেহুলার যন্ত্রণায় যেমন তারা অশান্ত হয়েছে তেমনি সতীত্বের মহিমায় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নির্ভরতা পেয়েছে। আসলে গোটা মঙ্গলকাব্য জুড়েই তো সতীত্বের মহিমা। আশ্রিতা নারীর স্বামীর জন্যে ভোগের উপকরণ জোগানোর যে মর্মান্তিক চিত্র চণ্ডীমঙ্গলে আছে তা আমাদের খুবই বিচলিত করে। ধনপতির সঙ্গে কেলিরঙ্গে যোগদানের পূর্বে খুল্লনাকে নিয়ে কবি যে জাঁকালো বর্ণনা দিয়েছেন তা কামশাস্ত্র সম্মত কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ধনপতির দিক থেকে কি খুল্লনার তৃপ্তি বিধানের সেরকম কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল না? কায়েমি প্রথার জয়ে ভোগী মানুষ উল্লাস বোধ করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সাধারণ শ্রোতা একে কি ভাবে গ্রহণ করেছে। অশ্লীল বর্ণনার জারকরসে বুঁদ হয়েছে শ্রোতা? যারা এরকম ভোগসুখের অধিকারী তারা এ বিলাস-ব্যসনে স্বাগত জানাবেন কবিবৃন্দকে, সন্দেহ নেই। আবার রোচক বর্ণনায় এক শ্রেণীর শ্রোতার আনন্দ তো থাকতেই পারে। অধিকাংশ শ্রোতা চেতনার অভাবে, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র বনওয়ারির মতো কর্মফলে বিশ্বাসী ছিল বলে কৌতুক বোধ করেছে—এই পর্যন্ত। কবিও স্বধন্য বাঁকুড়ারায়-সুত রঘুনাথকে নিয়ে কিঞ্চিৎ কৌতুকরস সঞ্চার করেছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে কারও কারও জিত (যেমন মুকুন্দ) এইখানে যে কঠোর জাতিভেদের দ্বারা বেষ্টিত সমাজের অন্তস্থলে পৌঁছতে পেরেছিলেন। আমরা কেবল বাঙ্গাল মাঝির হাস্যকৌতুকটি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এই মাঝিরা যে শ্রমের দ্বারা জলপথ অভিযান করেছে এবং সে

পথের বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করেছে সেকথা ভুলব কি করে। সেকালের শ্রোতাদের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যোগসূত্র রচনায় এও ছিল এক উপায়। সকলেই জানেন সমুদ্রযাত্রার পূর্বে নৌকানির্মাণের বিশদ বর্ণনা মঙ্গলকাব্যে থাকে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থে অদ্বৈত মল্লবর্মন এরকম নৌকানির্মাণের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। মল্লবর্মন কিশোর নায়কের চোখ দিয়ে সে চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু আমরা মুকুন্দের বর্ণনায় প্রৌঢ় দৃষ্টির পরিচয় পাই। সে বর্ণনা যেমন ডিটেলের দিকে মনোযোগী তেমনি এটা যে একটা বড়োসড় ব্যাপার তাও তিনি বুঝিয়েছেন। যারা নৌকো নির্মাণ করত তারা কোন্ শ্রেণীর? নিশ্চয়ই এইরকম একটা শ্রেণী ছিল। ডিঙ্গা নির্মাণকারীরা ছদ্মবেশী বিশ্বকর্মার অনুচর। মঙ্গলকাব্যের শ্রোতাদের এটা মানতেই হবে। কিন্তু তারপর যে বর্ণনা পাই সেটা আর ছদ্মবেশ বলে মনে হয় না, প্রকৃতই তারা যেন সেই বাতিওয়ালা যারা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাতি জ্বালায় যাদের নিজের ঘরে নেই বাতি জ্বালার সামর্থ্য। শ্রীমন্তের ডিঙ্গা গড়বার জন্যে তিনজন কারিগর এসেছে—তাদের দেখে মনে হচ্ছে 'বলহীন', 'বসনবিহীন,' 'কৌপীন-পরিহিত', অঙ্গে খড়ি ওড়ে, কানে শোনে না, চোখেও দেখতে পায় না। দাঁত নড়বড়ে, 'ভোঁডরা-বাতে শির' (অঙ্গ কাঁপা বাতব্যাধি), জরাগ্রস্ত, জীবন্মৃত। খুল্লনার দুঃখ বর্ণনায় যিনি দক্ষ, খুল্লনার ছাগল চরানোর বর্ণনায় যিনি নিপুণ তাঁর কাছ থেকে এই বর্ণনা পেয়েছি। স্বর্গকে মনে রেখেছেন কবি ঠিকই কিন্তু মর্তকে তিনি ভোলেন না, ভুলতে পারেন না। জনসংযোগের এই অপরূপ শিল্পপদ্ধতি কবির অনায়াসলব্ধ। পশুগণের খেদ এইরকম আর একটি উদাহরণ, ধনপতির জেল খাটার বাস্তব বর্ণনা আমাদের মুহূর্তে টেনে নেয় কবির কাছে। মঙ্গলকাব্যে নারীগণের পতিনিন্দার প্রথাসিদ্ধ বর্ণনাকে অতিক্রম করে কৌলীন্যপ্রথার বিষময়তার দিকটিকে চকিতে প্রকাশ করে কবিদের নিপুণ বর্ণনা। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কালুডোম-লখ্যা-ডুমনীর জীবনযাত্রা তো সেকালের জনজীবনের এক উজ্জ্বল চিত্র। কালুডোম যথার্থই স্বর্গে মদ্য মাংস মিলবে না বলে স্বর্গ থেকে বিদায় চেয়েছিল। লখ্যা ডুমনীর বীরাঙ্গনামূর্তি রোমান্সের রস বিস্তৃত করেছে। কিন্তু সৎ এবং সরল লখ্যার চিত্রও শ্রোতার চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। সরলতার আকর্ষণ সর্বকালে। ফুল্লরার সরলতা, খুল্লনার সরলতা—শ্রোতার কাছে অমূল্য সম্পদ। অন্যদিকে একটু আধটু কুটনীর মজার খেলা কার না হৃদয় কেড়ে নেয়। বড়াম্বি, দুর্বলা, হীরা-মালিনী তো অক্ষয় হয়ে ছিল শ্রোতার চিত্তপটে। মুরারিশীল, ভাঁড়ুরা কবির চাবুক খেয়ে 'জীবনের মর্ম' অনুধাবন করে। নগরপত্তনে মুকুন্দ নানা জাতির বৈশিষ্ট্য যে-ভাবে এঁকেছেন সে তো পরিচিত জগতেরই ছবি। এমনি কত কি? পুরনো পাঁচালী ছিল

আখ্যান-কাব্য। গল্পরস পাঠকের কল্পনাকৌতূহলকে মিটিয়েছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণেরই ব্যাপার। সমাজের আদর্শ রূপ কি হবে শ্রোতারা তা বুঝতে, জানতে পেরেছে এই কাহিনী থেকে।

কবিরা শ্রোতার মুখাপেক্ষী। যে-কালে যে-সমাজে বাস করছেন সে-কালের সে-সমাজের প্রতি আনুগত্য তাঁদের থাকবেই। মহাকাব্যের যুগ শেষে হয়ে গেছে। অতএব মধ্যযুগে যে মহাকাব্য অনূদিত হল শ্রোতার দিকে তাকিয়েই তার অনেককিছু ছাটতে হল আর অনেককিছু জুড়ো করতে হল। এই যোগবিয়োগ না করলে তো শ্রোতারা তা গ্রহণ করতে পারবে না। কেবল তাই নয়, যে-সব কাহিনী গ্রহণ করলেন সেগুলিকেও কখনও ঈষৎ বিস্তৃত কখনও ঈষৎ সঙ্কুচিত করে নিলেন। সবই শ্রোতার দিকে তাকিয়ে। কৃত্তিবাস কতটা লিখেছিলেন জানি না। কিন্তু প্রায় তিনশ বছর ধরে (পঞ্চদশ-অষ্টাদশ) এই রামায়ণ-মহাভারত রূপ বদলাতে লাগল। যত পুঁথি এই দুই অনুবাদ কাব্যের পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে মোটা দাগের মিল নিশ্চয়ই আছে কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়ে, গ্রহণ-বর্জনে গরমিলও প্রচুর। গায়েনরা কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসের আড়ালে যথেচ্ছ সাহিত্যিক কালোয়াতি (tour de force) করেছেন। এ জন্য দুঃখ করি না। বরং এ কাব্যের জনপ্রিয়তা ভাগীরথীর প্রবাহের মতোই কীভাবে বয়ে চলেছিল তার হদিস এখানে পাই। আবার লক্ষ করলে দেখা যাবে এই রামায়ণ মহাভারতের সম্পূর্ণ পুঁথি খুব কমই পাওয়া যায়। গেলেও ভণিতায় গোলমাল আছে। কিন্তু এই দুই মহা-কাব্যের এক একটি কাণ্ড অথবা পর্বের প্রচুর পুঁথি পাওয়া যায়। যেমন 'অঙ্গদ রায়-বার' পালা। লক্ষ্মণের দিগ্বিজয় এরকম আর একটি পালা। এমনি শ্রোতার অভিরুচি অনুযায়ী কবিকে অনেক সময় চলতে হয়েছে। শ্রোতা সাতকাণ্ড অথবা অষ্টাদশ পর্বের জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে থাকতে চায় না। দ্বিতীয়ত, শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ভক্তির বন্যা যেমন কবিরা বইয়েছেন এই দুই কাব্যে তেমনি অঙ্গদ-রায়বারের পালাতে সেকালের হাস্যরসের স্থূল দিকটিকে উদঘাটিত করেছেন। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে পাঠকের রুচির পোষকতার জন্যেই কবিবৃন্দের এই প্রয়াস। গল্পের আকর্ষণের জন্যেই তো রোমান্টিক প্রণয় গাথাগুলি পেয়ে যাই আমরা। 'লোর চন্দ্রানী' অথবা 'পদ্মাবতীতে' যে দুর্ধর্ষ রোমান্সের বিবরণ আছে তা শ্রোতার পেটুক দাবি মেটাতে সক্ষম। যে-কটি রসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তার সবগুলিই সেখানে মিলবে। আর সকল রসের সেরা আদিরসের উত্তপ্ত প্রবাহ ঐ দুটি কাব্যের মণিমালিকা।

স্বভাবতই একটা সমস্যা দেখা দেয় বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে। রামায়ণ-মহাভারত অথবা মঙ্গলকাব্য ঘরের কথাকেই বড়ো করে দেখিয়েছে। যদিও লাউসেনের কাহিনীতে

মহাকাব্যের মতোই বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে লাউসেনের এ্যাডভেঞ্চারের সূত্রে গাঁথা হয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণমঙ্গল কাহিনী ছাড়া আখ্যান নেই। কবিরা যে নূতন উদ্ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন—বাৎসল্য, সখ্য—সেখানে ঘরের কথা নিশ্চয়ই বড়ো হয়েছে। তাছাড়া কবিরা চৈতন্যের আধারে পদাবলীকে স্থাপন করেছেন বলে অধ্যাত্মমুখিতা সত্ত্বেও বৈষ্ণব পদাবলী শ্রোতার কাছে অপরিচিত ঠেকে না। অন্যদিকে চৈতন্যের পূর্বে রচিত পদাবলী সাহিত্য তো লোককথারই সাহিত্য পদবীতে উত্তরণ। সেখানে অধিকাংশ পদেই রাধা নায়িকা মাত্র। বিদ্যাপতির নামে চলে এমন দু'শ পদে রাধার উল্লেখই নেই। সেগুলিও পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামগন্ধযুক্ত প্রেমের প্রসঙ্গই বিস্তৃত হয়েছে। জয়দেবে হরিস্মরণ থাকলেও পদ্মাবতীর নূপুরনিক্কণের আকর্ষণ কম ছিল না। গোবিন্দদাস তো বলেইছেন তাঁর পদ 'রসনা-রোচন' এবং শ্রবণবিলাস'। পদকর্তারা শিল্প-সচেতন ছিলেন। শ্রোতার মর্মে আঘাত করবার মতো পদের শরীর গঠনে তারা মনোযোগী হয়েছেন। কেবল সাধারণ শ্রোতাই নয়, বিদগ্ধ পরিশীলিত শ্রোতার মন জয় করাও কবিদের বাসনা ছিল। সেজন্যে কেবল শব্দালঙ্কার নয় অর্থালঙ্কারের দিকেও কবিরা মনোযোগী। ছন্দের কারুকর্ম তো ছিলই। এমন কি পাছে কোনো অসুবিধে হয়, কবিদের জন্য আলঙ্কারিকেরা মিলবিন্যাস করে রেখেছিলেন। দরকার হলেই সেই ভাণ্ডার থেকে পদকর্তারা জোড়া জোড়া মিল গ্রহণ করতেন। কবিতায় ছলনা আছে, ইশারা আছে, ভঙ্গি আছে, আছে কৌশল। বৈষ্ণব পদাবলীতে এ-সবই পাওয়া যাবে।

আবার এমন কতকগুলি মোটিফ পদাবলীতে পাই যা কিন্তু বাস্তবঘেঁষা। যেমন স্বপ্নসমাগম। এমন অনেক পদ আছে যেগুলি দৈনন্দিন জীবনের চিত্ররূপময় কবিতা। দীর্ঘকাল কৃষ্ণমিলনের প্রতীক্ষায় থেকে হতাশ রাধার উক্তি 'রসের হাটে বিকে আইলাঙ সাজিঞা পসার'; অথবা ঐ পদে এমন এমন সব পংক্তি লক্ষ না করে উপায় নেই 'তোলা বিকে সব গেল বহি গেল কাল', 'গাহক নহিলরে যৌবন ভেল ভার'। এ-সব পদ সেকালে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করেছিল নিশ্চয়ই। বংশীবদন চট্টের একটি ধারাবাহিক রচনা 'একেবারে মৌলিক, বিষয় হইতেছে যমুনাতীরে কদম্বতরু বীথিকায় অকস্মাৎ কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার আত্মবিস্মৃতি ও ভূতে পাইয়াছে বলিয়া তাহার চিকিৎসা।' এই ভূত ছাড়ানোর জন্য ওঝা বেজা (বৈদ্য) পর্যন্ত আনিয়ে কবি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। অতএব পদাবলী সমুদ্রের অন্তত 'এক কণ' সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি। রাধার চলন-বলনে সখীর দৌত্যে কৃষ্ণের সংলাপে এই সমাজরূপ দুর্লক্ষ্য নয়। কৃষ্ণের মাপিত বেশ

এবং রাধার নাপিতানী বেশ ধারণ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু সকলেই জানি এহো বাহ্য। অধ্যাত্মভাবকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তত্ত্বভাবনাকে এত সহজে লঘু করা যায় না। বৈষ্ণব গীতিকবিতা অর্থাৎ কীর্তন সাধারণের জন্য নয়। এখানে শিক্ষিতজনের অর্থাৎ দীক্ষিত ও বিদগ্ধজনের পিপাসা মেটাবার আয়োজন। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হচ্ছে সাধারণের জন্যে। সেখানে অনায়াসে দান ও নৌকা খণ্ড স্থান পেয়ে যায়। কাহিনীরসের ধারাবাহিকতাও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম নিষিদ্ধ। কামগন্ধ নাহি তায়। কিন্তু কামনার অমৃত তো নিঙড়ে দেওয়া যায় না। সেজন্যে এ প্রেমকে সমাজের বাইরে রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ইহা (বৈষ্ণব পদাবলী) একই কালে সুন্দর এবং বিরাট, অন্তরতম এবং বিশ্বগ্রাসী, লৌকিক এবং অনির্বচনীয়। যদিও স্ত্রীপুরুষের প্রকাশ্য মেলামেশা ও স্বাধীন বরণের অভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজে এই প্রেম লাঞ্ছিত হইয়া গুপ্তভাবে বিরাজ করে, তথাপি ভারতবর্ষের কবিরা নানা ছলে, নানা কৌশলে ইহাকে তাঁহাদের কাব্যের মধ্যে আবাহন করিয়া আনিয়াছেন।' (৭২০, ১৩র/র)। এর পরে আর যুক্তি তর্কের অবকাশ থাকতে পারে না। আমাদের সমাজ কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন মেনেই সেকালের সমাজ স্থিতাবস্থা বাঁচিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ তুর্কি আক্রমণে সমাজে ঝাঁকুনি লেগেছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি রাজসভায় জাঁকজমক পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রবীণ আর্যদের আশ্রয়ে তারা এলেন। কিংবা আশ্রয় দিলেন। আর্য-অনার্যের লেনদেন হল। কিন্তু কঠোরতা কিছু কমল না। কমল না যে, কৌলীন্য প্রথার চিন্তায়ই তার প্রমাণ। রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমাজকে এক রকমভাবে বাঁধতে চাইলেন। কিন্তু চৈতন্য নিয়ে এলেন ঢিলেঢালা ভাব। সকলকে আশ্রয় দিতে চাইলেন। সংকীর্তনে সকলের অধিকার। নাম সকলের জন্যে। ধর্মে একটু জাতীয়-ভাবের স্পর্শ লাগল। এই অবস্থায় জাতিভেদের কঠোরতায়ও একটু চিড় ধরেছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যে এই উদারতার প্রকাশ আছে। আর নিষিদ্ধ প্রেম অধ্যাত্মস্তরে উন্নীত হয়ে নিষিদ্ধকে সিদ্ধ করে নিল। 'আমাদের দেশে যখন বন্ধনবিহীন প্রেমের সমাজবিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ, অথচ তাহাকে শাস্ত্রে চাপা দিয়া গোর দিলেও সে যখন ভূত হইয়া মধ্যাহ্নরাত্রে রুদ্ধদ্বারের ছিদ্র মধ্য দিয়া দ্বিগুণতর বলে লোকালয়ে পর্যটন করিয়া বেড়ায়, তখন বিশেষরূপে আমাদের সমাজেই সেই কুলমানগ্রাসী কলঙ্ক-অঙ্কিত প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে গুপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য ; বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে

সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন···বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নিচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে সুরঙ্গ-মধ্যে পুতসূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশপথ নাই। তথাপি এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন? উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানব-প্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস।' বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন সমাজের আপামর সাধারণ আস্বাদন করতেন কিনা জানি না। কিন্তু কীর্তনের মধ্যে তুক এবং আখরের আমদানি হল কেন? তা কি কেবল সৌন্দর্যবিস্তারের জন্যে? না। কীর্তনীয়ার গানের সঙ্গে শ্রোতার সংযোগের জন্যেই এই পদ্ধতি বা প্রকরণের অঙ্গীকার। কীর্তন যখন ঢপ কীর্তনে রূপান্তরিত হল তখন তো তা সংযোগের দিকেই লক্ষ রেখে করা হয়েছিল। মৈমনসিংহ গীতিকায়, পূর্ববঙ্গ গীতিকায় সমাজবিগর্হিত প্রেমের রূপকে শ্রোতারা সাদরে গ্রহণ করেছিল। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম বৈষ্ণব পদাবলী এবং ভারতচন্দ্রের কাব্য উভয়েই একই সমাজমানসের বিবিধ প্রকাশ। বৈষ্ণব পদাবলীতে 'গুরু দুরুজন' এবং 'শাশুড়ি ননদিনী'র প্রসঙ্গকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ দিয়েই স্পর্শ করতে পারি। অতএব বৈকুণ্ঠের কথা আপাতত ছেড়ে দিলেও মর্তবন্ধনের কথাকে গ্রহণ করতেই হবে। সেখানেই সংযোগের সেতু রচিত। ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা সমাজের প্রতি মানব-প্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস রূপে বিবেচিত হলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয়ের দ্বারেই কেন আঘাত করেছিল বুঝতে পারি। এইভাবেই বোধ করি কবিসংগীতও বিবেচ্য।

চৈতন্য-জীবনী কাব্যগুলিতে পাঠক-শ্রোতার ভোজ্যবস্তু আছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের বই শিক্ষিত জনেরই পাঠ্য। এবং গ্রাম্যবার্তা ও গ্রাম্যকথা নিয়ে যারা সংসারে আছেন ঠিক তাদের জন্যে এই জীবনী কাব্যটি নয়। চৈতন্য-চরিতামৃতের পুথির পাঠান্তরও বিশেষ পাওয়া যায় না। পুথি মিলেছে প্রচুর, কিন্তু প্রায় প্রতিটি পুথির পাঠে অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এও প্রমাণ যে এ পুথি শিক্ষিত জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত জনের দিকে তাকিয়ে লেখা বলেই এ গ্রন্থে তত্ত্বকথা এত স্থান পেয়েছে। আপ্ত বাক্যের প্রাচুর্যও লক্ষণীয়। ভাষার বৈদগ্ধ্যও কারও দৃষ্টি এড়াবার নয়। কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল গান করার জন্যে। যদিও এই গ্রন্থের পুথি বেশি পাওয়া যায় নি, তথাপি জয়ানন্দ যে শ্রোতার চাহিদা বুঝতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই এই কাব্যে শ্রোতার তুষ্টির জন্যে পুরাণ, নানা গালগল্প জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভক্তিতে তিনিও গদগদ। সেইটি তার নিজস্ব। কিন্তু শিল্প-বোধে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রচারে নেমে আসতে হবে একেবারে জনসাধারণের

কাছে। কিঞ্চিৎ Oratoryর প্রয়োজন আছেই। এতে গ্রন্থটি শিল্পগুণে মহৎ হল কিনা সেকথা বিচার করবার স্থান এ নয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় জনসাধারণকে তুষ্ট করার তাগিদে নগদ বিদায় পাওয়া যায়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা অচল টাকায় পরিণত হয়। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যও শুধু গান করবার জন্য লেখা হয়েছিল। সেজন্যে মঙ্গলকাব্যের রূপরীতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যমঙ্গলের সূত্রখণ্ড অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত খণ্ডটি কেন? এই খণ্ডে আছে পৌরাণিক উপাখ্যান। পুরাণশাসিত সমাজে এই পুরাণকথা জনসাধারণকে স্পর্শ করবে নিশ্চয়ই। তা ছাড়া চৈতন্য অবতারের কারণ মঙ্গলাকাব্যের অনুষঙ্গে আরো বিশ্বাস্য হয়ে উঠবে, সন্দেহ কি। কবির সচেতনা সে দিকে থাকবেই। 'চৈতন্য অবতার কেন?' পালিব ভকত-জন। আর ধর্ম সংস্থাপন। 'জন্মে লভিমু পৃথিবীতে।' নারদের এই উক্তিতে দিশেহারা জনগণ স্বস্তি পেয়েছিল। আরও করুণ কিন্তু নির্মম সত্য এই 'নির্জীবে জীবন পাবে/অন্ধে পথ বিচারিবে/শুন কহে এ লোচনদাস।' চৈতন্য অবতারের দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কৃষ্ণদাস দিয়েছেন। কিন্তু আপামর জনসাধারণের কাছে চৈতন্য ছিলেন জনগণমন-অধিনায়ক। তুর্কি-আগমনের ফলে দেশে আর্য অনার্যের মিলন ঘটেছিল। এই মিলনকে ঐক্য দিয়েছিলেন চৈতন্য। সেইভাবেই সেযুগ চৈতন্যকে পেয়েছিল। ঐতিহাসিক বিবেককে সতর্ক রাখলে আমরা এইরকমই বুঝি। অর্থাৎ উভয় কবিই পাঠক-শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ চান। বিষয় কিন্তু এক। দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, অতএব কাব্যের গঠনও পাল্টে গেল। একঘেয়ে কাব্যধারার মধ্যে এ-রকম কত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আছে সে-সব ভেবে দেখবার মত।

আমরা সকলেই জানি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রায় সবটাই গেয় সাহিত্য। চর্যাগীতি থেকে কবিসঙ্গীত পর্যন্ত সব লেখাই গানে গানে বিনিময়। চর্যার অধ্যাত্মতত্ত্ব গুহ্যাৎ গুহ্যম। এ গানের শ্রোতা কত ছিল জানি না। কিন্তু জয়দেব যে গোবিন্দের গীত রচনা করেছেন তার শ্রোতা নিশ্চয়ই এর চাইতে বেশি ছিল। তাঁর মধুর কোমল-কান্ত পদাবলীর যে অর্থ আমরা এখন করি তাঁর ব্যবহৃত পদাবলী কথাটির হয়ত অন্য মানেও ছিল একটা। পদাবলী কথাটির এক অর্থ পায়ুলি (পাঁয়জোর) অর্থাৎ পদালঙ্কার। জয়দেবের সরস্বতীর 'পাদশিঞ্জিনীর নিক্কণ মধুর মৃদু ও সলজ্জ'। পদে তার প্রকাশ। এও আমরা জানি জয়দেবের গায়েন-বায়েন ছিল। আর ছিলেন নর্তকী পদ্মাবতী। সেই থেকে বাংলা রচনা যা পাচ্ছি গানেই তার প্রকাশ। আমাদের 'কানু ছাড়া গীত নাই', 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত'। গানের সঙ্গে নাচ এবং কিছুটা অভিনয়ও এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। মঙ্গলকাব্য এবং রামায়ণ-মহাভারত-

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিকে পাঁচালীও বলতে পারি। এই পাঁচালী পরিবেশন রীতি কিরকম ছিল। সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (উত্তর, ১ম খণ্ড) এর বিবরণ হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'কৃত্তিবাসের পরিচয় সংগ্রহ' রচনা থেকে দিয়েছেন, 'কেবল ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া নহে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্য, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল এবং দুর্গাপ্রসাদের দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর গায়কদল আজও অনল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাব্যের গায়কগণ ৭।৮ জনে সম্প্রদায় বাঁধিয়া গানের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। এই ৭।৮ জনের মধ্যে একজন 'মূল গায়েন' বা গায়ক উপাধিক, অবশিষ্ট সকলকে 'দোয়ার' বলে। দোয়ারেরা তান লয় সুর সংশ্লিষ্ট ধুয়া গাইতে থাকেন, মূল গায়ক মূলকাব্যের কবিতা সকল সেই সকলে যোগ করিয়া বলিয়া যান। কখন-বা মূল গায়ক কথকতার ধরনে গদ্যে প্রস্তাবের সুসংলগ্নতা করিয়া লইয়া থাকেন। দোয়ারেরা মন্দিরা বা খোল বাজাইয়া তাল দিতে থাকেন। মূল গায়কের হস্তে একটি কৃষ্ণবর্ণ চামর থাকে, তিনি সময়ে সময়ে তাহা সঞ্চালন করিয়া কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের ভাবভঙ্গী দর্শাইয়া থাকেন। এই সকল সম্প্রদায় রাঢ় অঞ্চলেই সুলভ। ইহার কারণ এই, যে-সকল কাব্য বর্ণিতরূপ কীর্তিত হইয়া থাকে, ঐ সকল কাব্যপ্রণেতৃগণ প্রায়ই রাঢ়দেশজ। সুতরাং রাঢ়াঞ্চলেই এই সকল কাব্যগায়ক, কবিদিগের কাব্যসকল রচনার পর হইতেই এ পর্যন্ত ধারাবাহিক রূপে সুলভ হইয়া আসিতেছে।' বলা বাহুল্য কেবল রাঢ় অঞ্চলেই নয়, বাংলা দেশের সর্বত্র এবং আসাম অঞ্চলেও এইভাবেই সাহিত্য শ্রোতার সামনে উপস্থিত করা হত। আসামে মূল গায়েনের নাম ছিল 'ওঝা', দোয়ারের নাম 'পালি'। সুকুমার সেন বলেছেন এই কারণে ঐ জাতীয় রচনাকে আসামে এখনও 'ওঝাপালি' বলে। অষ্টাদশ শতাব্দে দেখি এই গান কীর্তনের দিকে ঝুঁকেছিল। রামেশ্বরের 'শিব সঙ্কীর্তনে' পাই—কৃপাময়ী কৃষ্ণের কীর্তন দিল জুড়্যা/দেবগণ দোহার গণেশ গান মূল/নারদ তম্বুরা, হাতে হৈল অনুকূল/ ভাব ভরে ভবানী আপনি ধরে তাল/নৃত্য করে কৃত্তিবাস বাজাইয়া গাল।' অর্থাৎ কথা আর কথা থাকে না তার মধ্যে সুর এসে পড়ে। নাচ তো আছেই। যাই হোক পাঁচালী গান উপস্থাপনের যে বিশদ বিবরণ আমরা পেয়েছি তাতে বুঝি যে সাহিত্য উপভোগের ব্যাপারটা ছিল যৌথ। আর সম্মিলিত সঙ্গীত ও নাচ-এর মধ্যে আছে যৌথ ভাবনা। শ্রোতাকে উত্তেজিত, উৎফুল্ল, শোকার্ত করতে গানের জুড়ি নেই। এখানে ভাবনা-চিন্তা-মননের অবকাশ কম। শোনা এবং মর্মে প্রবেশ করা তাৎক্ষণিক। অর্থের যদি কোন বাধা থাকে তবে তা সুর-লয়-তান দ্বারা অপসারিত হত। আমরা লক্ষ করছি হরিশ্চন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'কথকতার ধরনে গদ্যের প্রস্তাবের সুসংলগ্নতা' করে

নেওয়াও পরিবেশকদের দায়িত্ব ছিল। কথকতার আসরে শ্রোতাসমাগম এখনও উল্লেখযোগ্য। কথক শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করেন কেবল গ্রন্থটি পাঠ করে নয়। তিনি কখনও থামেন, কখনও উত্তেজিত হন, কখনও বিহ্বল হয়ে পড়েন। যতগুলি ভাব আছে (রতি, হাস্য, ক্রোধ ইত্যাদি) সেগুলিকে অভিব্যক্ত করা সহজসাধ্য নয়। দীর্ঘ অনুশীলন ও চর্চার দ্বারা কথক বাচিক অভিনয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন। সেই কারণে তিনি শ্রোতাদের উত্তেজিত, অভিভূত করতে পারতেন। কথকতার আর একটি কৌশল লক্ষ করবার মত। কখনও কখনও কথক বর্ণনা-বিবরণ দিতে দিতে আকস্মিকভাবে কোনো একটি উত্তেজনাকর ঘটনার অবতারণা করেন। এই আকস্মিকতার দ্যোতনাকে যত স্থূলই হোক নাটকীয় বলতে পারি। এই নাটকীয়তা কথকতার অন্যতম উপাদান। শ্রোতারাও যখন খানিকটা একঘেয়ে গতানুগতিকার মৌতাতে ঝিমিয়ে পড়ছিল তখন কথক একটা ঝাকুনি দিয়ে সেই সুপ্তিকে ভাঙিয়ে দেন। এখানে যোগাযোগের মাধ্যমটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে আমরা বাদ্যযন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে পারি। গায়েনের গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের এই সহযোগিতা গানকে যে সমৃদ্ধ করে তোলে তা বলাই বাহুল্য। এই বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি শ্রোতার চিত্তকে আলোড়িত করে নিশ্চয়ই। শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে বাদ্যযন্ত্র আসরের পরিবেশটিকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে। সে যুগের বাদ্যযন্ত্রের বিস্তারিত তালিকা এখানে সংগ্রহ করে লাভ নেই। জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণ(ন) রত্নাকর' গ্রন্থে সে তালিকা পাওয়া যাবে। কেবল এই কথাটা বলা বোধ হয় প্রয়োজন —আমাদের মনের একটা অংশ এখনও শিশুর মতই ধ্বনিপ্রিয়। যে মন 'ছন্দ চাহে ধ্বনি চাহে'। বাদ্যযন্ত্র সে-চাওয়াকে পূরণ করে দেয়। গায়েনের পায়ে থাকে নূপুর। হাতে থাকে চামর। এই চামর ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে তিনি যখন গান করেন তা কি কেবল দেবতার তুষ্টিবিধান? আমরা কি বলব না ঐ চামরটি শ্রোতাদের কাছে একটি বিশেষ অর্থ বহন করে? শ্রোতাদের কাছে ঐ চামরটি হয়ে ওঠে তখন যাদুকরের হাতের যাদুদণ্ডের মতো। মন্ত্রপূত ঐ চামরের মহিমা তখন গায়কের মর্যাদাকেও বাড়িয়ে দেয়। তার বিশিষ্ট স্থানটি নিরূপিত হয়ে যায় ঐ চামরের অধিকারে।

পাঁচালী কাব্যে আমরা জানি লাচাড়ি, শিকলী ও পয়ার থাকে। এখানে পয়ার বলতে আমরা এখন যা বুঝি সেই পয়ারের কথা বলছি-না। ছন্দের একটি বিশিষ্ট রূপ নিশ্চয়ই পয়ার। আমরা বলছি সেকালে পয়ার ছিল প্রবাহ। বর্ণনা-বিবরণ দেবার ভাষা। সেগুলি যে সব সময় গান করা হত এমন মনে করবার কারণ নেই। দীর্ঘ বর্ণনাকে প্রয়োজনবোধে গায়েন কাটছাট করেও নিতেন। জাগরণ

পালার সারারাত্রির অনুষ্ঠানটি গানের দ্বারা করা সম্ভব কিনা জানি না। মনে হয় বেশ কিছুটা অংশ পড়ার মতো হত। যেখানে ভাবনা সমতলভূমি অতিক্রম করে যেত সেখানে প্রয়োজন হত লাচাড়ির। এই লাচাড়ি ত্রিপদী অংশগুলি। লাচাড়িতে নাচ থাকত। সব ত্রিপদীতে লাচাড়ির সঙ্গে নাচ জুড়ে দেওয়ার রীতি থাকতে পারে না। পাঠ্যকাব্যে (চৈতন্যচরিতামৃত) লাচাড়ির অংশে আবেগের সঞ্চার করা হত বলাই বাহুল্য। সেখানে নাচের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু পাঁচালী কাব্যে আছে। আধুনিক কবিতা থেকে 'গীত'-অংশ বর্জিত। ঠিক কথা। কিন্তু মরিয়া না মরে রাম। সাম্প্রতিক কবিতা পাঠ এবং আবৃত্তির আসর যেভাবে জমে উঠেছে তাতে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কবিতায় শুধু 'গীত' অংশই নয় 'নাট্য'-অংশও আছে এবং তা দৃশ্য কাব্যের মতই মঞ্চে উপস্থাপন-যোগ্য। কবিতাকে প্রিয় করবার জন্যই কি এই ব্যবস্থা? কবিতা যখন বিচ্ছিন্নতার দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছিল তখন সংযোগের এই উপায়ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কবিতা প্রিয় হবার পথ কোথায়? এই ব্যাপারই মধ্যযুগের শ্রোতা ও স্রষ্টার মনে ক্রিয়া করছিল। সেজন্য উদ্ভাবনও হতে লাগল নানা দিক থেকে। ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিনীকে সব পাঁচালী কাব্যেই জাঁকালোভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। দেশীয় পদ্ধতি তো ছিলই, তাছাড়া জনসংযোগের জন্যে পুতুল নাচের ব্যবস্থাও ছিল। এই পুতুল প্রত্যক্ষভাবে আসরে দেখানো হত। তাছাড়া ছিল পট। আমি মেদিনীপুরের গাইয়েদের দুইহাতে লখিন্দর ও বেহুলা'র পুতুল নিয়ে মনসা-লখিন্দর পালা দেখেছি, শুনেছি। পুতুলগুলি ঘাঘরা পরা। ঘাঘরার ভেতর থাকত গাইয়ের দুহাত। তিনি দুহাতের অঙুল দিয়ে পুতুলগুলির বিভিন্নভাবের অভিনয় দেখাতেন। মধ্যযুগেও এই ব্যাপার ছিল। মুকুন্দের একটি পুঁথিতে পাই, 'রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ চিত্রের পাঁচালী মনোহর।' 'চিত্রের পাঁচালী —পট দেখাবার কথাই উদ্দিষ্ট। কবিকঙ্কণের সোনামুখী পুঁথিতে পাই চালন বা চালান, চৌপদি ছন্দ, 'পআর ছন্দে গিত', ধাবাড়ি, ছুটা নান, চৌপাদ তিন জনে, ঝাঁকা মান, ছুটা জাত, বারারি রাগ পআর ছন্দ, পআর ছন্দ ভূপালি রাগ, চৌপাদ ছন্দ কাট্যালি রাগ, বারমাসি ছন্দ, মঙ্গল রাগ ষট্‌পদি ছন্দ, আলিসা কামোদ রাগ। এসব উদাহরণে ছন্দ কবিতার ছন্দ নয়—গাইবার বা নাচের কিংবা বাজনার অথবা নাচ ও বাজনার ঢং বলে মনে হয়। তালমান কথাটিকে কেউ কেউ মনে করেন ইংরেজি Beat and Bar। চৈতন্যজীবনীর কথা আগে বলেছি। লক্ষ করুন কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া মোটামুটি সকলেই 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন (বৃন্দাবনদাসও এর ব্যতিক্রম নয়)। জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে মঙ্গল ব্যাপারটা কতখানি মূল্য পেত এই ঘটনায় তা

বুঝতে পারি। আর সোনামুখী পুঁথির সাক্ষ্যে বলতে পারি পরিবেশন-পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য এসেছিল। এগুলি কতটা স্টাইলাইজড, কতটা সরলীকরণ তা বলা অবশ্য সম্ভব নয়।

মধ্যযুগের সাহিত্যে পদাবলীর ব্যাপকতা লক্ষণীয়। অবশ্যই এ পদাবলী গেয়। তবে মঙ্গলকাব্যের মতো নয়। কে কবে এ গান সৃষ্টি করেছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কালক্রমে এ পদাবলী কীর্তন আখ্যা পেল। যতদূর জানি বিদ্যাপতি ইত্যাদি কবির সময়ে রাজসভায় এ পদাবলী গান করা হত। লোচনের রাগতরঙ্গিনীতে এ গানের গেয়রীতির কিছু হদিস মেলে। মিথিলার রাজসভায় এক গায়ক উদয়। তাঁর পুত্র জয়ত। জয়তের পুত্র কৃষ্ণ। কারও কারও মতে এই কৃষ্ণ বাংলাদেশে এসে মিথিলার ঐ গানকে প্রিয় করেন। পদাবলীর ভাষায় যে নূতন রঙ ধরেছিল, যা ব্রজবুলি নামে অভিহিত তাতে মিথিলার কবির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'দেখিল বঅন সবজন মিট্‌ঠা'—দেশি বচন সকলের কাছে মিষ্ট লাগে। রাজসভার কবির দেশি ভাষার প্রতি এই শ্রদ্ধানিবেদন আমাদের জনসংযোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রজবুলি অবশ্য ঠিক 'দেসিল বঅন' নয়। কিন্তু এ ভাষা অচিরে যখন অসম, বাংলা, ওড়িয়া এবং মৈথিল ভাষাভাষীর মধ্যে গৃহীত হল তখন বুঝতে পারি প্রাদেশিক সংস্কৃতির ভাববিনিময় এই ব্রজবুলির গানের মাধ্যমে কিছুটা ঘটত। একে তো এই সব ভাষা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সূত্রে যুক্ত তারপর ব্রজবুলির মাধুর্য এবং চাতুর্য সব মানুষকেই যে তৃপ্তি দিত এতে সন্দেহ নেই। গোবিন্দদাস তার গানকে 'রসনা-রোচন শ্রবণবিলাস' বলেছেন। এতেও বোঝা যায় এক শ্রেণীর শ্রোতা এ গানের রসিক ছিলেন। গৌরচন্দ্রিকার অবতারণার কারণ আমরা জানি। বৈষ্ণবপদাবলীর অন্তঃশীলা আদিরসকে শোষণ করে নেবার প্রয়োজনে এর অবতারণা। কেন এ প্রয়োজন দেখা দিল? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই বৈষ্ণবপদাবলীর বিষয়ভাবনায় সঙ্কটের দিকটি মহান্তগুরুরা যে মনে রেখেছিলেন তা বোঝা যাবে। কেবল জনসংযোগই নয়, সুরের মধ্য দিয়েই কথা চরণ পেয়েছে তাঁর যিনি আছেন সুরের ওপারে। খেতরির মহোৎসবের তাৎপর্যও এইখানে। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীকে বৈঠকী কীর্তনে রূপান্তরিত করবার আকাঙ্ক্ষাও এই সঙ্গে দেখা দিল। স্বরূপ চৈতন্যকে কীর্তন শোনাতেন। চৈতন্য নিজেও কীর্তন করতেন। তা ছিল সঙ্কীর্তন। সকলকে নিয়ে সে সঙ্কীর্তন। কিন্তু কীর্তন হল অন্তরঙ্গ জনের কাছে দেবতার লীলাপ্রকাশ। দেবীদাসের মাদলের বোলে গোবিন্দদাস তার কথা বুনে দিয়েছেন। এমনভাবে বুনেছেন যাতে উপলব্ধ হয় কথা ও সুর পরস্পরস্পর্ধিতরমণীয়। বলা বাহুল্য এই কীর্তনের রস সকলে গ্রহণ করতে

পারত না। বৃন্দাবনী সঙ্গীতরীতিও এই কীর্তনে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু চেষ্টা যে একেবারে হয়নি তাও বলা যায় না। আমরা জানি কীর্তনে থাকে আখর, তুক ও ছুট। আখর তো আসলে কীর্তনের ব্যাখ্যা। পদাবলী ছোটো মাপের গাঢ়বদ্ধ কবিতা। সাধারণে এর রস উপভোগ করবে কি করে। কীর্তনীয়ারা কিছু জুড়ে দিয়ে পদাবলীর পংক্তির ব্যাখ্যা করলেন। তাকেই বলি আখর। যেমন 'অতি শীতল মলয়ানিল মন্দমধুরবহনা' ছত্রটিতে আখর যোগ হল 'অতি শীতল মলয়ানিল মন্দমধুর বহনা—। সে যে মন্দ মধুর বইছে।' অষ্টাদশ শতাব্দে এল তুক। একটি সম্পূর্ণ পদ—এক বা একাধিক তুক বস্তুকে বা ভাবকে পরিবর্তিত করে। ফলাহারী কৃষ্ণচন্দ্রকে ফল দিয়েছেন। কৃষ্ণ চলে গেলে ফলাহারী দেখলেন 'ডালা হৈল রতনে পূরিত। / ফলাহারী সবিস্ময় চিত ॥' ইত্যাদি। একটু দ্বিধা নিয়েই বলছি ফলাহারীর ডালা রত্নে পূর্ণ হয়ে গেল—এই সংবাদটি শ্রোতার কাছে অধিক তৃপ্তিপ্রদ। অর্থাৎ জনসংযোগের দিক থেকে তুকের মূল্য বেড়ে গেল—এই ব্যাপারটা তুক-কর্তা কীর্তনীয়া ভালোভাবেই জানতেন। ছুট, তুক ও আখর অথবা আখরের সমষ্টি বস্তু ও ভাবের পরিবর্ধক।

একটি পদে আছে 'ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া/নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া ॥' এরপর শ্রীদাম এবং সুবলের এই ব্যাপার নিয়ে নানা খেদ এবং আক্ষেপ কীর্তনীয়ার গানে পরিবেশিত। 'আর কান্ধে চড়া হবে না রে।/কান্ধে করা বই ॥' অধ্যাত্মনীতিতে লৌকিক জারকরস না দিলে সংযোগের প্রশস্ত পথটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। কীর্তনীয়াদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল এই সংযোগস্থাপন। আমরা সাহিত্যের যে মাপকাঠি বৈষ্ণবপদের বিশ্লেষণে ব্যবহার করি এখানে তা ব্যবহার করলে অবশ্যই বলব এই আখর, তুক অথবা ছুট প্রায়ই পদের সৌন্দর্যগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু জনসংযোগের দিকে মনোযোগ রাখলে বলতেই হবে কীর্তনীয়ার এ ছাড়া গতি নাই। পদাবলী কীর্তনের মধ্যে দিলীপকুমার রায় দেখতে পেয়েছিলেন প্রসারতা। অর্থাৎ বাংলা গানের সুরের লীলা ছোটো মাপের। কিন্তু পদাবলী কীর্তনে সুরকে আরও একটু খেলবার প্রশস্ত জায়গা করে দেওয়া হল। এর ফলে, রায় মনে করেন—কীর্তনে এল নাটকীয়তা। জানি না এই নাটকীয়তার ফলে কীর্তনের আবেদন 'অতিরিক্ত' কিছু মানুষের মন ছুঁতে পারল কিনা। যাই হোক কীর্তন যে ধীরে ধীরে লোকমুখী হয়ে উঠল তার প্রমাণ ঢপ কীর্তনের মধ্য দিয়েই গৌরাঙ্গলীলার ও কৃষ্ণলীলার রস নিম্নস্তরের জনগণের মনেও সঞ্চারিত হয়েছে। সেই সঙ্গে কীর্তনের আশ্রয় (অর্থাৎ পদাবলী) এক ঢঙ (অর্থাৎ সুর) লোকসাধারণের পরিচিত রূপ ও রঙ নেবার চেষ্টা করেছে।' (সুকুমার সেন, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, পৃ ৫৭-৫৮)। হরেকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায় কীর্তনে কথার গুরুত্বও লক্ষ করেছেন। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাবার সময় কীর্তনীয়া 'কথা' বলে শ্রোতার গোচর করতেন বিষয়টি। এ না-হলে শ্রোতা-সংযোগ হওয়ায় পথে বাধা জন্মাত নিশ্চয়ই। এখানে আর একটি কথা বলি। কীর্তনের এক রূপ সঙ্কীর্তন। এ সঙ্কীর্তনের প্রবর্তক চৈতন্য। এই সঙ্কীর্তনের আবেদন ছিল ব্যাপক। এই ব্যাপার যে মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও গড়িয়েছিল তার অব্যর্থ প্রমাণ শিবায়নের (সব নয়) নাম শিবসঙ্কীর্তনেও পাই। হতে পারে এখানে সঙ্কীর্তন অর্থে প্রশস্তি। তথাপি মঙ্গল-কাব্যের 'ফর্মে' সঙ্কীর্তনের যোগসূত্র ঘটছে এইটি লক্ষণীয়। রাধাকৃষ্ণ পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দে এসে কবিওয়ালদের সঙ্গীতে যে রূপ নিয়েছিল তা সকলের জানা। কবি-সঙ্গীতের বিকৃতি নিয়ে আলোচনা করব না। রবীন্দ্রনাথ থেকে ডঃ সুশীলকুমার দে —সকলেই আলোচনা করেছেন। এই গানের শ্রোতারা ছিলেন নিরক্ষর এবং রুচির দিক থেকে খেউড়ের পক্ষপাতী। অতএব কবিগানেও তার জোগান হল। জনসংযোগের দায় কবিগানকে নিতে হল। জনসংযোগের দিকে মনোযোগ আত্যন্তিক হলে সাহিত্যের দুর্গতি কি পর্যন্ত হতে পারে কবিসঙ্গীত তার উদাহরণ। সাহিত্যের বিপদও এইখানে। এখানে তত্ত্বচিন্তার অবতারণা করতে চাই না। কিন্তু সাবধান না হলে সঙ্কটের সম্ভাবনা। অথচ এই সময়ে রামপ্রসাদ লোকচিত্তে স্থায়ী আসন পেলেন। রামপ্রসাদ বলেছিলেন 'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত'। তিনি গীত রচনায় যে ছন্দটি গ্রহণ করলেন তা হচ্ছে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ (শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ)। গানে ছিলো সামাজিক উপমা। সুর হল লৌকিক। ফলে শাক্তসঙ্গীত সম্প্রদায়কে ডিঙিয়ে গেল। বৈষ্ণব গানেরও সেই অংশ সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে গেল যে অংশে লৌকিকের আধিপত্য।

মধ্যযুগের কবিরা বাংলাভাষার চর্চা করতে একটু দ্বিধান্বিত ছিলেন। সংস্কৃতের সমান্তরালে প্রাকৃত ভাষার অনুশীলনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও বাংলায় লিখতে কবিবৃন্দ ইতস্তত করেছেন। দু-একটি উদাহরণ দিই। বাংলা ভাষাকে মধ্যযুগে উল্লেখ করা হত 'দেশী,' 'লৌকিক', 'প্রাকৃত (পেরাকৃত) ভাষা' অথবা শুধু 'ভাষা' বলে। যেমন শ্রীকর নন্দীর লেখায় পাই 'দেশিভাষে এহি কথা করিয়া প্রচার/সঞ্চরউ কীর্তি মোর জগৎ ভিতর'। মাধবআচার্য লিখেছেন 'ভাগবত সংস্কৃতে না বুঝে সর্বজনে/লোক-ভাষা রূপে কহি সেই পরমাণে।' রামচন্দ্র যখন বলেছেন 'সপ্তদশ পর্ব-কথা সংস্কৃত বন্ধ/মূর্খ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত ছন্দ।' কবিশেখর বাংলা ভাষা যে শ্রদ্ধেয় নয় সেই কথা উচ্চারণ করেছেন 'কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি/হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাষা বলি।' দৌলৎ কাজী লিখেছেন 'দেশি ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দ/সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ।' অথবা ভারতচন্দ্রের কথায় 'না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল/অতএব

কহি ভাষা যাবনী মিশাল।' এ থেকে বোঝা যাবে বাংলাভাষার চাহিদা জনসাধারণের মধ্যে ছিল এবং শিক্ষিতজনও সংস্কৃত ছেড়ে বাংলাভাষার চর্চায় আগ্রহ বোধ করতেন কতকটা বাধ্য হয়ে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণের সেতু হল বাংলাভাষা। দুটি সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা জন্ম নিল। বলা বাহুল্য, এ ভাষাকে গড়ে তুলতে সংস্কৃতের উপাদানই ছিল প্রধান। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত জনের মনোভাব খুব উঁচুদরের ছিল না—উক্তিগুলি থেকেই তা বোঝা যায়। মূর্খজনকে বোঝাতে অথবা সাধারণকে বোঝাতে বাংলাভাষার প্রয়োজন হয়েছিল—এ-রকমই বুঝি উক্তিগুলি থেকে। আবার এও স্পষ্ট বোঝা যায়, মধ্যযুগের কবি-সাহিত্যিকরা বুঝেছিলেন, কলিকালে বাংলাভাষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কবিরা বাংলার ঘরোয়া পরিবেশ, ঘরোয়া কথা, প্রবচন বাংলা ভাষায় ফুটিয়ে তুললেন। রামায়ণ-মহাভারত-কৃষ্ণমঙ্গল, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণবসাহিত্য (পদাবলী সমেত) বাংলাভাষাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করল। চর্যাগীতি থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলাভাষার গঠনরীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বাংলাভাষার সব উপাদানই সে সময়ের সাহিত্যে লভ্য। কৃষিজীবী মানুষের চিন্তায়, কর্মে প্রকাশের যে বেদনা জেগেছিল তা বাংলাভাষায় রূপ পেল। উচ্চকোটির কিছু মানুষ তখনও সংস্কৃত চর্চা ছাড়েননি। কিন্তু বাংলাভাষার কবিরা দেবতা এবং দেবীর দোহাই দিয়ে মাতৃভাষাতেই সাহিত্যচর্চা করেছেন। এমন কি অঙ্কের বইও লিখেছেন। শুভঙ্করী আর্যা তার সাক্ষ্য বহন করছে। জটিল চিন্তা এল উনবিংশ শতাব্দে। সে-কথা এখানে নয়। এই সরল শ্রোতার জন্যে রচিত হল আমাদের সাহিত্য। যার ভাষা বাংলা। কিন্তু এই বাংলাভাষা সঙ্কটের মুখোমুখি হয় নি এমন নয়। মুসলমান শাসনে আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বাড়ছিল। সমস্যা দেখা দিয়েছিল এই শব্দ আমরা কতটা নেব। মুসলমান কবিরা আরবি-ফারসি শব্দের প্রতি পক্ষপাত দেখান নি এমন নয়। মুসলমান সমাজের ঘরোয়া জীবনে আরবি-ফারসির প্রভাব তো ছিলই। পশ্চিমা মুসলমানদের দরবারী কায়দার প্রতি একটু লোভও ছিল বাঙালী মুসলমানদের। অতএব যাবনীমিশাল শব্দের দিকেও লোভ যাবে। 'সিলেটি নাগরী' লিপির প্রবর্তন এই মনোভাবের চূড়ান্ত পরিণতি। কিন্তু বাংলাভাষা আরবি-ফারসি শব্দ গ্রহণ করেও স্বধর্ম থেকে চ্যুত হয় নি। সংস্কৃত অনুসরণও আত্যন্তিক হয় নি। ভারতচন্দ্র এই ভাষাকে নবসাজে সাজালেন। বস্তুত বাংলাভাষার গতানুগতিকতায় ভারতচন্দ্র বড়ো রকমের ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের মননিষ্ঠ মন ভাষাকে দরবারী মেজাজে চালাতে চাইলেন। এই ভাষা কিন্তু সাধারণের বোধ্য ভাষা থেকে

দূরে সরে গেল না। বরং সাধারণের ভাষাতে ভারতচন্দ্র একটু মিনে-করার কাজ করলেন। সেজন্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা আমাদের মুখে মুখে। উনিশ শতকের প্রায় সবটা ভারতচন্দ্রের অধিকারে। শ্রোতা তখন ভক্তি ছেড়ে বুদ্ধিকে স্বীকার করছে। ভারতচন্দ্র তাদের চাহিদা মেটালেন। তাতে ভাষায় 'সাহিত্যে'র রঙ ধরল। আর উনিশ শতক এই 'সাহিত্য'-বুদ্ধির কাছেই মাথা নত করেছে। ব্রজবুলিও সেই শ্রেণীর ভাষা যাতে ধ্বনি এক ধরনের মোহ জন্মায়। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই এই ধ্বনির প্রতি আসক্ত ছিল। বক্তব্যের এই শিল্পিত রূপ শ্রোতার কতটা অংশকে টানতে পেরেছিল, সে সম্বন্ধে অবশ্য সংশয় আছে।

আর একটি গুরুতর প্রসঙ্গের অবতারণা করি। যদিও বৃন্দাবনদাস মদ্যমাংস দিয়ে পূজা করারপ্রতি কঠোর হয়েছেন, তথাপি সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই কঠোর জল-অচল ভেদ ছিল না। জাতিভেদ ছিল ঠিকই, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা তখন ঘৃণায় পর্যবসিত হয়নি। শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব সম্প্রদায় মিলে মিশেই ছিল। সুতরাং বৈষ্ণবের শক্তি-দেবতার লীলা-গান শুনতে আপত্তি হবার কথা নয়। আবার শাক্তেরও বৈষ্ণবগান শুনতে বাধা নেই। বস্তুত মঙ্গলকাব্যে চৈতন্যবন্দনা আছে, আর আছে বিষ্ণুপদ। ভক্তির টানটাই ছিল বড়। সে ভক্তির আধার যিনিই হোন না কেন। অন্যদিকে বৈষ্ণবগানে সূফীর সাধনার ইঙ্গিত দুর্লক্ষ্য নয়। বৈষ্ণবভাবনায়ও সূফী-সাধনার প্রভাব আছে। ভাবতে আর অবাক লাগে না, মুসলমানরাও বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন। নাথধর্মের গুরুদের কীর্তিকাহিনী নাথগীতিকায় আছে। গুরুর অলৌকিক মাহাত্ম্যশ্রবণে আবেগপ্রবণ বাঙ্গালীর আগ্রহ জাগবে তাতে আর আশ্চর্য কি? অন্যদিকে এই গীতিকায় তত্ত্বকথাও কিছু পরিবেশিত হয়েছে। এই তত্ত্বকথার প্রতি কিছু দীক্ষিত মানুষের কৌতূহল নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু গোর্খবিজয়ে দেবীর কৌতূহল এবং গোর্খনাথকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে বিসদৃশ আচরণ অথবা মীননাথের কদলীর দেশে সংসারবিলাস এবং নারীমোহ—এ সবই ধর্মকথার উদাহরণ। একেক সময় মনে হয়, যে-নীতি নাথপন্থের পথিকরা প্রচার করতে চেয়েছিলেন, কবিরা সে নীতিকে গল্পের মোড়কে উপহার দিতে চেয়েছেন। অদুনাপদুনা এবং রাজা গোপীচন্দ্রের কাহিনীও এই রকম দৃষ্টান্ত। ধর্মমঙ্গলে সুরিক্ষাএবং গোপীচন্দ্রের গানের বারবনিতা রূপকথার কথাবস্তুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে ঐ দুই গ্রন্থে আমরা কল্পনার (যাদুবিদ্যার?) যে উদ্দাম প্রকাশ লক্ষ করি শ্রোতারা গভীর আনুগত্য নিয়ে তা শুনেছে। কেননা যাদুবিদ্যা তখন সমাজমানসে বিস্ময় জাগাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। খ্রীষ্টের অলৌকিকতাও বর্ণিত হয়েছিল এরকম গল্পের অবতারণা করে। আমাদের কাব্যকাহিনীও সেরকম

দৃষ্টান্ত—তা যতই স্থূল হোক না কেন। কবিরা অনায়াসে জনসাধারণের আনুগত্যের উপর ভর করে নদী পারাপার করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পরিবেশনের অপর মাধ্যম ছিল নাটগীতি। এ কর্ম লোকগান থেকে আসা সম্ভব। জয়দেবে এই কর্ম পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই কর্মের চূড়ান্ত রূপ। চৈতন্য নিজেও নাটক করতে উৎসাহিত ছিলেন। মিথিলা, নেপাল অঞ্চলে এই নাটগীতি পাই। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি। শুধু বলব এই নাটগীতিতে ধীরে ধীরে সংলাপের স্পষ্ট রূপ দেখা দিচ্ছিল। এবং গদ্যসংলাপও নাটগীতিতে পাওয়া যাচ্ছিল। আমাদের যাত্রার উৎস হয়ত এই নাটগীতি। রসিকের কাছে নিবেদন করবার মাধ্যম হিসাবে নাটগীতি যে সব দিক থেকে উপযোগী তা বলাই বাহুল্য।

মধ্যযুগের সাহিত্যে জনসংযোগের উপাদান নিয়ে বিশ্লেষণ করবার সময় কোনো লেখার সাহিত্য মূল্য নির্ধারণ করা আমার অভিপ্রায় নয়। আমি কেবল এইটিই দেখাতে চেয়েছি দেশের বৃহত্তম অংশকে তাঁদের রচনায় অংশীদার করতে কবিবৃন্দ বিষয়-ভাষা এবং বিষয়ের উপস্থাপন কিভাবে করেছেন এবং বিষয় নির্বাচনেও তাদের লক্ষ্য কি ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবির ব্যক্তিত্ব নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু কবিদের লক্ষ্যই ছিল শ্রোতাদের আকর্ষণ করা। শ্রোতারা ভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু ভক্ত কেবল অধ্যাত্মভাবনাতেই তুষ্ট নয়, সে তার সুখদুঃখ পরিপূর্ণ জীবনের ছবিও কবির রচনায় পেয়েছে। সাহিত্য তখনও ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায় নি। এ সাহিত্যের যে কোনো আলোচনা তাই এ যুগের সমাজমানসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত। সে বিচারের কিঞ্চিৎ এখানে উপস্থাপিত হল।

সমাযোজন ও সমাজতত্ত্ব

অমিতানন্দ রায়

সমাযোজন বা সংযোগ স্থাপনের তত্ত্বের অবস্থিতি সমাজ-গ্রন্থির মূলে। একাধিক ব্যক্তিকে নিয়েই যখন সমাজ-রূপ তখন সামাজিক সম্পর্কের কথা বলতে গেলেই সমাযোজনের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অতীতে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার স্পর্শক হিসেবে সমাযোজনের বা গণ-সংযোগের আলোচনা দেখা যেত। বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর শুরু হতেই বহু দার্শনিক সমাজ ও সংস্কৃতির একটি মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলে সমাযোজন-তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছেন। সমাযোজনের কারণে আজ যখন দূর নিকট হচ্ছে আর নিকট দূর হয়ে যাচ্ছে তখন সংস্কৃতি-চিন্তায় সমাযোজন-তত্ত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উন্নয়নশীল আমাদের এই দেশে ও সমাজে যখন বহুদূর সভ্যতার উপস্থিতি ও তাদের বিভিন্ন ধারার সমাহার আমরা দেখতে পাই. তখন সমাযোজন তত্ত্বকে আশ্রয় করেই আমাদের এই সমাজ পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বা ইতিহাসের এ ধরনের বিভিন্ন পর্যায়কে বিশ্লেষণ করতে যদি সমাযোজন তত্ত্বকে আশ্রয় করা হয় তা নিশ্চয়ই সমকালীন সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের একটি সূচক হয়ে থাকবে। সমাজ-সংস্কৃতি আলোচনার প্রেক্ষাপটকে সুস্পষ্ট করবার জন্য বর্তমান প্রবন্ধে সমজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে সমাযোজন তত্ত্বের আলোচনা করা হল। আলোচনার বিষয়: ১. সমাযোজন কি ও কেন ? ২. সমাযোজন তত্ত্ব চিন্তার ইতিহাস। ৩. সমাযোজন মাধ্যমের আলোচনা। ৪. সমাযোজন: বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতির আলোচনা। ৫. মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ হতে সমাযোজন তত্ত্বের আলোচনা। ৬. সিদ্ধান্ত।

১

ব্যপক অর্থে দুটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ সাধনকে সমাযোজন বলা চলে। সীমিত অর্থে প্রেরক ও প্রেরিতের মধ্যে কোন কিছুর লেনদেনকে বলে সমাযোজন। মানব-সমাজ, পশু-সমাজ ও যন্ত্র-ব্যবস্থা—এগুলিতে এরকম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জটিল ভাষার মাধ্যমে অর্থবহ চিহ্ন দ্বারা মানুষের সমাজও সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একটি বিশেষ অর্থে কিছু প্রেরণ করা ও তা থেকে কিছু বিশেষ অর্থ গ্রহণ করা মানুষের বিশেষ স্নায়বিক ক্ষমতা। সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিতে আছে এই গুণটি, এই কারণেই বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা রূপ লাভ করে। ম্যাক্স ওয়েবার (Weber) এর মতে মানবিক সমাযোজনকে বলা যায়

সামাজিক লেনদেনের সেই দিক বা একটি বিশেষ সামাজিক ঘটনার অপ্রত্যক্ষ আরোপিত অর্থমাত্র। অর্থের একটি সচেতন বহমানতা আছে, আর একজনই এটির গ্রাহক ও প্রেরকের আচরণকে প্রভাবিত করে। পারস্পরিক আচরণে প্রভাব বিস্তার করা, একজনের আচরণের প্রেক্ষিতে অন্যের আচরণ আন্দাজ করা বা এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বা সামাজিক রীতি-নীতির চলমানতা প্রভৃতিতেই সমাযোজনের অর্থ পরিস্ফুট।

ভাববাদী দর্শনে একজনের সত্তা অন্যজনে প্রতিফলিত হলেই তাকে সমাযোজন বলা চলে। কার্ল যাস্‌পারের (Jasper) অস্তিত্ববাদ সমাযোজন কে এই ভাবেই দেখা হয়। অবশ্যই সমাযোজনের এই ব্যাখ্যায় ব্যক্তিকেই চরম লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়। মার্কসবাদী সমাযোজনের ব্যাখ্যায় কিন্তু সমষ্টিকে লক্ষ্য ধরে সমাযোজন তত্ত্বের আর এক ব্যাখ্যা করা হয়। লেনিনের প্রচার (propaganda) ও আন্দোলনের (agitation) তত্ত্বকে অবলম্বন করে মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব গোষ্ঠী-সংহতির দিকে যে আলোকপাত করেছে সংস্কৃতি-বিজ্ঞানে তা একটি বিশিষ্ট দিকচিহ্ন। আধুনিক সমাজ বহু-গোষ্ঠী, বহু-জাতি বিশিষ্ট—এই বস্তুগত সত্যকে অবলম্বন করে সমাজ সংগঠন ও তার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমজতত্ত্ববিদেরা সমাযোজন তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সমাযোজন তত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার প্রথম পথিকৃৎ সি. এইচ. কুলে (C. H. Cooley) মনে করেন মানব সমাজের অগণন শক্তির লেনদেনের (breaks in transpo rtation) ফলেই গড়ে ওঠে কমিউনিটি বা সামাজিক সংগঠনের অন্য কোন সংক্ষিপ্ত রূপ। গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে মহানগরী বা ব্যবসাকেন্দ্র ছাড়াও অনেক মহানগরীর একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে 'সংস্কৃতি-কেন্দ্র' (culture centre) বলে। এই মহানগরীগুলি বিশেষ অর্থে একটি মানবিক সমাযোজন কেন্দ্র। আসলে স্থান ও কালকে অতিক্রম করে এক থেকে অন্যে, বহু থেকে অন্য বহুতে সঞ্চারিত মানবিক শক্তিকেই আমরা বলি সমাযোজন।

সমকালীন সমযোজন তত্ত্বের উপর সংযোগ-নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞান (cybernatics)-এর বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সমাযোজনের ব্যাখ্যায় তন্ত্র-তত্ত্বের (Systems Theory) সঙ্গে সংযোগ-নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব এবং মিথস্ক্রিয়াতত্ত্বের (Interacting Theory) সঙ্গে মিশ্রিত জ্ঞাপন তত্ত্বের (Information Theory) বিশেষ উপস্থিতি দেখা যায়। সমাযোজন তত্ত্বের এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপাদান ই. এম. রজার্স (E.M. Rogers) তার ব্যাপক গবেষণায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি সমাযোজন গবেষণায় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। জ্ঞাপন-

তত্ত্বের গবেষণার ভিত্তিতে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিমাণগত পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে সমাযোজন গবেষণায়। এই দিক থেকে সমাযোজন-গবেষণায় সি. ডব্লু. মরিস (C.W. Morris) সমাযোজনের তিনটি দিক তুলে ধরেছেন : ক. বাক্য-বিন্যাস সম্বন্ধীয় (Syntactic) অর্থাৎ বিভিন্ন সংকেতের মধ্যের সম্পর্ক। খ. অর্থ সম্বন্ধীয় (Semantics) অর্থাৎ বিভিন্ন সংকেত ও যা সংকেতে প্রকাশিত হচ্ছে তাদের মাঝের সম্পর্ক। গ. প্রয়োগ সম্বন্ধীয় (Pragmatic) অর্থাৎ বিভিন্ন সংকেত ও যে সমস্ত ব্যক্তি এগুলির প্রয়োগ করেন তাদের সম্পর্ক। সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাযোজনের কার্যাবলী, গঠন ও ফলাফল ছাড়াও প্রেরিত সংকেতের বিষয়-বিশ্লেষণ বহুভাবে চলেছে। জনমতকে বিজ্ঞাপন, প্রচার, আন্দোলন প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত করবার চেষ্টায় প্রতিনিয়তই সমাযোজন তত্ত্বের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতি পরমাণুতে সংযোগসাধনে উন্মুখ বৈজ্ঞানিক বিংশ-শতাব্দীতে বিভিন্নভাবে পরিপুষ্ট করে চলেছে সমাযোজনতত্ত্বকে। আজ তাই দুরূহ মনে হলেও এর ইতিহাস, পদ্ধতি ও রকমফের আলোচনা করলে প্রাত্যহিক জীবনে এর অবদান অনুভব করা যাবে।

২

ইতিহাসগতভাবে সমাযোজন তত্ত্বের সূত্রপাত হয় প্রবুদ্ধকরণের যুগ বা Age of Enlightenment-এ। সামাজিক চুক্তির বিপরীতে একটি শক্তিশালী তত্ত্বের উদ্ভাবনই ছিল এ সময়কার সমাযোজনতত্ত্বের অনুপ্রেরণা। কে. যাস্‌পারস (K. Jaspers), ও. বোলনাউ (O. Bollnow), ই. মুনিয়ের (E. Mounier) প্রভৃতি সমাযোজন তত্ত্বের প্রস্তাবকদের মতে 'চুক্তি-মতবাদে'র ভিত্তি ব্যক্তির পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার উপর ; অন্যদিকে মানুষের পরস্পর নির্ভরতার উপর ভিত্তি করেই রচিত হচ্ছে সমাযোজন আলোচনার প্রেক্ষাপট। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক জীবনে নতুন প্রয়োগ দেখা দেয়। জটিলতাও বৃদ্ধি পায় সঙ্গে সঙ্গে। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষের সামাজিকীকরণ, জনসমষ্টি সংগঠন ও বৃদ্ধিতে সমাযোজন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথম অবতারণা করেন সমাজতত্ত্ববিদ সি. এইচ. কুলে। কুলে তার গবেষণাপত্র 'The Theory of Transportation' ও তার 'Human Nature and Social organisation' গ্রন্থে সমাযোজনকে একটি বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক মাত্রা দান করেন। সমাযোজন তত্ত্বের বিশেষ আলোচনার সূত্রপাত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও পরে। সি. ই. শানন (C. E. Shannon)-এর টেলিকমিউনিকেশনের আলোচনা এবং এন. উইনার (N. Wiener) ও ফন নয়ম্যান (Von Neuemann) এর সাইবারনেটিকস্ বা সংযোগ নিয়ন্ত্রণের ধারণা বিভিন্ন সমাজবিদ্যার সহায়তায় এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিপুষ্ট

সমাযোজনতত্ত্বের উপস্থাপনা করে। কুর্ট লেভিন (Kurt Lewin), জি. এইচ. মীড (G.H. Mead) কে. ডব্লু ডয়েশ্ (K.W.Deutsch) প্রভৃতির আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্বিষয়ক সহযোগিতায় পরিপুষ্ট এই গোষ্ঠীগুলি আমেরিকার বোস্টন ও প্রিন্সটন শহরে •গণিতভিত্তিক এক সাধারণ সমাযোজন তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটান। এই তত্ত্ব আবার অন্যদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশেষ সমাযোজন তত্ত্বের সূত্রপাত করে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক তথ্য থেকে সমাযোজন তত্ত্বের এই গবেষণা শুরু হয়। তিরিশের দশকে আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানী পল ল্যাজারসফেল্ড (Paul F. Lazarsfeld) শ্রোতাদের পরীক্ষা করে, নির্বাচনী প্রচারের প্রভাব বিশ্লেষণ ও প্রচলিত বিভিন্ন সংযোগ মাধ্যমগুলির আলোচনা করে এই গবেষণা জোরদার করেন। কুর্ট লেভিন-গোষ্ঠী চাঞ্চল্যের বিশ্লেষণ করেন,হ্যারল্ড. ডি. লাস্ওয়েল (Harold. D. Lasswell) প্রচারের রূপ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে এই গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। লেভিন. ল্যাজারসফেল্ড ও লাসওয়েলের ছাত্ররা—কাৎস (Katz), ক্লাপার (Clapper), ফেস্টিংগার (Festinger), ডয়েৎস (Deutsch) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিকভাবে সামাজিক সমাযোজন তত্ত্বের যে গবেষণা করেন তার মোট তিনটি ধারা আমরা দেখতে পাই। এক, গোষ্ঠিগত আচরণ সমীক্ষা ; দুই, গণ-সংযোগ মাধ্যমগুলির বিশ্লেষণ ; তিন, গোষ্ঠী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সমাযোজন-তত্ব আলোচনার বৃত্ত এইভাবে বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমী দেশগুলিতে সমাযোজনগবেষণা আজ এ্যাকাডেমিক সমর্থন লাভ করলেও পূর্ব গোলার্ধে তার আলোচনা এখনও সীমিত। অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতে সমাযোজানর আলোচনা হয়ে চলেছে একটি বিশেষ অর্থে। এই প্রবন্ধের শেষাংশে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

সমাযোজন-মাধ্যমগুলির আলোচনায় শুরুতেই বলা যেতে পারে যে এগুলিকে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি। এক, কতকগুলি মৌলিক বা মুখ্য মাধ্যম আছে যেগুলি স্বভাবতই সংযোগ-সাধনকারী। দুই, আরেক ধরনের মাধ্যম আছে যেগুলি সমাযোজন পদ্ধতিকে সাহায্য করে। এগুলিকে গৌণ মাধ্যম বলা যেতে পারে। এ ধরণের বর্গীকরণ মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে খুব বেশি অর্থবহ না হলেও ইতিহাস ও সমাজতাত্ত্বিক দিক হতে এর মূল্য অনেক বেশি। প্রথম ধরনের মৌলিক মাধ্যমগুলি মানবসমাজের সর্বত্রই বিধৃত, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পদ্ধতিগুলি সভ্যতার কতগুলি বিশেষ পর্যায়ে কার্যকর দেখা যায়। মুখ্য সমাযোজক মাধ্যমগুলি বলতে ভাষা, ভঙ্গী, আচরণের অনুকরণ এবং প্রকাশ্য আচরণ হতে অনুসৃত কতগুলি অস্পষ্ট ও সুপ্ত পদ্ধতি

যেগুলিকে 'সামাজিক নির্দেশক' (Social suggestions) বলা হয়। এই সমস্তই বোঝা যায়। তাই এই মাধ্যমগুলির মধ্যে ভাষার সার্বভৌমত্ব সর্ববাদিসম্মত।

ভাষা সম্বন্ধে অনেক কিছু না বলে বলা যায় যে বোধগম্য যে কোন তথ্যকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আয়ত্তের মধ্যে এনে দিয়েছে এই মাধ্যমটি আর সৃষ্টি করেছে বহুমুখী সংযোজনের। সভ্যতার এই চূড়ান্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে এ কথা বলা যায় যে আদিম সমাজে যত অসুবিধাই থাকুক না কেন, তার ভাষা প্রতীকী ঐশ্বর্যে ও দৃষ্টির সম্ভাবনায় আজকের বিশিষ্ট বর্ণমালার মতই কার্যকর ছিল। ভঙ্গী বলতে অঙ্গচালনা ছাড়াও আরও বিশেষ কিছু বুঝে থাকি। গলার স্বরের গাম্ভীর্য ও মুষ্টিবদ্ধ হাত একটা বিশেষ ভাবের দ্যোতক। ভাষা ও ভঙ্গী এক সাথে কাজ করে থাকলেও মনোবিজ্ঞান-সঞ্জাত ও ঐতিহাসিক অনেক কারণেই এদের মধ্যে দাঁড়ি টানতে হয়। বাক্যপ্রয়োগ ও লেখার মাঝে যে সমাযোজন তা সচেতন, সরকারী ও সমাজ-স্বীকৃত। কিন্তু ভঙ্গী আমাদের মনে যে সংবাদ আনে তা ব্যক্তিগত ও বিশেষ মাত্রার এবং তা কোন কোন সময় ভাষা-মাধ্যমের দিগন্তকেও খুব সহজেই অতিক্রম করে এক বিশেষ বিশ্ব সৃষ্টি করে।

সমাজ সংগঠনের একটি বিশেষ শর্তই হল মানুষের প্রকাশ্য আচরণের অনুকরণ। এই অনুকরণ হয়ত প্রত্যক্ষভাবে সব সময় সমাযোজন-ধারাকে সমর্থন করে না, কিন্তু পরোক্ষভাবে এগুলি বিশেষ প্রভাবশালী। কেউ যদি ধর্মাচরণের নিয়মগুলি পালন করতে থাকেন তবে তার দেখাদেখি অন্য একজনও তা পালন করবে। এমনি করেই সৃষ্টি হবে সমাযোজিত এক সমাজ-প্রতিষ্ঠানের। ব্যক্তির সামাজিক অভিজ্ঞতার এই পরোক্ষ সমযোজনকে স্থায়িত্বে ও যুক্তিতে আসীন করবার দায়িত্ব ভাষার। সব শেষে বলা যায় যে, অনুকরণ অপেক্ষা আরও কম সংযোগ-সাধনকারী হল মানুষের প্রকাশ্য আচরণে উদ্দীপিত কতগুলি নতুন কাজ ও নতুন ধারণা। মাঝে মাঝে দেখা যায় কতগুলি বিশেষ গোষ্ঠী চল্‌তি আচার-আচরণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে—সৃষ্টি করছে কতগুলি বিশেষ সমাজ নির্দেশিকার বা social suggestion এর। ছকের বাইরের, কথার ওপারের এই সমাযোজকগুলির প্রভাব বিশেষ কার্যকর হয় মাঝে মাঝে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম সামাজিক অনুরণনগুলিকে প্রত্যক্ষ সমাযোজকে রূপান্তরিত করবার দায়িত্ব শিল্পীর। সমাযোজন মাধ্যমগুলি ঠিক যেমন বর্ণিত হ'ল তেমনিভাবে এগুলি সমাজের সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না। এদের বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন অর্থ আছে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধের হিজিবিজিতে এগুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বিশেষ ভাষা-প্রতীক একই পরিবারের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সমান ভাবে সংযোগ সাধন করে

না। একান্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত একটি প্রতীক-শব্দ তার ব্যর্থতা ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে স্তূপীকৃত লিখিত আলোচনার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর। সমাযোজন মাধ্যমগুলির ব্যবহারেরও কার্যকরিতার নানা রকমফের অবশ্যই লক্ষণীয়; সীমাবদ্ধ বর্গীকরণের অছিলায় কোন বিশেষ সংখ্যাকেই সর্বাবস্থায় চূড়ান্ত বলে ধরা যায় না। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে এদের হ্রাসবৃদ্ধি ও রকমফের অবশ্যই হয়ে থাকে।

সমাযোজনের প্রত্যক্ষ মাধ্যমগুলি ছাড়াও এমন কতগুলি মাধ্যমের উল্লেখ করা যায় যেগুলি পরোক্ষভাবে সংযোগ-সাধনে বিশেষ কার্যকর। এক্ষেত্রে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার ও বিমান ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়। এটা অবশ্যই লক্ষ্য করা যায় যে রেলপথ ও বেতার প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ সাধনে অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু এগুলি সমাযোজনকারী প্রতীকী মাধ্যমগুলিতে বল সঞ্চার করে। টেলিফোনের ত কোন অর্থই থাকেনা, যদি না এক দিকে উপস্থিত ব্যক্তি অপরধারের ব্যক্তির ভাষা বুঝতে অপারগ হয়। রেলপথ একজনকে অন্যস্থানে উপস্থিত করে বটে। কিন্তু সেই ভিন্ জায়গায় যদি এই ব্যক্তির কোন স্থায়ী স্বার্থবন্ধন না থাকে তবে রেলপথের সমাযোজনকারী কোন অর্থই থাকে না। এই সমস্ত উপাদানগুলির পরোক্ষ ভূমিকা উপলব্ধি না করতে পেরে অনেকেই এগুলির অস্তিত্বকে অযথা জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমাযোজনের ক্ষেত্রও সম্প্রসারনশীল। তথাকথিত আদিম সমাজে আদিবাসী সংস্কৃতি মানুষেরা তাদের নিজেদের মধ্যে বা আশ-পাশের লোকের মধ্যে সংযোগ সাধনেই সন্তুষ্ট থাকত; তাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে থাকত কত বিচিত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বর্তমানে সমাযোজনের ব্যাসার্ধ দীর্ঘায়িত হয়েছে, এক স্থানের সংস্কৃতি খুব সহজেই বহু দূরবর্তী লোকেদের আয়ত্বে এসে যায়। সমাযোজন মাধ্যমের এই কার্যকারিতার ফলে বর্তমান সভ্যতায় ভৌগোলিক মাত্রার প্রয়োজনীয়তা কম্‌তির দিকে।

৪

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কর্মের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য খুঁজে বের করা মানুষের সহজ প্রবণতা। এই সদৃশ তথ্যের সাহায্যে যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং তা করা থেকে এক ব্যাখ্যা-নিরপেক্ষ অনুসন্ধান পদ্ধতি (Heuristic Method) হতেই এর বিকাশ ঘটেছে। এই পদ্ধতির ব্যাখ্যায় বলা যায় যে একটা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তের (Controlled Variable) প্রয়োগ (input) সাপেক্ষে প্রত্যাশিত ফল বা আকাঙ্ক্ষিত মূল্যমান (desired value) প্রাপ্তফল বা মূল্যমান (actual value)

থেকে অনেক সময় পৃথক হয় আর তার ফলেই সমাযোজনের ক্ষেত্রে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়—সৃষ্টি হয় সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনের। বাস্তবে এই প্রাপ্ত ফল (output)-ই বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমাযোজনকে। কোন বদ্ধ ব্যবস্থাতেই (closed system) এটা সম্ভব নয়। জৈব বা সামাজিক ব্যবস্থা সর্বদাই মুক্ত ব্যবস্থা (open system), আর এ কারণেই পরিবেশের পরিবর্তন ও সংবাদের লেনদেনের মাধ্যমেই অবিরত চলে সমাযোজন প্রক্রিয়া। প্রখ্যাত সমাযোজন-তত্ত্ববিদ শ্যানন্ সমাযোজন পদ্ধতিকে বলেছেন একটি সংশোধনকারী পদ্ধতি—যে উৎস থেকে কোন প্রেরকের মাধ্যমে সংবাদ পাঠান হয় গ্রহীতার কাছে। সমাযোজনের এই পদ্ধতিতে কোন অসুবিধের সৃষ্টি হলে তা প্রেরক পদ্ধতি (Feedback process)-তেই সংশোধিত হয়। সমাজতত্ত্ববিদ লাস্ওয়েল এই ব্যাপারটি টেলিফোন ব্যবস্থার সাহায্যে সমাযোজনের সূত্রের আকারে তুলে ধরেছেন। "কে/কি বলেছে/কি পদ্ধতি/কাকে/কিসের জন্য ?" যাহোক, সমাযোজন পদ্ধতি বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত হয়ে থাকে এবং এর স্তরে স্তরে অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও পরিবেশজনিত নানা তথ্য বিভিন্ন প্রতীক মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

সমাযোজন পদ্ধতির এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে সমাযোজনের কতকগুলি বিশেষ ধরনের উপাদান দেখা যায়, যেমনঃ (ক) অনুভূতি উদ্রেকের শর্ত (মাধ্যম অর্থাৎ শব্দ, বর্ণ, স্পর্শ) ; (খ) স্থানিক অবস্থা (অবস্থিতি অর্থাৎ গ্রন্থাগার, সিনেমা গৃহ, আলোচনা কথা ইত্যাদি) ; (গ) কাল-বিস্তার (কখন, কতক্ষণ, কখন কখন অর্থাৎ দিনের কতটা সময়, কতকাল ব্যাপী, কোন মুহূর্ত ইত্যাদি) ; (ঘ) গবেষণার অবস্থা (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবস্থা) ; (ঙ) সামাজিক গোষ্ঠীবিন্যাস (কার সঙ্গে অর্থাৎ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে, একলা বা ভিড়ে)। উপরের উপাদনগুলিকে আশ্রয় করে প্রয়োগক্ষেত্রে সমাযোজন পদ্ধতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক. অন্যের সঙ্গে সমাযোজন বা নিজের ভিতরে নিজেই সমাযোজন করা। দুই. প্রত্যক্ষ সমাযোজন পদ্ধতি—যার মধ্যে কোন তৃতীয় পক্ষ বা যান্ত্রিক মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না (যেমন, কথোপকথন, অভিনয়)। তিন. পরোক্ষ সমাযোজন পদ্ধতি—তৃতীয় মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করে, (যেমন, আদেশাবলী, বেতার-ঘোষণা টেলিফোন-বার্তা ইত্যাদি)। চার. একপেশে বা পারস্পরিক সমাযোজন (যেমন, বক্তৃতা বা আলোচনা)। পাঁচ. গণ সমাযোজন বলতে বোঝায় এমন কিছু যেখানে যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তিই অংশগ্রহণ করতে পারে। ছয়. ব্যক্তিগণ সমাযোজন বলতে বোঝায় পরিচিত কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা।

সামাজিক গোষ্ঠীবিন্যাস অনুসরণ করে সমাযোজনকে মুখ্য, আধা-মুখ্য ও গৌন সমাযোজন—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) ক্ষুদ্রগোষ্ঠীগুলির মধ্যে (যেমন পরিবার) যে সমাযোজন হয় তাকে মুখ্য সমাযোজন বলা হয়। মুখ্য সমাযোজন পদ্ধতির কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন এতে স্থান ও কালের কোন দূরত্ব দেখা যায় না। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য এর আরেক বৈশিষ্ট্য। এই সংযোগ সাধনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সবিশেষ ঐক্য দেখা যায় ও আলোচনায় আনুষ্ঠানিকতা প্রায় সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। (খ) আধামুখ্য সমাযোজন প্রক্রিয়া কোন বিশেষ টিম বা দল ও প্রতিবেশীদের মধ্যে কার্যকর হতে দেখা যায়। (গ) গৌণ সমাযোজন সংঘটিত হয় বৃহদায়তন গোষ্ঠী-(যেমন, কমিউনিটি বা বিচ্ছিন্ন দর্শকমণ্ডলী)-গুলির মধ্যে। এই ধরনের সমাযোজনে স্থান ও কালের পার্থক্য সুস্পষ্ট ; বহু ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মিলন ও ঐক্যের ঘাটতি এখানে দেখা যায়। অবশ্য স্থান ও কালের দূরত্ব বিশেষ ধরনের প্রতীক মাধ্যমে দূর করা যায় ; যেমন, বই, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। সমাযোজনের বিভিন্ন স্তরও এমনিভাবে সমাযোজক (যেমন, সাংবাদিক, বক্তা, এজেন্ট ইত্যাদি) ও মতাদর্শগত নেতৃত্বের দ্বারা কাছে আসতে পারে। গণ-সমাযোজন—গৌন সমাযোজন পদ্ধতির এই বিশেষ পর্যায়ে দ্বি-মুখী লেনদেন দেখা যায়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও মতাদর্শগত নেতাদের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক এবং মতাদর্শগত নেতৃত্বের সঙ্গে জনসাধারণের একটি বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায়। একটি বিশেষ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থায় সমাযোজন কোন সময় উল্লম্ব বা কোন সময় আনুভূমিক হয়ে থাকে।

জন-সংযোগ পদ্ধতি একটি বিশেষ ধরণের গৌণ সমাযোজন। আসলে মুখ্য, আধা-মুখ্য ও গৌণ সমাযোজন প্রক্রিয়া পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে সাংবাদিক, সম্পাদক, মতাদর্শী নেতৃবর্গ ও জনসাধারণে মিলে সমাযোজনের বিশেষ স্তরে সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে এই পদ্ধতি কার্যকরী হয়। প্রচারের এই বিশেষ ধারার সার্থকতা সমাযোজ্য সামাজিক—সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ঘটনার স্থান ও কালের ওপরেই শুধু নির্ভর করে না, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মাধ্যমের উপরও এগুলি বহুভাবে নির্ভরশীল। মুখ্য সমাযোজন-কেন্দ্রে মত প্রচারকদের ভূমিকা ও গৌণ সমাযোজন মাধ্যমগুলির উপর এদের প্রভাব কোন মতে অস্বীকার করা চলে না। একটি বিশেষ ব্যবস্থায় গণসংযোগের মাধ্যমগুলির সমতাসাধন করা হয়—এই ভাবে আর এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। সমাযোজকের তাৎপর্য, তাৎক্ষণিক মূল্য, প্রচার, সর্বজনীনতা ও ধারাবাহিকতার উপর নির্ভর করে কি ভাবে সমস্ত মাধ্যমগুলিকে আয়ত্ত করা যায়,

আর এগুলির উপরই নির্ভর করে জনসংযোগের দক্ষতা। জনসংযোগ পদ্ধতির এই আলোচনা কালে অবশ্যই মনে করা যেতে পারে যে সমাযোজন ব্যবস্থাগুলি মুক্ত, আধা-সীমাবদ্ধ ও বদ্ধ এই তিন ভাবে বিভক্ত হতে পারে। অবশ্য সমাযোজন প্রক্রিয়ার পদ্ধতি অনুসারে ও নিজস্ব সাংগঠনিক ধারায় বর্তমানে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ সমাযোজন ব্যবস্থা বা সাংস্কৃতিক দ্বীপ (Cultural Island)-এর উপস্থিতি নেই বললেই চলে। জনসংযোগের কথা বললেই আজ সম্পূর্ণ মুক্ত বা আধা-সীমাবদ্ধ সমাযোজন ব্যবস্থা মনে হয়। দেশ ও বিদেশের সমস্ত সংবাদ ও সংস্কৃতি নিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গঠিত সমাযোজন প্রক্রিয়াই আজকের গণসংযোগকে চূড়ান্ত সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারে ;—নিয়ে যেতে পারে ভিষারখন্দের স্বপ্ন সেই 'সাংস্কৃতিক মহাদেশ' (cultural continent)-এ।

প্রসঙ্গত সমাযোজন পদ্ধতির পথের বাধাও উল্লেখ করতে হয়। সাধারণত তিন ধরনের বাধা আমরা দেখতে পাই। যেমন : এক. পদার্থ-জনিত ; দুই. মনোবিজ্ঞান-গত ও তিন. সামাজিক-সাংস্কৃতিক। স্থান ও কালের দূরত্বে যখন কোন যান্ত্রিক ও প্রাকৃতিক বাধা সৃষ্টি হয় তখনই আমরা প্রথম ধরনের বিপত্তি উপলব্ধি করতে পারি। যখন সমাযোজন মাধ্যমগুলির ব্যাখ্যা করা যায় তখন আমরা দ্বিতীয় ধরনের বাধার সম্মুখীন হই। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাগত সুযোগের হেরফের, বৈদেশিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, গুপ্ত সমিতির উপস্থিতি ও ব্যাখ্যা, গোপন গ্রন্থাগার ইত্যাদির জন্য সাজাজিক-সাংস্কৃতিক সমাযোজনের ক্ষেত্রে অনেক বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পর্যায়ের এই বাধাগুলি প্রেরক-পদ্ধতির হেরফেরের মাধ্যমে খুব সহজেই অতিক্রম করা যায়। সমাযোজন পদ্ধতি ও তার রকমফেরের এই আলোচনা পশ্চিমী দেশগুলিতে গত অর্ধশতাব্দী ধরে সমাযোজন তত্ত্বের ব্যাখ্যায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত দেখা যায়।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাযোজন পদ্ধতির আরেক ধরণের উপস্থাপনা আমরা দেখতে পাব।

৫

মার্ক্স-এঙ্গেলসের রচনাই মার্ক্সীয় সমাযোজন তত্ত্বের সূচনা ঘোষণা করে। শুধুমাত্র দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক নীতির মাধ্যমে মার্ক্সীয় জ্ঞান-চর্চার প্রত্যেকটি বিষয়ের কথাই শুধু নয়—এদের বাস্তব সাংবাদিকতা ও সফল প্রচারমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে প্রেরণ পদ্ধতি পরিস্ফুট সমাজতান্ত্রিক দেশে তাকেই সমাযোজন ক্রিয়া বলে ধরা হয়। লেনিনই প্রকৃত অর্থে সাম্যবাদী সমাজে তত্ত্বগত ভাবে সমাযোজনের সূত্রপাত করেছেন বলা চলে। নতুন ধরণের পার্টি সংগঠন ও তার অগ্রগামী গোষ্ঠীর মাধ্যমে সর্বহারার

অধিকাংশকে সচেতন নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসার যে সামাজিক শর্ত লেনিন স্থির করেছেন তা সমাযোজনের চূড়ান্ত রূপ। সম্প্রসারণ তত্ত্বের একটি চরম নিদর্শন সর্বহারার ক্ষমতা দখল ও নতুন সমাজ-ব্যবস্থা পূর্ণভাবে কায়েম করা। নিয়ত ও নিরবচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে কর্মোদ্যোগ ও সুপরিচালিত সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় জনমানসে পার্টিগত চেতনাকে সর্বোচ্চ স্থানে উত্তীর্ণ করা—সমাজতন্ত্রে সমাযোজন প্রক্রিয়া এভাবেই চলে। লেনিন অর্থনীতিবিদ মার্টিনভের বিরোধিতা করে, প্লেখানভকে অনুসরণ করে প্রচার (Propaganda) এবং আন্দোলন (agitation)-এর মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন।

লেনিনের মতে প্রচারের ভিত্তি যুক্তির উপর ও তার ব্যাখ্যান কার্যকারণ ভিত্তিতে। প্রচার মাধ্যমের লক্ষ্য দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা। আর আন্দোলনের ভিত্তি আবেগের নজির তুলে ধরে ; এরা প্রতিফলিত করে কতগুলি সিদ্ধান্ত। স্বল্পস্থায়ী এজিটেশন বা আন্দোলন স্বল্পস্থায়ী মুখ্য সমাযোজনের প্রতীক, এর জন্য দরকার প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সংযোগ (যেমন—কথা বলা, বক্তৃতা)—এগুলি সংঘটিত হয় সমাজের অণুস্তরে। প্রোপাগাণ্ডা সাধারণত পরোক্ষ সমাযোজন (যেমন—মুদ্রিত পুস্তক, ইস্তাহার ইত্যাদি) এবং এটি রাজনৈতিক সংগ্রামের সহায়ক। এ দুটি সংস্থাপক আয়ুধ যত পৃথকই হোক না কেন, এদের উদ্দেশ্য একই—এরা চায় জনগণকে বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে। মার্কসীয়-লেনিনীয় মতে প্রচার-মাধ্যম আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক রূপদান করে আর—আন্দোলনের শ্লোগান কর্মোদ্যোগের পথ চিনিয়ে দেয়। তত্ত্বগতভাবে উদ্বোধিত জনগণ হবে বস্তুগত শক্তি আর বৈপ্লবিক শব্দ-সমাযোজন রূপান্তরিত হবে বৈপ্লবিক কর্মে। প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক প্রভাব দ্বারা মতসৃষ্টি ও চেতনার উন্নতির পরিমাপ করা যায়। কাৎস ও লাজারসফেল্ডের দ্বিমুখী সংস্থাপক ব্যবস্থার অনুমান লেনিন পূর্বেই করেছিলেন, অবশ্য তিনি এটা করেছিলেন নিয়ন্ত্রিত নির্দেশানুযায়ী কাজের জন্য। প্লেখানভের ধারণা অনুসরণ করে লেনিন প্রচার মাধ্যমকে সর্বহারার সবচেয়ে সচেতন অংশের তাত্ত্বিক উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় মনে করতেন, আর আন্দোলনকে মনে করতেন সমগ্র সর্বহারা সমাজের একত্রীকরণের উপায়। এই দ্বিমুখী সংস্থাপনের প্রথমেই সবচেয়ে প্রয়োজন কর্মীদের বা সমাযোজকদের তত্ত্বগত উপযুক্ততা। এর পরই কর্মপন্থা নেওয়া হয় সমাযোজকদের মাধ্যমে—দলগত আদর্শকে বিচ্ছুরিত করবার জন্য। বর্তমানের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় ও যান্ত্রিক উন্নতির জন্য লেনিনের দ্বারা স্বীকৃত এই দ্বিমুখী পদ্ধতির কিছুটা হেরফের হচ্ছে।

গণ-সংহতি একটি মৌলিক সমাযোজনের ঘটনা। সংহতি কোন স্বতস্ফূর্ত ব্যাপার

নয়, সচেতন নেতৃত্বের ফলশ্রুতি এটি। জনগণের সঙ্গে সংযোগ সাধনের কাজ আর কর্মীদের কাজের মাঝে নিশ্চয়ই পার্থক্য থাকবে। গণ-সমাযোজনের এই প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য মার্কসীয় আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলেই দেখা যায় যে পার্টি ও অন্যান্য স্বীকৃত সংগঠনগুলি সমাযোজনের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে, এখানে সাংবাদিক ও প্রচারক ছাড়াও শ্রমিক-কৃষকদের সংবাদদাতার বিশেষ প্রয়োজন। সমাযোজিত হবে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক হতে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু। ব্যাপক অর্থে এই সমাযোজন সমাজের মৌল ও উপরিতলের কাঠামোগুলির (যেমন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, উপাদান) উপর সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। মুদ্রাযন্ত্র, বেতার, দূরদর্শন, শ্রমিকদের সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলি মূলত সমাজের উপরিতলের কাঠামো-প্রতিষ্ঠান। অবশ্য, ১৯০৫ সালে লেনিন শ্রমিকদের সংবাদপত্রকে সর্বহারাদের মতাদর্শগত সংগ্রামের সবচেয়ে (শ্লোগানযুক্ত আন্দোলনের চেয়েও) শাণিত অস্ত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। লেনিন সংবাদপত্রকে সমাযোজন ও জনগণের বস্তুগত শিক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন। এই ধারণায় গণ-সমাযোজনের মাধ্যমগুলি দুটি বিশেষ সমাযোজন কার্যের জন্য চিহ্নিত : এক. জনগণের মতাদর্শগত ও তত্ত্বগত শিক্ষা। এবং দুই. রাজনৈতিক বিরোধীদের ত্রুটি তুলে ধরা। মূলত জনসংযোগের মাধ্যমগুলি একটি বিশেষ শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থায় শ্রেণী চরিত্রকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্টির নীতিকে তুলে ধরে। বিশেষ বিশেষ সমাজব্যবস্থায় এই মাধ্যমগুলির কার্যাবলীও বিশেষ রূপ ধারণ করে। কোন অবস্থায় মাধ্যমগুলি সৃষ্টিশীলভাবে কার্যকর (function), আবার কোন অবস্থায় ধ্বংসকারী হিসাবেও কার্যকর (disfunctional) হয়ে থাকে। মার্কসবাদীদের মতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বুর্জোয়া মাধ্যমগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক মাধ্যমগুলি সংহতি সাধন করে থাকে। ঠিক উল্টোভাবে বলা যায় যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শ্রমিকদের সংবাদপত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের ধ্বংসমূলক শক্তিকেই জোরদার করে। মার্কসীয় তত্ত্বের সাহায্যে সমাযোজন তত্ত্বের বিশ্লেষণ এমনি ভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাযোজন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে এমনি ভাবে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হয়ে চলেছে। সাইবারনেটিকস্ বা সংযোগ-নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মার্কসীয় সমাযোজন পদ্ধতি বিশেষ রূপ লাভ করছে।

৬

ইউরোপে ও আমেরিকায় ষাটের দশকে সমাযোজন-গবেষণা একটি মৌল ও ফলিত বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সংবাদ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব

প্রভৃতির মত পৃথক পৃথক বিষয়ের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে এই বিজ্ঞান। সাম্যবাদী সমাজে এই বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভর করে আছে মূল প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সূত্রের উপর। সমাযোজন বিজ্ঞানের এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও সমাজ-বিজ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে এর আলোচনায় কিছুটা অসুবিধা উপলব্ধি করা যায়। এই অসুবিধের কারণ সমাযোজন বিজ্ঞানের অনৈতিহাসিক চরিত্র। এই বিজ্ঞান প্রায়ই বস্তুগত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে যায় এবং মার্কসীয় দর্শনের বিরোধী মত পোষণ করে ও নব্য ধ্রুববাদী ও প্রয়োগদৃষ্টিবাদী ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করে। সমাযোজনের এই প্রয়োগদৃষ্টিবাদী চরিত্র বহুতত্ত্ববাদী সমাজব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। সাম্যবাদী সমাজে স্বাধীন সমাযোজন বিজ্ঞানের উপস্থিতি এ সমস্ত কারণে অসম্ভব বলে মনে হত। কিন্তু সংযোগ-নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানের মাধ্যমে এই বিজ্ঞান সম্প্রসারিত হবার সাথে সাথেই সমাযোজন-বিজ্ঞান সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্প্রসারিত হতে থাকে।

সমাযোজনের এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনেক সময় মনে করিয়ে দেয় যে এই বিজ্ঞান বোধহয় সমাজ-বিরহিত একটি বিজ্ঞান। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই বিজ্ঞান যান্ত্রিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও বিভিন্ন উপাদানের সমাহার হলেও এই বিজ্ঞানের চরম স্ফূর্তি সমাজ জীবনে প্রযুক্ত এর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রূপে। মানুষের সভ্যতার শুরু হতে আজ পর্যন্ত তার যে কোন প্রকাশ-ব্যঞ্জনায় এই বিজ্ঞানের সাংস্কৃতিক রূপ আমরা দেখেছি। শুধুমাত্র ধ্বনিতে ধ্বনিতে সমাযুক্ত মানুষের পরিবর্তে আজ বিজ্ঞানের যুগে দূরদর্শন ও দূরভাষণ-নিরত মানুষকে আমরা দেখতে পাই। কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, অন্যান্য বিভিন্ন রচনা ও মানুষের তৈরী ও সংরক্ষিত বিভিন্ন শিল্পের মধ্য দিয়ে আজ বিংশ-শতাব্দীতে বসে আমরা নিজেদের সমাযুক্ত করি খৃষ্টপূর্ব বিভিন্ন শতকের মানুষের সাথে। অতীতের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে আমরা পথ বেঁধে দিই ভবিষ্য প্রজন্মের। এই বিরামহীন সমাযোজনে যখন আমরা উপলব্ধি করি যে এই ধনতান্ত্রিক শাইলক সভ্যতার পরিবর্তন দরকার, তখন আমরা এই সমাযোজনকে আশ্রয় করেই সমাজ-বিপ্লবের গ্রন্থি বাঁধি। নাটকে, উপন্যাসে অনুরণন জাগে এই গ্রন্থনের। এর মধ্যে নিকটও দূর বলে কোন পার্থক্য থাকে না। গোর্কির 'মা' পড়ে বিপ্লববহ্নি বুকে লালন করে অহল্যা 'মা'র দেশের ছেলেরা। লোককাব্য সাড়া জাগায় শহরবাসী তরুণদের মনে। আমাদের দেশের ব্রিটিশযুগের 'কারার ঐ লৌহ কপাট' ভেঙ্গে ফেলার সাড়ায় আজও উদ্বেল হয় স্বদেশপ্রাণ তরুণেরা। তাই বলতে হয় সমাযোজনের বিভিন্ন উপাদানের বিকাশ ও পরিবর্তন ঘটে বিজ্ঞান ও চিন্তার অগ্রগতির সাথে; তাদের চূড়ান্ত সার্থকতা দেখা দেয় সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন চিন্তার রূপকল্পে স্থান পেয়ে। সামযোজন তাই কোন

কারণেই সমাজ-বিরহিত নয়। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সমাযোজনের রূপ ও পদ্ধতি আমাদের সার্থক সমাজের অধিবাসী করতে পারবে। সমাযোজন ও সমাজতত্ত্বের যৌথ আলোচনার সার্থকতা এখানেই ॥

গ্রন্থপঞ্জী

1. MacIver & Page : Society
2. 'Communication' : art by Edward sapir in the Encyclopaedia of sociences Edt by Seligman. Vol-III & IV
3. C. H. Cooley : Human Nature & the Social order N.Y. 1922
4. ,, : Social Organisation N. Y. 1909
5. C. E. Shannon : A Mathematical Theory of Commu nication.
6. N. Wiener : The Human use of Human Beings' Cybernatics & Society.
7. P.E.Lazarsfeld *ed* : Communication Research (1948 1949) N. Y. 1959.
8. H. D. Lasswell : The Comparative Study of Symbols. Stanford 1952.
9. K. W. Deutsch : The Nerves of Government : Models of Political Communication and Control. London 1966.
10. G. H. Mead : Mind, Self and the Society. Chicago, 1930.
11. Lenin : Complete-Works. (vol. 27)
12. Art or Communication : The Dictionary of Philosophy. Moscow.

লোক-সাংবাদিকতা ও জনসংযোগ

নির্মলেন্দু ভৌমিক

১

লিখিত সাংবাদিকতা আরম্ভ হবার অনেক আগেই, বিশ্বের প্রায় সব দেশের লোকসাহিত্যেই মৌখিক সাংবাদিকতা (oral journalism) শুরু হয়ে গিয়েছিল। একেই এক বিশেষ অর্থে 'লোক-সাংবাদিকতা' (Folk-Journalism) আখ্যা দিচ্ছি। 'বিশেষ অর্থে' এই জন্যে বললাম, 'লোক-সাংবাদিকতা' লোক সাহিত্যেরই একটি অঙ্গ, এবং ইদানীং লিখিত রূপেও লোকসাহিত্যে মিলছে।

সাংবাদিকতা, তা সে লিখিতই হোক, আর মৌখিকই হোক, তার মূল লক্ষ্য হল—communication অর্থাৎ জনসংযোগ, —সংবাদকে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে, সেই জনতাকে একটি লক্ষ্যের প্রতি চালনা করা বা তাদের সচেতন করে তোলা। আজকের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকেরা এই জনসংযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। রাজনীতিবিদ্‌রাও এর মধ্যে একটি বিশেষ সম্ভাবনাকে দেখে থাকেন, এবং প্রতি রাজনীতিকই এই জনসংযোগের প্রতি সচেতন থাকেন,—কি ব্যক্তিগত দিক থেকে, কি দলগত দিক থেকে।

এই Communication-এর কতকগুলি বিশেষ Function আছে। কি ভাবে একজন বা একদল ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি তথ্য বা সংবাদ প্রচারিত হয় এবং কিভাবে সেই তথ্য বা সংবাদটি সেই গোষ্ঠীর বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, অভীষ্ট ফল লাভে কতখানি সহায়তা করে, তার পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা এই Function-এর বড়ো দিক। Function এর এক প্রান্ত হল, কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে, কোন 'মাধ্যম' নিয়ে সংবাদটি প্রচারিত হল ; আর অন্য প্রান্ত হল,—কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দুটি প্রান্তেরই দুটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকে,—একটি ক্রিয়ার, আর একটি প্রতিক্রিয়ার।

লোক-সাংবাদিকতার মধ্যেও এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি দেখা যায়, যদিও সর্বদা এবং সর্বত্র আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না, বা সে-বিষয়ে সচেতন থাকি না। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যায়, অধিকাংশ লোকসাহিত্যের আয়োজনের মধ্যেই জনসংযোগের দিকটি খুব একটা বড়ো ব্যাপার হয়ে লুকিয়ে থাকে। অবশ্য বলা দরকার, জনসংযোগ বলতে এখানে সকল শ্রেণীর মানুষ নয়,—আপন গোষ্ঠীর ও

আপন শ্রেণীর মানুষ। মার্জিত ও শিক্ষিত মানুষের পারস্পরিক সংযোগ একটি বিশেষ ভাবাবেগ (Sentiment)-এর ওপর নির্ভর করে, শ্রেণী-বহির্ভূত বিস্তার লাভ করে, লোকসমাজের ক্ষেত্রে যা হয় না। যেমন, কলকাতার রাজপথে একটি পকেটমার ধরা পড়ল, খবরটি তৎক্ষণাৎ সমবেত জনতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল, শ্রেণী-পার্থক্য ভুলে সকলেই একটি অখণ্ড জনতায় পরিণত হয়ে পকেটমারকে শাস্তি দিতে শুরু করল। আপন অর্থনীতি, সংস্কার-বিশ্বাস ও সামাজিক সংহতির বাইরে, লোক-সাংবাদিকতা তাদৃশ কাজ করে না, তা তার লক্ষও নয়। কাজ করে না বলেই, লোকসমাজের সংহতি আরো বেশি করে প্রমাণিত হয়।

লোকসাহিত্যের লক্ষ-উদ্দেশ্য এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দুটি সমান্তরাল ধারার সন্ধান মেলে। একটি আনুষ্ঠানিক, অপরটি অনানুষ্ঠানিক। আনুষ্ঠানিক লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ-রীতিতে প্রাধান্য পায় Narration ও Description, তা নিতান্তই Objective, সাহিত্যমূল্য এখানে প্রায় কিছুই নেই। আর লোকসাহিত্যের যে দিকটি অনানুষ্ঠানিক ও Recreational, তার মধ্যে থাকে সাহিত্যিক দিক, সাংকেতিকতা, প্রতীকতা। ক্বচিৎ প্রথম দিকের মধ্যেও সাঙ্কেতিকতা-প্রতীকতার দিকটি ধরা পড়ে। দুটি দিকের মধ্যেই লোকমনস্তত্ত্ব (Folk-psychology) ধরা পড়ে। দুটি দিক মিলিয়েই পূর্ণরূপে লোকসমাজকে উপলব্ধি করা যায়। এই বিবরণ-বিবৃতির দিকটির সঙ্গেই সাংবাদিকতার দিকটি জড়িত।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নানা বিশ্বাসের বাঁধনে এক-একটি লোক-গোষ্ঠী আপন-আপন সীমার মধ্যে সংহত থাকে ; সেই সংহতিকে রক্ষা করবার জন্যে একই মনোভাবের প্রয়োজন, যে মনোভাবের একত্ব ওই গোষ্ঠীকে নিজ সীমায় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রাখবে। মনোভাবের একত্ব প্রচারের জন্যেই নিজগোষ্ঠীর জনের মধ্যে সংযোগ চাই। এই জন্যে নিজ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার কঠোর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গেই এই 'জনসংযোগের' গভীরতর ভূমিকা আছে। লোকগোষ্ঠীর এক-একটি উৎসব অনুষ্ঠান-পার্বণেরও কালক্রমে দুটি করে 'মাত্রা' (Dimension) এসে গেছে। প্রায় প্রতিটি পার্বণের একটি দিক তার 'আনুষ্ঠানিক' দিক ; আর একটি তার বিনোদনের দিক বা অনানুষ্ঠানিক দিক। আনুষ্ঠানিক দিকটি কঠোর ভাবে জনসংযোগের,—অনানুষ্ঠানিক দিকটি শিথিল বা পরোক্ষ ভাবে।

সংহতির জন্যেই সংযোগের যে কথাটি বললাম, তা লোকগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস এবং এমন কি ঘরবাড়ী নির্মাণ (Ecology) পদ্ধতির মধ্যে ধরা পড়ে। এক-একটি লোকগোষ্ঠী এক-একটি 'পাড়া' রচনা করে ; তাদের বাড়ীগুলো পরস্পরের

সন্নিহিত, কোনো ক্ষেত্রে গোটা পাড়াটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে রচিত, কখনো বা সরল রৈখিক ভঙ্গিতে। অর্থনৈতিক বা অন্য কারণে একটি গোষ্ঠী গ্রামান্তরে গেলে একজন মোড়ল বা নায়কের অধীনে সমবেত ভাবে বার্ষিক পূজা নিবেদন করে। এক একটি গ্রামে একাধিক লোকগোষ্ঠী থাকে, ফলে তাদের নিজ নিজ দেবতার উদ্দেশে বার্ষিক পূজা নিবেদনের তারিখ ও তিথি ভিন্ন। গ্রামে মহামারী দেখা দিলে এক-একটি গোষ্ঠী সমবেত ভাবে পূজা দেয়। বৃষ্টি-আবাহনের প্রার্থনাও সমবেত রূপে। একজনের দোষ বা ভুলের জন্যে গোষ্ঠীর সকলের অমঙ্গলের আশঙ্কা করা হয়।

শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারে ও প্রভাবে, নাগরিক জীবনের ও নানা বিচিত্র অর্থনৈতিক কারণের প্রতিফলনে, লোকগোষ্ঠীর এই সংবদ্ধতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে এসেছে। যে মানুষ আজ শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী, কিংবা কলকারখানার শ্রমিক, একদা সে যে কৃষিজীবী মানুষই ছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই সব মানুষ সেই সংস্কারকে ভুলে যায় নি বলে এখনো তাদের মধ্যে পূর্বের মনস্তত্ত্ব কাজ করে যায়। কাজেই লোক-মনতত্ব এসব ক্ষেত্রে সঞ্জীবিতই আছে। দ্বিতীয়ত, আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণ 'লোক' (Folk) বলতে গ্রামের মানুষ বা নিরক্ষর মানুষকে বোঝেন না। কোনো বিশেষ মানবিকতা ও জীবনাদর্শে যখনই কিছু মানুষ একটি সংহতির আওতায় এসে পড়ে, তখনই তারা একটি 'লোক' (Folk) হয়ে যায়। এই অর্থে একদল ট্রেনের নিত্যযাত্রী, একদল কেরানী, বা একদল রিক্সাচালক এক একটি 'Folk' বা 'লোক'। এই 'লোকের'ও নিজেদের মধ্যে ও পরস্পরের মধ্যে সংযোগ নাই,সেজন্যেও নানা মাধ্যমের ভূমিকা আছে।

এই নিবন্ধে 'লোক' বলতে আমি তাই একদিকে বিভিন্ন Ethnic group of people, অপরদিকে আধুনিক নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে নিত্যযাত্রী-কেরাণী-রিক্সাচালক প্রভৃতিকেও বুঝিয়েছি। এই দু-ধরনের 'লোকে'র সাংবাদিকতা ও জনসংযোগের দিকটিই আমার আলোচনার লক্ষ্য।

২

লোক-সাংবাদিকার কটি বিশিষ্ট মাধ্যম আছে। গান, নাটক, ছড়া,—সবই এর মধ্যে পড়ে। সেগুলিকে এইভাবে বিন্যস্ত করা যায়: ১ সঙ: সরব ও নীরব; আভিনয়িক ও অনাভিনয়িক; জড় ও জীবন্ত; স্থির ও চলমান। ২. মেলায়, গাজনতলায়, রথতলায়, পথের ধারে, কিংবা লেটোর আসরে, কিংবা হাটে-বাজারে, কিংবা বিশেষ অনুষ্ঠানে(যেমন নৌকা-বাইচের কালে বা বিজয়াদশমীর দিন বা বিবাহের অনুষ্ঠানে) যে পূর্ব-পরিকল্পিত বা বিনা রিহার্সেলে অভিনয় হয় সামাজিক পোশাকে

বা বিভূত বেশে। ৩. মধ্যযুগীয় আখ্যান-উপাখ্যানের গীতিময় পরিবেশনের আসরে, ক্ষণকালের জন্যে Interlude হিসেবে যে হাসি-রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের অভিনয় হয়। ৪. কবি-তরজা-পাঁচালি গানের আসরে যে 'বাঁধা-ছড়া' ও 'আ-বাঁধা ছড়া' গাওয়া-বলা হয়। ৫. গান-ছড়া রচনা ও গাওয়াই যাদের পেশা সেই পল্লীকবি, চারণকবি ও ভট্টকবির রচনাবলী। এঁরাই অনেক সময় Martyrology অর্থাৎ শহীদ-কাহিনী ও শহীদ-গীতি রচনা করেন ও গ্রামে-গ্রামান্তরে গেয়ে বেড়ান। নানা রকমের Hero-tale ও এঁরা বলে থাকেন। ৬. যে সব আনুষ্ঠানিক গানের মধ্যেই সমসাময়িক ঘটনার প্রত্যক্ষ ছাপ পড়ে, সেগুলি : মেছেনী, চোরচুন্নী, গম্ভীরা, বোলান, ভাদু, টুসু (তুষু) প্রভৃতি।

এইসব মাধ্যমগুলি উদ্‌যাপনের তারিখ-তিথি এবং পদ্ধতিগুলি লক্ষ্য করলে দুটি তথ্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে : ১. সেইসব তারিখ-তিথি বেছে নেওয়া হয়, যেগুলিতে সেই-সেই লোকগোষ্ঠীর বছরের শেষ বা শুরুর দিক; কিংবা অনুষ্ঠানের গুরুত্বের জন্যে তা 'বিশেষ' একটি দিন; ২. পথ, গ্রাম ও গৃহস্থের গৃহাঙ্গন-পরিক্রমা ও পরিভ্রমণ, অথবা সমবেত জনতার উপস্থিতির সুযোগ-গ্রহণ পদ্ধতির দিক থেকে লক্ষণীয়। শোভাযাত্রা করে বা দলবদ্ধভাবে পথ-পরিক্রমা, সমবেতভাবে গ্রাম-পরিক্রমা (সকাল বা সন্ধ্যায়) এরই অঙ্গীভূত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার দেবতা বা গ্রামদেবতাকে দেবালয় থেকে বের করে শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম-পরিক্রমা করানো হয়। পূর্ববঙ্গে একে বলে ঠাকুরে 'গস্তে' (আরবী 'গস্ত' = ভ্রমণ) যাওয়া। রথযাত্রা এবং উল্টোরথ এরই প্রসারিত দিক।

উল্লিখিত বিষয় দুটি পর্যালোচনা করলেই এর অন্তর্নিহিত কারণটি স্বচ্ছ হয়ে আসে। বছরের শেষ বা শুরু বা বিশেষ দিন বেছে নেওয়া হয় এই কারণে যে, সেদিন গোষ্ঠীর তাবৎ মানুষের কাছে 'সাল-তামামী' বা Annual report দাখিল করা হয়। গত এক বছরে কি কি ঘটনা-দুর্ঘটনা, অনাচার-অবিচার ঘটে গেছে, গোষ্ঠীর মানুষের কাছে তাই নিতান্ত বাস্তব পন্থায় উপস্থিত করা। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মালদহে যে গম্ভীরা গানের আয়োজন করা হয়, তাতে শিব-পার্বতীকে সভাপতি-সভানেত্রী রূপে মনে করে, তবেই সে 'সালতামামী' করা হয়। বিধানসভায় বা লোকসভায় যেমন সব বক্তব্যই অধ্যক্ষকে সম্বোধন করে বলা হয়, গম্ভীরা গানেও তেমনি সবই 'শিব হে' বলে শিবকে সম্বোধন করে বলা হয়। চোরচুন্নী, মেছেনী, ভাদু, টুসু, সবগুলিতেই দেখা যায়, বছরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, নৈসর্গিক বাস্তব ঘটনাগুলিই বিষয়বস্তু রূপে গৃহীত হচ্ছে। মানুষকে সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। মানুষ যাতে এই

সংবাদগুলি শুনে অভীষ্ট পথে প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। টুসু-গানের জনৈক সঙ্কলক লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দুজনে মিলে যখন বাঙলা-বিহার সংযুক্তিকরণের কথা ভাবছিলেন, তখন মানভূম-পুরুলিয়া জেলায় টুসু গানই ছিল এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের একটি বিশেষ উপায়। সেখানকার মানুষ তার ফলে অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। লোকসাহিত্যের একটি Function-ও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

বছরের শেষ বা শুরু বা বিশেষ দিনে গত এক বছরের জানা ঘটনা ও সংবাদের কেবল উপস্থাপনই করা হয় না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনাচারের প্রতিবাদে 'Folk-trial' পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি সর্বাংশে Mock parliament-এর সঙ্গে তুলনীয়। প্রান্ত-উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে দোলের দিন এই Folk trial হয়। যেসব মানুষ গত এক বছরে নৈতিক বা সামাজিক অন্যায় অপরাধ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে রীতি-মত রাজসভার অনুকরণে বিচারসভা বসানো হয় ও বিচার করা হয়। এই বিচারের সময়, যে ব্যক্তি মন্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, সে সভা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে গত এক বছরের সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনার তালিকা তুলে ধরে, নিতান্ত একজন সাংবাদিকের মতোই। রাজা ধৈর্য ধরে সব ঘটনা শুনে, তার মধ্যে বিচারযোগ্য বিষয় ও প্রসঙ্গগুলি বেছে নেয়। এই বিচার সভায় গ্রামের সকলেই উপস্থিত থাকে।

সাংবাদিকতার প্রত্যক্ষতা আরো বেশি করে পাই, যেখানে Impromptu অর্থাৎ তখন-তখনি সংবাদ রচনা করে জনতার কাছে পরিবেশন করা হয়। কবি তরজা পাঁচালিতে, বিশেষ করে আবার তরজাতে, দুরকমের ছড়া দেখা যায়; বাঁধা আর আ-বাঁধা ছড়া। 'বাঁধা ছড়া' মানে আগের থেকে তৈরি-করা মহড়া-দেওয়া ছড়া। সাংবাদিকতা তাতেও থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষতা তাতে নেই। তা থাকে 'আ-বাঁধা ছড়ায়' আসরেই দাঁড়িয়ে যা বাঁধতে হয়। এখানে কেবল প্রতিপক্ষই নয়, আসরের দর্শক, আসরের বৈশিষ্ট্য, আদর-আপ্যায়ন—ইত্যাদি বিষয়েও, সংবাদ রূপে, ছড়া গাঁথা হয়। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত গোবরা গ্রামে, বিজয়া-দশমীর দিন, উপস্থিত জনতা, গ্রামবাসী ইত্যাদিকে অবলম্বন করে তৎক্ষণাৎ ছড়া ও গান রচিত হত। ২৪ পরগণার কোনো কোনো অঞ্চলে, মেদিনপুরের 'ভাঁড় নাচে', লোকনাট্য ও আখ্যান গীতির মধ্যেও আকস্মিকভাবে সমকালীন সংবাদ পরিবেশন করা হয় রঙ্গ-কৌতুক সৃষ্টির জন্যে। ২৪ পরগণার বহড়ু গ্রাম থেকে পাওয়া একটি লোকনাট্যে দেখা যাচ্ছে, লোকনাট্যটির অভিনয়কালেই, একজন হঠাৎ করে প্রবেশ করে কিছু সংবাদ দিয়ে গেল,—রঙ্গ-কৌতুক সৃষ্টির জন্যে। পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া একটি রামায়ণ-ভিত্তিক

নাটকে দেখা যাচ্ছে, রাবণের অত্যাচার বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ আয়ুব খাঁর কথা এসে গেল,—রাবণ ও আয়ুব খাঁর সমীকরণ ঘটে গেল। সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবির পালা গান বা পীরের গান বা মঙ্গল গানের ফাঁকে ফাঁকে এমনি টিপ্পনী হিসেবে সমকালীন সংবাদ গেঁথে দেওয়া হয়।

এইসব সংবাদ-তথ্য প্রচারিত-পরিবেশিত হয় সমবেত মানুষের কাছে, আসরে বসে বা দাঁড়িয়ে। কিন্তু এর চেয়েও যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল—গৃহস্থের অঙ্গনে গিয়ে, গ্রামের পথ পরিক্রমা করে যে সব বার্ষিক সংবাদ প্রচারিত হয়, সেগুলি। যেমন, সঙ। কোনো অত্যাচারী বা অনাচারীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবার জন্য তার 'সঙ' বের করা হয়। বলা হয়, এটি 'অমুকের সঙ'। কখনো বা শোলা বা মাটির মূর্তি তৈরি করা হয়, গোরুর গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে গ্রাম ঘোরানো হয়। বর্ধমান জেলার কুড়মুন গ্রামে একেই বলে 'থাকা'। কলকাতার জেলেপাড়ার ও কাঁসারীপাড়ার সঙ একসময়ে বিখ্যাত ছিল। সঙেরা অভিনয়ও করত কখনো-সখনো, ছড়া বা গান গাইত, কখনো বা নীরব থাকত। পৌরাণিক চরিত্র যেমন সঙের মাধ্যমে প্রদর্শিত হত, তেমনি সামাজিক ও লৌকিক চরিত্রও।

জলপাইগুড়ি জেলার 'চোরচুন্নী'র গান এবং নদীয়া-মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের 'বোলান' এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বোলান' মানে চলন, ভ্রমণ; এটি হিন্দী এবং মধ্যযুগীয় বাঙলায় দেখা যায়, ডঃ সুকুমার সেনের মতে এটি 'বুলা' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। শব্দটি কলকাতার মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। প্রাইভেট বাসের কণ্ডক্টারেরা ড্রাইভারের উদ্দেশে গাড়ী ছাড়বার জন্যে বলে, 'বোল্-বোল্', অর্থাৎ 'চল্-চল্'। 'বোলান্' গানে কেবল দল বেঁধে গ্রামদেবতার 'থানে' অভিনয় নয়, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের 'থানে' গিয়ে বা খেতে-খেতেও অভিনয় হয় এবং তাতেও সমসাময়িক সংবাদ ধরা পড়ে। পশ্চিম রাঢ়ের 'টাঁড় ঝুমুর' (টাঁড়=পাড়া। যে ঝুমুর গান পাড়া বেড়িয়ে গাওয়া হয়) এবং জলপাইগুড়ি 'ঢাণ্ডি' গান (হিন্দী ঢুড়=খোঁজা, খুঁজে বেড়ানো) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজকের দিনের শহরে অনেক মাধ্যমেরই নেপথ্যে আছে লোকজীবনের সংবাদ পরিবেশনের কয়েকটি মাধ্যম। কোনো-কোনো প্রতিভাবান্ নাট্যকার আজকের দিনে যে 'তৃতীয় মাত্রিক' নাটকের অন্বেষণ করছেন, ইতিহাসের দিকে তাকালে তাকে নতুন কিছুই মনে হয় না। মেলায়, গাজনের থানে, হাটের দিনে, এখনও যে সব তাৎক্ষণিক নাটক রচিত হয়, তারই একটি দিক উল্লিখিত 'তৃতীয় মাত্রিক' নাটক। তেমনি Mock Parliament আসলে Folk trial। গম্ভীরা গানে শিবকে সম্বোধন

করা বিধানসভা-লোকসভার অধ্যক্ষকে সম্বোধন করা। সাধারণ নির্বাচনের সময় 'ভোটের ছড়া'র কলকাতার সর্বাঙ্গ ছেয়ে যায়, যে ছড়া সংবাদ-পরিবেশনের এক বড়ো দিক।

সাংবাদিকতা ও জনসংযোগের যে মাধ্যমগুলি বিভিন্ন Ethnic group-এর মানুষদের মধ্যে চলিত আছে, বিভিন্ন Folk-গণও সেই মাধ্যমগুলি গ্রহণ করে থাকেন।

৩

লোক-সাংবাদিকতার কিছু নিদর্শন এইখানে উপস্থিত করা অবশ্যই একটি কর্তব্য ছিল, সে ক্রটি স্বীকার করে নিচ্ছি। তবে যাঁরাই লোক-সাহিত্য সম্পর্কে কিছুমাত্র খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁদের কাছে ব্যাপারটি এতই পরিচিত যে উদাহরণ সেখানে অনাবশ্যক হয়ে যাবে।

বরং লোক-সাহিত্যের রচনাভঙ্গির মধ্যেই এই জনসংযোগের দিকটি কেমন সহজে লুকিয়ে থাকে, তারই অন্বেষণ করি।

জনসংযোগের প্রথম শর্ত হল, একটি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ, নইলে সংবাদের পরিসর সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়, বিকৃতিও এসে যেতে পারে। আগে লোক-সাহিত্যের দুটি সমান্তরাল রচনারীতির উল্লেখ করেছি। পাঠককে এখন তা স্মরণে আনতে বলি। উল্লিখিত দুটি রচনারীতির মধ্যে একটি হল Narrative ও Descriptive দিক, বস্তুনিষ্ঠতাই যার মধ্যে প্রধান দিক। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, লোক সাহিত্য হল Symmetrical, শিষ্ট বা মার্জিত সাহিত্য সেখানে A-Symmtrical বা Harmonical। এই Symmetrical দিকগুলি জ্যামিতিক প্যাটার্নের মতো, যেন তার একটি Tangible বা স্পর্শযোগ্য দিক আছে, এবং সে কারণেই তা অপরের কাছে হস্তান্তরিত করা যায়। লোক-সাহিত্যের Binarism-ও এই জনসংযোগের পরিপোষক। যেন দুটি দিক মিশিয়ে একটি যুগ্মকরূপে, গ্রহণকারীর কাছে সহজগ্রাহ্য করে তোলা। লোকসাহিত্যের রচনারীতির আর দুটি দিক হল—Word communication এবং Repetition। বাঙলায় বলা যায় 'শব্দ-সংযোগ' এবং 'পুনরাবৃত্তি'। ছড়ায়-ধাঁধায়-গানে যে অনুপ্রাস দেখা যায়, তাতে এই দুটি দিকই একসঙ্গে ধরা পড়ে। লোক-সাহিত্যের রচনারীতিতে অনেক সময়েই দেখা যায়, পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তি বা বাক্যের শেষ শব্দ পরবর্তী বাক্য বা পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দে পরিণত হচ্ছে, এইভাবে শব্দ-সংযোগ সাধিত হয়। 'পুনরাবৃত্তি'কে কেউ-কেউ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন,—মনে রাখবার সুবিধের জন্যেই তা করা। আমাদের মনে হয়, এর মধ্যেও জনসংযোগের দিকটি আছে।

লোক-সাহিত্যের রচনারীতিকে যে জনসংযোগের পটভূমিকায় অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা যায়, এটাই এই প্রসঙ্গে খুব একটা বড়ো কথা। লোক-সাহিত্যের বিষয়ের মধ্যে সংবাদ এবং এর রচনাভঙ্গির মধ্যে জনসংযোগ এইভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

কথকতা ঃ কমিউনিকেশানের একটি মাধ্যম

অরুণকুমার বসু

গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নামক সুপরিচিত নাটকে কামতাড়িত লম্পট ব্রাহ্মণ বিল্বমঙ্গলের রূপমোহ কেমন করে ঊর্ধ্বায়িত হয়ে কৃষ্ণাভিমুখী হল, তার নাট্যবিবরণে বারবণিতা চিন্তামণির একটি উক্তির ভূমিকাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কেবল মাত্র চিন্তামণির প্রতি অন্ধ আকর্ষণে বিল্বমঙ্গল ঘোর অন্ধকার দুর্যোগে পচা মৃত শব অবলম্বনে নদী পার হয়েছে, সাপের ল্যাজকে দড়ি মনে করে পাঁচিল বেয়ে উঠেছে, এই সব ভয়াবহ অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে চিন্তামণি শিউরে উঠেছিল। বলেছিল, "এই মন, আমি বেশ্যা—যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে—তোমার কাজ হত।" উক্তিটি খুবই উদ্দেশ্যমূলক এবং চিন্তামণির মতো অশিক্ষিত ও হীনবৃত্তি নারীর মুখে স্বভাবসংগত কিনা এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রও নিশ্চয় অবহিত ছিলেন। তাই উক্তিটি মন দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, গিরিশচন্দ্র এই বাক্যটি রচনা ও প্রচারের দায়িত্ব সর্বাংশে চিন্তামণির উপর আরোপ করেননি। চিন্তামণির পুরো সংলাপটি এখানে স্মরণ করছি—

চিন্তামণি। [কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া] এ কি!—এ যে পচা মড়া! দেখ, আর আমার অবিশ্বাস নেই! তুমি সত্যই উন্মাদ!—তোমার ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই, ভয় নেই, তুমি দড়ি বলে সাপ ধর, কাঠ বলে পচা মড়া ধর! দেখ, আমি **একদিন কথা শুনতে গিয়েছিলুম,** আমার আজ কথাটি মনে পড়ল। এই মন, আমি বেশ্যা—যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে—তোমার কাজ হত! তোমায় আর অধিক কী বলব!"

বড় হরফের বাক্যটির দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে, চিন্তামণির কোনো কথকতা শোনার পূর্বতন স্মৃতিই তাকে এই নতুন বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাকে একটি বিশেষ লক্ষ্য ও তাৎপর্যের সূত্রে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। 'একদিন কথা শুনতে গিয়েছিলুম'— এইভাবে ব্যাপারটিকে বিন্যস্ত করে গিরিশচন্দ্র যেমন নিপুণ নাট্যবিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি কথকতার কমিউনিকেশনশক্তি যে কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমাদের দেশের পপুলার মাস-কমিউনিকেশানের আলোচনায় তাই কথকতার প্রসঙ্গটি অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। কথকতা একটি মৌখিক বাক্‌শিল্প বা ভার্বাল আর্ট (১৯৬৮ সালে 'ইণ্টার ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোশাল সায়ান্সে'

অধ্যাপক উইলিয়াম ব্যাসকম কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত)। দীর্ঘকাল এই শিল্পটি ছিল এদেশে গণসংযোগ তথা মাস-কমিউনিকেশানের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি ছিল এক শ্রেণীর মানুষের বিশিষ্ট বৃত্তি। এই বৃত্তিটি ছিল পাঠ, আবৃত্তি, সংগীত ও কিঞ্চিৎ অভিনয়ের বিচিত্র মিশ্রণ। প্রধানত পুরাণ ও ভাগবত কাহিনীই কথকতার মাধ্যমে পরিবেশিত হত। কথকতা হত সন্ধেবেলায়, যাত্রা-পাঁচালির মতো আসবে, অশিক্ষিত জনসাধারণ কয়েক ঘন্টা ধরে এবং প্রায় দিনের পর দিন কথক ঠাকুরের কথকতা শুনত। এই লৌকিক পরিবেশন শিল্পটি হত গ্রামাঞ্চলে বা আধা-শহরে। জমিদার বা বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতায়, মন্দিরে নাটমন্দিরে, চণ্ডীমণ্ডপে বা অনুরূপ স্থানে। হয়ত গ্রামাঞ্চলে স্থানবিশেষে এই শিল্পরূপটি আজও টিকে আছে মুষ্টিমেয় অনুশীলনকারীর উপজীবিকায়—কিন্তু মাস-কমিউনিকেশানের অন্যান্য ধারা ও মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান প্রসারে ও সামাজিক অর্থনৈতিক নানা কারণে এই বিশিষ্ট শিল্পরীতি কোনো উৎকর্ষের আদর্শ না পেয়ে ক্রমশ অনাদৃত হয়ে গেছে। পথের পাঁচালির অপুর পিতা হরিহর কথকতার মাধ্যমে জীবন ধারণের জন্য যে নিদারুণ ক্লিষ্ট সংগ্রাম করে গেছে, তার কথা স্বভাবতই আমাদের মনে পড়বে। পাঁচালি-তর্জা-কথকতা বর্তমানে যাত্রার মতো শহুরে পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

কথকতার পূর্বসূত্র সন্ধান করা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়, কারণ মৌখিক বাক্‌শিল্প বলেই তার কোনো রেকর্ড সংরক্ষিত হয়নি। এই ব্যাপারে একমাত্র সম্ভাব্য নির্দেশ পাওয়া যায় বিশ্বকোষে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর এবং ভারতকোষে শ্রীসুকুমার সেন-প্রদত্ত বিবরণ থেকে। বিশ্বকোষ মতে, কথক শব্দের অর্থ 'বক্তা' এবং 'গ্রন্থকর্তা' ছাড়া আরও দুটি—'যাহারা পৌরাণিক কথা কহিয়া জীবিকা নির্বাহ করে' এবং 'নাটকের বর্ণনাকারী'। সংস্কৃতে 'একনট' বা 'কথাপ্রাণ' এরই প্রতিশব্দ। কথকতা বলতে বাক্যালাপ ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা বোঝালেও বিশিষ্ট ব্যবহারে তার যে বৃত্তিগত সম্প্রসারণ ঘটেছে তার বিবরণ নিতান্ত প্রাচীন নয়। এই সম্পর্কে বিশ্বকোষের আলোচনাটি তুলে দিচ্ছি: "কথকতা বলিলে এদেশে কথক-কর্তৃক পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানাদি বর্ণনা বুঝাইয়া থাকে।

কথকতা পাঠ (পারায়ণ) হইতে বিভিন্ন। পাঠকার্য প্রাতঃকালে কর্তব্য। কিন্তু কথকতা বৈকালে হইয়া থাকে।

কথকতা সৃষ্টি হইবার কারণ কী? এদেশের জনসাধারণ প্রায়ই প্রাতঃকালে নানাকার্যে ব্যস্ত থাকে, বিশেষত সংস্কৃত ভাষায় পাঠ হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বোধগম্য হয় না। কিন্তু কথকতা তেমন নয়; ইহাতে আড়ম্বর চাই, বিলক্ষণ

সংগীতাবিদ্যা জানা চাই, বিশেষত লোকের সহজেই মনস্তুষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কথকতা দেশীয় সরল ভাষায় হইয়া থাকে ; সুতরাং সহজেই সাধারণের ভালো লাগে। মিষ্ট কথায় সাধারণকে ধর্মোপদেশ দিবার পক্ষে ইহা এক সহজ উপায়। যে-কোনো শ্রেণীর লোক হউক না কেন, কথকতা সকলেরই প্রিয়। কথকের তেমন গুণ থাকিলে সাধারণে সহজেই আকৃষ্ট হয়।"

কমিউনিকেশানের দিক থেকে কথকতার গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার কথাই এখানে বলা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন কথকতার প্রাচীন সূত্রসন্ধান করে যে সব তথ্য উদ্ধার করেছেন, সেও কিন্তু প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। পুরাণ পাঠ, যন্ত্রযোগে কাহিনী গান করার প্রথার বৈদিক উৎস নির্ণয় করে তিনি দেখিয়েছেন যে কথকতা মূলত একটি প্রাচীন শিল্পবৃত্তি। পতঞ্জলির কালে কথকের নাম ছিল 'গ্রন্থিক'। এমন কি বৈদিক যুগে অনুরূপ বৃত্তিধারীকে 'বীণাগাথী'ও বলা হত। পালবংশের শেষ রাজা মদনপালদেবের পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাকে নিয়মিতভাবে মহাভারত পড়িয়ে শোনাবার জন্য রাজসভায় যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, তিনি আসলে কথক ঠাকুরই। বাণভট্টের হর্ষচরিতে রাজসভায় পুস্তক বাচক-এর উল্লেখ আছে। চতুর্দশ শতাব্দীর মৈথিল কবিপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর তাঁর কথকতার কড়চা 'বর্ণরত্নাকর'-এ রাজপাদোপজীবীদের মধ্যে গায়ন, বংশগায়ন, বীণাগায়ন, নট, নর্তক ইত্যাদির সঙ্গে কথক শব্দটিরও উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক সেনের মতে, "কথক পুরাণ কাহিনী বলেন, পুরাণ পাঠ করেন, শ্লোক আওড়াইয়া গান করিয়া নটের মতো হাত ঘুরাইয়া (কিন্তু বসিয়া বসিয়া) ধর্মকথা বলেন। এ বৃত্তি ব্রাহ্মণের ; তিনি শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন, সুকণ্ঠ হইবেন, গীতজ্ঞ হইবেন।" তাঁর আলোচনা থেকে আরো জানা যায়, ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোচবিহার রাজসভায় পাঠকেরা সম্মানিত সভাসদ ছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সভায়ও বৃত্তিভোগী পাঠক ছিলেন। তবে কথকরা হয়ত পাঠকদের মতো সকলেই বৃত্তিভোগী রাজসভাসদ ছিলেন না।

কথকতার ইতিহাস যত প্রাচীনই হোক, বাংলা দেশে প্রচলিত কথকতার রূপরীতি গড়ে উঠেছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ-শতাব্দীতে—সম্ভবত খেতুরী মহোৎসবে কীর্তনের প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তার পর কথকতা শিল্পটিও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। কারণ কথকতার সংগীতাংশে কীর্তনের সুরই প্রবল। আর এই কীর্তন-সুরপ্রধান কথকতার দ্বারা পাঁচালি নামক গীতরীতিটিও অষ্টদশ শতাব্দীতে নতুন করে জনপ্রিয় হতে থাকে। কথকতার শাস্ত্রীয় অংশই কবিসংগীতের মধ্যে অংশত শিথিলভাবে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ জনপ্রিয় আখরযুক্ত গরানহাটী পালাকীর্তন, মনোহর-

শাহী কীর্তন, যাত্রা-পাঁচালি-কবিগান প্রভৃতি লৌকিক গীতরীতির দ্বারা ও গীতরীতিগুলির সঙ্গে কথকতা নামক লৌকিক বাক্‌শিল্পটি গভীরভাবে প্রভাবিত ও সম্পৃক্ত। এই গীতরীতির বিশেষত্ব সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু যতখানি তথ্যসংগ্রহ করেছেন, পরবর্তী বিস্তারিত গবেষণার জন্য তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নগেন্দ্রনাথের বিশ্বকোষে পাই—

"এখন বঙ্গদেশে যে প্রণালীতে কথকতা হইয়া থাকে, দুই ব্যক্তি তাহার প্রবর্ত্তক, সেই দুইজনের নাম গদাধর ও রামধন শিরোমণি। গদাধর শিরোমণি বর্ধমান জেলাস্থ সোনামুখী গ্রামে বাস করিতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা তাঁহার শিষ্য অথবা প্রশিষ্য, সকলেই প্রায় তাঁহার রচিত 'সাট' অনুসারে কথকতা করিতেন।

রামধন গোবরডাঙা নিবাসী, তাঁহার অনেকগুলি খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণী বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। ধরণীর কণ্ঠ অতি মধুর, তিনি সংগীতবিদ্যাও তেমনি জানিতেন, কাজেই যিনি একবার তাঁহার কথকতা শুনিয়াছেন, তিনি আর ইহজন্মে তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। ধরণীর কতকগুলি শিষ্য এখনো জীবিত আছেন। কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থানের কথকেরা রামধনের সাট অবলম্বন করিয়া কথকতা করিয়া থাকেন।"

নগেন্দ্রনাথ এইসকল তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, তার উৎস নির্দেশ করেননি। কিন্তু কথকদের 'সাট' বা স্টাইল সম্পর্কে তিনি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্যসংগ্রহ করে গেছেন। তা থেকে আমরা জানতে পারি—

"কথকতার 'সাট'কে চূর্ণী বলে। চূর্ণীতে মধ্যে মধ্যে কথকের আবশ্যকীয় কতকগুলি সংকেত থাকে, যথা-ভী-উ = ভীষ্ম উবাচ ইত্যাদি। চূর্ণীর মধ্যে যে সকল কথা থাকে, তাহাকে চূর্ণক কহে। চূর্ণী ছাড়া কথককে রাত্রি বর্ণনা, মধ্যাহ্ন বর্ণনা, গ্রীষ্মবর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, দেশবর্ণনা, বেশ্যাবর্ণনা প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়। বর্ণনার স্বতন্ত্র পুঁথিও থাকে। এই সকল বর্ণনায় অনুপ্রাসের আড়ম্বরই অধিক। কথকতাকালে আবশ্যক মতো বর্ণনা প্রয়োগ করিতে হয়।"

কথকতার রিচুয়াল সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন যে, কথকতা আরম্ভের পূর্বে বেদীতে শালগ্রামশিলা স্থাপন করতে হয়, তারপর কথক সেই বেদীতে 'উপবিষ্ট' হয়ে মঙ্গলাচরণ করেন। সংস্কৃত-বাংলামিশ্রিত এই মঙ্গলোচ্চারণের সঙ্গে আবশ্যিক সুরবদ্ধ গানও থাকে। এরপর কথকতার বক্ষ্যমান বিষয়টি উপস্থাপিত করে কথক মহাশয় শ্রোতৃচিত্ত ক্রমশ সেদিকে অভিনিবিষ্ট করেন। কমিউনিকেশানের ব্যাকরণ অনুযায়ী কথকতা একক ব্যক্তির পরিবেশনযোগ্য হলেও বস্তুত এটি যৌগিক শিল্প—অর্থাৎ আবৃত্তি, পাঠ-ব্যাখ্যান,

গীত ও বাচনিক অভিব্যক্তি তথা হস্তমুদ্রার পরিমিত প্রয়োগ প্রয়োজন। স্মৃতিনির্ভরতা ও সুরজ্ঞতা কথকের দুটি প্রধান গুণ, কারণ কথকতায় সংগীত-পরিবেশনকালে সর্বদা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় না। সংগীত ও আবৃত্তিই কথকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান, অর্থাৎ কথকতার কেন্দ্র হল ধর্মপ্রসঙ্গ, উৎস চরিত্রবান সদাশয় সদ্‌বিপ্র, এবং সঞ্চার-মাধ্যম কণ্ঠ। কথকতায় জনশিক্ষার ভূমিকাই সর্বাধিক। পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে নীতিশিক্ষাপ্রদান, গণরুচির উৎকর্ষসাধন, সততা ও চরিত্রশুদ্ধির পরাকাষ্ঠা স্থাপন করাই ছিল এই মৌখিক শিল্পের প্রবল অভিপ্রায়। তার সঙ্গে অবশ্যই লোকরঞ্জন বৃত্তি যুক্ত ছিল। সুললিত কণ্ঠের পাঠ, সুমিষ্ট শ্রোতৃলোভন গীতকণ্ঠ দুয়ের সাযুজ্যে সাধারণ শ্রোতা মুগ্ধ ও তন্ময় হয়ে যেত। এই রম্যবৃত্তির মধ্য দিয়েই কমিউনিকেশানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধিত হত।

কথকতাশিল্প লুপ্তপ্রায় হয়ে গেল কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুরূহ নয়। কথকতা যেহেতু আবৃত্তি ও সংগীতের যুগ্মরূপ, সেজন্য উপযুক্ত কণ্ঠসাধনার অভাব, স্মৃতিশক্তির ন্যূনতা, পুরাণপাঠের প্রতি অনাগ্রহ এই বৃত্তিকে আর পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকারে পরিণত করেনি। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষ্ণুপুর দ্বিতীয় দিল্লী' (১৩৪৮) গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের সংগীত-সাধকদের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণুপুরের বহু প্রসিদ্ধ কথকের পুত্রপৌত্রাদি কৌলিক কথকতা বৃত্তি ত্যাগ করে কেবল কণ্ঠসংগীতের উৎকর্ষে খ্যাতনামা হয়েছেন। উনিশ শতকের স্বনামখ্যাত কবিওয়ালা শ্রীধর কথকের পদবীটুকু তাঁর পূর্বতন বৃত্তির স্মারক মাত্র, কিন্তু সংগীত-পরিবেশনেই তিনি কৃতবিদ্য হয়েছেন, কথকরূপে নয়।

অন্যদিকে ইংরাজিশিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রসার, জনশিক্ষার পদ্ধতিপরিবর্তন, মুদ্রিত গ্রন্থের চাহিদাবৃদ্ধি, যোগাযোগের সুব্যবস্থা, এসব কারণেও কথকতাশিল্পের সমাদর কমে গেছে। কথকতার আবেদন মুখ্যত অশিক্ষিত শ্রোতার চিত্তে। কারণ কথকতা মুখ্যত ব্যাখ্যানমূলক বিদ্যা। এর নান্দনিক আবেদনের চেয়ে নৈতিক আবেদনই বেশি। তাই একে বলা যেতে পারে **one sided presentation**। কেবল কথকই তাঁর নিজস্ব নীতিগত মানদণ্ডে পুরাণপ্রসঙ্গকে শ্রোতার কাছে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপিত করে থাকেন। তাই সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়—

Persons with low intellectual ability and with relatively little education tend to be more influenced if the communication contains a one-sided presentation, limited solely to the argument favovring the communicator's conclusion ; whereas, better-educated persons

with high intellectual ablity tend to be more influenced if the communication contains a two-sided presentation that includes at least a small amount of discussion of the other side of the issue. ১

এইদিক থেকেও কথকতাশিল্পের লুপ্তির কারণ হয়ত শিক্ষার ক্রমবর্ধমানতায় বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

---

১ Personality as a Factor in Susceptibility to Personality, by Irving Jones in Communication, VOA forum lectures, 1967, p. 52.

তিমির হননের গান

অভিজিৎ অধিকারী

দু হাজার খ্রীষ্টাব্দ আর মাত্র সতের বছর দূরে। এই সময়ের ছন্দে বাংলা সংস্কৃতির প্রাথমিক চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন কতটা গুপ্তভাবে হচ্ছে তা জানা না থাকলেও আর কয়েকদিন পরে একটু কান পাতলে মহাকাশফেরীর ল্যানডিং-এর তীব্র শব্দ তখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপৃত অসংখ্য তারকা পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কতটা সফল বা ব্যর্থ তা নিয়ে এতদিন অনেকেই মাথা ঘামান নি। তাঁরা জনপ্রিয়তা নামক স্তম্ভের আড়াল থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সুখে কালযাপন করেছেন। দরজা হাট করলেই আলোর বিচ্ছুরণ। দরজা চাপড়ালেই বাণিজ্য। শক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাই আর হয়ে ওঠে নি। সুড়ঙ্গপথের শেষ সীমায় মোমবাতির আলো-আঁধারিতে মৌতাতে কাটছে সময়। বলা হচ্ছে, বিপ্লব চালু। রেনেসাঁস-এর শুভ সময় আগত-প্রায়। বাংলার জনগণ, আপনারা সজাগ হোন।

সুর-কথায় সংযোগ রক্ষার আপাদমস্তক সফলতা বিংশ শতাব্দির এই শেষ সীমাতেও স্পষ্ট নয়। বিশ্বজোড়া কমিউনিকেশান সমস্যার সামান্যতম স্পর্শ তাই বাংলা আধুনিক গানের একটানা মসৃণ পথের উপর খড়কুটোর মতও বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। অনেকে বলবেন, খড়কুটো বাধা হবে কি করে, মসৃণ পথ পরিষ্কার করতে তো সবাই সদাজাগ্রত। সংযোগ-সঞ্চারণের ঢেউ সুকৌশলে টপকে গিয়েই তো এই বাণিজ্যিক সফলতা। এ তো যে কোন পেশাদারী মানুষেরই সাফল্য প্রমাণ করে।

· বেশ কয়েকবছর ধরেই এই হিসেব-নিকেশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেওয়ার জন্য পরবর্তী প্রজন্ম বারবার পেশ করে চলেছে। সুসময়ের অপেক্ষাতেও রয়েছে বেশ কিছু। এ সুসময় নয়—বারংবার এ শব্দকটা আরও কিছুকে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখেছে। এই বিভ্রান্তি, অপেক্ষায় কাটছে সময়। বাংলা আধুনিক গান অবিন্যস্ত ভাবে আরও ছড়িয়ে পড়ছে এলোমেলো কোণে। বিপ্লবের নেতারা জানেন, সংযোগ-স্থাপন তো দূরের কথা বাংলা আধুনিক গানের সম্বন্ধ রূপদানই এখন বেশ কঠিন কাজ।

ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রকৃতি-নির্ভরতা ঃ

শব্দের কম্পনমাত্রায় রকমফেরে সুরের সৃষ্টি। তাই শব্দের ব্যাখ্যা সুর বা সঙ্গীতের গোড়ার কথা। ধরা যাক্, জলের ওপর এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে জল পড়ছে। সেই জলের এক-একটা বিন্দু জলের ওপর কম্পনের সৃষ্টি করছে। সেই কম্পনের

রকমফেরে শব্দশক্তি পরিবর্তিত হচ্ছে গতিশক্তিতে। শব্দ-কম্পনের সেই সঙ্ঘবদ্ধ রূপের প্রকাশ সুরে।

ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রাথমিক সুর এই বিজ্ঞানসম্মত পথ ধরে আসে নি। তবে এই সঙ্গীতের বিস্তার ক্রমশই বৈজ্ঞানিক ধারণাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। দেশীয় বা পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত একেবারেই প্রাথমিক সুরের উপর গড়া। এ-সুর প্রকৃতি নির্ভর। তাই এখনও অপরিবর্তিত। এই প্রকৃতি-নির্ভর সুরের গায়ে গা লাগিয়ে ধ্রুপদী সঙ্গীত জটিল থেকে জটিলতর সুরের সন্ধানে পাড়ি জমায়। শ্রবণ-মাত্রা বজায় রেখে এর ভাঙ্গা গড়া চলে। জটিল পথের সন্ধান পেয়ে সুর ফিরে আসে তার প্রাথমিক স্তরে। আবার গহন অরণ্যের খোঁজে বেরয়, ভাঙ্গে, গড়ে।

সুরের সাবলীল বিস্তার বা প্রস্তুতি বিনাই গভীরতম তন্ত্রে আঘাত করার প্রবণতা, যা আজ আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একমাত্র কথা, তা কিন্তু ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রাথমিক বিভাগ মাত্র। জ্যাজ সঙ্গীত আফ্রিকার গভীর অরণ্যে থালা-বাসনের সঙ্ঘবদ্ধ ছন্দে ধ্বনিত হলেও আজ তার গায়ে প্রচুর আধুনিকতার প্রলেপ লেগেছে। আর এই প্রলেপের সিংহভাগেই ব্যবহৃত হয়েছে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের ধারণাটি। আজ ভারতের বাইরে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রাথমিক সুরের গঠন নিয়ে চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আর সকাল-সন্ধ্যা স্বরলিপির ওপর হুমড়ি খেয়ে সেই প্রাথমিক সুর আয়ত্তে আনার জন্য এ প্রজন্মের ভারতীয়রা তাদের কষ্টার্জিত সময় ব্যয় করে চলেছে।

সাহেবদের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকেই বোধহয় পাশ্চাত্য সঙ্গীত আমাদের কোন কালেই সে ভাবে আকর্ষণ করে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গতিপ্রকৃতির কথা তো দূরে থাক্‌, বাক্‌-বেথোফেনের সর্বজন স্বীকৃত কাজকর্ম সম্বন্ধে আমাদের সামান্যতম ধারণা নেই। তাই পরিপূর্ণ সঙ্গীতের সঠিক ধারণাও পরিষ্কার নয়। আজ আমাদের গানে অর্থাৎ বাংলা আধুনিক গানে একাধিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই একাধিক বাদ্যযন্ত্র উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পন্থাটি দীর্ঘকাল আগেই পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতে ঢুকে দেওয়া হয়েছিল। 'হারমোনি'র মাধ্যমে একাধিক বাদ্যযন্ত্র কি করে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রূপ দিতে পারে তা এখনও একশো বছর আগেকার পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত শুনলে বোঝা যাবে। এ তো গেল ওদেশী ধ্রুপদী সঙ্গীতের একটি দিক মাত্র। এ রকম একাধিক দিক রয়েছে যা সময়ের চাপে পড়ে ক্রমশ স্থবিরতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

বাংলা আধুনিক গানে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিকৃত সুরারোপ বহুবার চটজলদি বাণিজ্যের দরজা খুলে দিয়েছে। রাগাশ্রিত সঙ্গীতের প্রতি বাঙালির স্বাভাবিক

সমত্ববোধের মুনাফা লুটেছেন সুরস্রষ্টারা। যেহেতু রাগ তাই প্রকৃতি নির্ভর লিরিক বসিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্ভয়ে। দেশীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রাথমিক সুর ছেড়ে এই সব 'গান' অন্যত্র অর্থাৎ সুরের জটিল স্তরে পাড়ি জমাতে ভরসা পায় নি। গায়ক বা গায়িকা এই রাগাশ্রিত বাংলা আধুনিক গানকে কখনও কখনও জনপ্রিয় করে তুলতে পারলেও, সংযোগ-সমস্যার গায়ে আঁচড় বসাতে পারে নি।

কেন রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়

গত প্রজন্ম তো বটেই এ প্রজন্মের অনেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বিলাসী। তবু রবীন্দ্র-সঙ্গীত ক্রমশ তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশের চাপে পড়েও এ প্রজন্মের বহু তালিমপ্রাপ্ত নারী-পুরুষ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাঙ্গীতিক অতলে তলিয়ে যেতে পারছে না। গতি বদ্ধ হয়ে থাকছে গত প্রজন্মের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মধ্যে। সময়-টরপেডোর পক্ষে যা পুরোপুরি ধ্বংস করা একেবারেই কঠিন কাজ নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বাংলা আধুনিক গানের সোপান বললে অত্যুক্তি হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়কালে আধুনিকতার স্পর্শ অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মননশীল চিন্তাভাবনাকে সুরে বেঁধেছিলেন। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত থেকে শুরু করে পাশ্চাত্যসঙ্গীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ বিন্দু তাঁর বেশ কয়েকটি গানে থেকে গিয়েছে।

সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সফলতা বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসই প্রমাণ করে। বিশেষ করে বাংলা গানের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ যে সম্ভব তারও পথ দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এখন আধুনিকতার সংজ্ঞা আলাদা। সময়ের ব্যবধানে পেছনে রয়ে গেছে অনেকটা পথ। সেই পথে প্রতিনিয়ত চলেছে খনন-যজ্ঞ। যুক্তির প্রত্যেকটি গ্রন্থি খুলে খতিয়ে দেখছে মানুষ। আত্মভোলা প্রকৃতির ঘাড়ের কাছে বসে শ্বাস ফেলছে যন্ত্রগণক। এ সময়ের খবর কারুরই অজানা নয়। একান্ত প্রকৃতিপ্রেমী তাই গহন কালো মেঘের কথা ভাবতে গিয়েই ঠোক্কর খায়। কারণ আর অজানা নেই যে, কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ ঐ কালোমেঘের আগামবার্তা পৌঁছে গেছে পৃথিবীতে। কমপিউটার জানিয়ে গিয়েছে ওই কালোমেঘে ঠিক কত শতাংশ জলীয় বাষ্প আছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুর নিয়েও প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু সুরের স্থিতিশীলতা কি সম্ভব? তাই অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স শব্দ মিশ্রণযন্ত্র (সিনথেসাইজার) আসলে সারেঙ্গি তানপুরার আওয়াজে আমাদের কোন আশ্বাস দেয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রচুর তাল এবং জটিল সুর উপযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের অভাবে পরিপূর্ণতা

পায় না। তাই সংযোগ-সঞ্চারণের জটিলতম সূত্রে, অনেক বেদনা নিয়েও রবীন্দ্রনাথের গানকে নির্দ্বিধায় ছাঁটাই করা যেতে পারে।

চলচ্চিত্র ও বাণিজ্য সঙ্গীত

একমাত্র ভারতবর্ষেই বোধহয় আধুনিক গান বলতে ফিল্মী গানকে বোঝায়। এ ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির অভাব বোধ হয় না। 'ভিস্যুয়াল ইম্প্যাক্ট' কম বেশি সমস্ত মানুষের ওপরই কাজ করে। আর এই ইম্প্যাক্টকে' কাজে লাগিয়ে সঙ্গীত-বানিজ্য এ দেশে অব্যাহত। মোটামুটি অন্য রাজ্যের কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র হিন্দী এবং বাংলা চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করলে সংযোগ-সাধনে অধিকাংশ গানের ব্যর্থতার কথা অনেকটা পরিষ্কার হবে।

পুরনো দিনের গান স্বযত্নে সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র এখনকার হিন্দী ফিল্মী গান নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, গত কয়েক দশকে হিন্দী গানের সুর নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। মোটামুটিভাবে প্রত্যেক হিন্দী ছবির চিত্রনাট্যে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচটি গানের জন্য জায়গা আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়। এই গান চিত্রাঙ্গের মুডের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল। তাই সঙ্গীত পরিচালককে বিভিন্ন মুডের গানে সুর দিতে হয়। ইদানিং অবশ্য বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গীতপরিচালককে ও এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হচ্ছে। কিন্তু হিন্দী ফিল্মের মস্ত সুবিধে হল তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সুযোগ পান, যা বাংলা ছবির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

এত সুবিধে পাওয়া সত্ত্বেও ক'টা ভাল হিন্দী গান আমরা শুনতে পাই? বাজার-মাৎ-করা গান যা গুটিকয়েক গোনা যায় তা আবার সবই মোটামুটি একই ধাচে গড়া। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই সমস্ত গানই 'বাজার মাৎ'-এর ছকে ফেলা। আরও বেশী পরীক্ষা চালানোর ঝুঁকি নেয় নি কেউই।

ছবির গানে সংযোগ-সৃষ্টির শীর্ষ বিন্দুটি অবশ্য বাংলা ছবির গানেই সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা চলচ্চিত্রের মত বাংলা আধুনিক গানেরও হাল ধরেছেন সত্যজিৎ রায়। 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' এবং 'হীরক রাজার দেশে' ছবির গান দৃশ্যাবলীর অপেক্ষা রাখে না। 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে'—এ গান খোলা গলায় কলকাতার জনাকীর্ণ পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ও গাওয়া যায়। এর জন্য গুপি-বাঘার মত নীল আকাশের নীচে ধান ক্ষেতে আল ধরে হাঁটার প্রয়োজন হয় না। তবে সত্যজিৎ-এর এই গান বাংলা আধুনিক গানের শেষ কথা—এও আবার সঠিক নয়। বলা যায়, এই সুর একটি দিক মাত্র।

সত্যজিৎ ছাড়া বাংলা চলচ্চিত্রের মতই বাংলা সংস্কৃতিতে সঙ্গীত পরিচালকের অভাব

বড় বেশি প্রকট। 'ভিস্যুয়াল ইমপ্যাক্ট'এর কাঁধে চেপে কেউ কখনও কোন সময় তরি পার করতে পারলেও, অধিকাংশ সময়ই কেটেছে চরম হতাশায়। বর্ষাস্নাত নায়িকার যৌন লালসা, হি-ম্যান নায়কের বিরহ বা রঙ্গরসে ভরপুর দৃশ্যও গানের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক শ্রোতার মনে রেখাপাত করতে পারে নি।

পুজোর গান বলতে বাংলা সংস্কৃতির প্রথাগত ভাবপ্রবণতা এখন আর নেই বললেই চলে। দৃশ্যায়নের হাত ধরে যে গান সঠিক পথের সন্ধান পায় না, তার পক্ষে কথায় সুরে শ্রোতার মনে দৃশ্যপট প্রতিবিম্বিত করা অসম্ভবই বলা চলে। তবু এখনও মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ পুজোর বাজারের সঙ্গে দুচারটি বাংলা গানের রেকর্ড কিনে ঘরে ফেরেন। তারপর দিন তিনেক এক নাগাড়ে শোনার পর টিনের বাক্সে ধুলোর সঙ্গে সঙ্গমের পূর্ণ অনুমতি পায় সেই চাকতিগুলো।

স্বর অভিনয়, বাউলের মেলায়

বাউলের বিদেশযাত্রা যতই কষ্টকল্পিত হোক না কেন, যে কোন বাউল মেলায় গেলেই দেখা যাবে এরা একেবারে বিকল্প স্বরে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। শুধু বাউলই নয় বাংলার লোক সংস্কৃতিতে স্বরকে ধরে রেখেছে পারফরমেন্স বা অভিনয়।গ্রাম বাংলার জীবন যাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ লিরিক -- অস্বীকার করা যায় না। শহুরে মানুষ ইদানিংকালে মেঠো পথ, শান্ত দীঘির টানে নিয়মিত গ্রামে গিয়ে হাজির হলেও, ওখানকার স্থানীয় মানুষের মানসিকতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। দরকার হয়ে পড়ছে ছোটখাট বিভিন্ন কৃত্রিম লোকাচারের। যেখানে সামান্যতম অভিনয়ের স্পর্শ আছে। ভাটিয়ালির সঙ্গে যে অনুষঙ্গ প্রয়োজন, তা মাঝির একটেরে হাল বাওয়া, সুফির জটিল জ্যামিতিক পদচারণা—সংযোগ যে পর্যায়ে তৈরি হচ্ছে, তা মূলত শরীরে-মস্তিষ্কে। যা অব্যাখ্যাত থাকার তাৎপর্য আছে। একেবারে ওপর থেকে গণসংগীত বলে কিছু চালিয়ে দেবার চেষ্টা হলে তার ব্যর্থতা অনিবার্য।

তিমির বিনাশী হতে চাই

আধুনিক বাংলা গানের আভ্যন্তরীণ কাঠামটা তৈরি করতে হলে গ্রামীণ আন্তরিক সংযোগের উৎসে হাত ঘষে যেতে হবে। গিটারের গায়ে মাখিয়ে দিতে হবে মাটি। সমবয়স্ক বা একই সমাজব্যবস্থায় বসবাসরত মানুষের গলা মিলবে এক ধরনের গানে. যা কখনই জনগণের গান হয়ে উঠবে না। কারণ তা একই সঙ্গে হবে চরম ব্যক্তিগতও। সেই গানে দীর্ঘ নীরবতার ভূমিকা থাকবে। যে গানের কথায় আসবে হালফিল সমাজের খবরাখবর : পোল্যাণ্ডের শ্রমিক সংগঠনের জনৈক সদস্যের দৈনন্দিন জীবনযাপন বা

কুমেরুর শ্বেতশুভ্র জমির অধিকার নিয়ে বিশ্বজোড়া উত্তেজনা, জাপানী অটোমোবাইল ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি। অথবা এসব কিছুই থাকবে না। থাকবে একটানা গমগমে আওয়াজ তোলা স্বপ্নের জঙ্গল, কলকাতার চার কেরাণী কিভাবে মেস বাড়ির ছাদে উঠে হঠাৎ দেখে ফ্লাইং সসার, কেন কৃষকের ফসল, শ্রমিকের উৎপাদন দেখার পরেও মন ভাল থাকে না, তরুণ ভুল করে আজও প্রেমে পড়ে তরুণীর।

সুর তৈরির দায়িত্ব নিতে হবে। তা হবে ছন্নছাড়া, উদাসীন, একরোখা ও সতর্ক। পিয়ানোর পাশাপাশি ডেকে উঠবে একতারা। প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন এই দুঃসময়ে, এই তৃতীয় বিশ্বেও সংযোগ রক্ষার চেষ্টাকে দ্রুত জ্ঞানচর্চায় পরিণত করার প্রাণপাত পরিশ্রম চলছে। এ অবস্থায় শুধু মানুষের সৃজনশীলতার উপর আস্থা রাখা সম্ভব নয়। সৃজনশীলতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দরকার সহমর্মিতা। ফলে আধুনিক সঙ্কট পর্বে, সঙ্গীত কেবল 'রসপিপাসুদের' ক্যাথারসিস ঘটালেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। একে গ্রন্থী-বন্ধনের কাজেও লাগাতে হবে।

বিভিন্ন সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ভাববিনিময়

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে যত সহজ ভাষায় সম্ভব আমাদের ভারতবর্ষের একটি অতি প্রয়োজনীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। সমস্যাটি হ'ল বিভিন্ন সংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সমস্যা। এই সমস্যার অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করতে চাইবেন না। কারণ আমাদের ধারণা ভাষার সাহায্যে আমরা আমাদের মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বহুদিন ধরে ওড়িশা এবং আসামের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে সংস্কৃতির দিক দিয়ে আমরা তিনটি ভাষা গোষ্ঠী অতি নিকট আত্মীয়। আমাদের তিনটি ভাষার মধ্যে এত সাদৃশ্য যে ভাষা লেখাটা কোন সমস্যাই নয়। অন্যদিকে বাঙালীরা আসামে অনর্গল অসমীয়া বলে ওড়িশায় ওড়িয়া বলে। অন্যপক্ষে অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষাভাষীরা সহজেই বঙ্গদেশে এসে বাংলা বলেন। কিন্তু তবু আমরা দেখেছি আমাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে কোথায় একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। আজকে আসামে যে গোলমাল তার একটা বিরাট অংশ বাঙালী-বিদ্বেষ। ওড়িশাতে কিছুদিন আগেও ব্যাপক বাঙালী-বিরোধী আন্দোলন চলেছে। যে কোন মুহূর্তে আবার শুরু হ'তে পারে। এর কারণ হিসাবে পণ্ডিতরা একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন যেটি হ'ল Socio Economic Condition। সমাজ বিজ্ঞানে প্রচুর গালভরা শব্দ ব্যবহার করা হয়। যার মানে বোঝার প্রয়োজন হয় না। শ্রদ্ধেয় স্বর্গত পরিমল রায় এ ভাষাকে ভেগোলজী বলেছিলেন। আমরা এখন দুনিয়াশুদ্ধ সবাই ভেগোলজিষ্ট হয়ে উঠেছি। গত এশিয়ান ক্রীড়ায় ফুটবলে গোহেরেন খাওয়ার পর ভারতীয় দলের প্রশিক্ষক হারের জন্য ভারতের Socio Economic Condition কে দায়ী করেছেন। কত হাস্যকর কথাই আমরা শুনি।

আমার মনে হয়েছে এই সব শব্দের ধূম্রজাল ভেদ করে আসল সরল সত্য হ'ল আমাদের মধ্যে ভাব বিনিময় হয় না। রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকার মায়ের কথায় 'আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।' আসলে ভারতবর্ষের মতো বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশ পৃথিবীতে খুবই কম আছে। বর্তমানে দেখতে পাই জোরগলায় প্রচার করা হয় ইংরেজরা প্রথম একে এক করেছে। কথাটা একদিক দিয়ে সত্যি, অন্য দিক দিয়ে মিথ্যা। ভারতবর্ষে বরাবরই একটি মিলনসূত্র ছিল। এ মিলনসূত্র হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষা। আমাদের দুটি মহাকাব্য আমাদের মূল্যবোধ বহুদিন ধরে নিয়ন্ত্রণ করছে। আজও করে।

আমি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। আমি গর্বিত যে আমাদের দেশের সংবিধানে সেই নীতিকে সংবিধানিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্মকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষকে বোঝবার চেষ্টা করা বাতুলতা। সংস্কৃতও হিন্দুধর্মেরই অংশ। গায়ত্রী মন্ত্র, সূর্য মন্ত্র, বিবাহের মন্ত্র, শ্রাদ্ধের মন্ত্র সারা ভারতের শতকরা ৮০ জন লোকের কাছে এক। এটা যে একটা জোরদার মিলনসূত্র এ কথা অস্বীকার করা বাতুলতা।

মন্ত্র মানুষকে একাত্ম ও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু নৈমিত্তিক কাজের জন্য ভাব বিনিময় তার দ্বারা সম্ভব নয়। সেখানে আমরা গত একশ বছরের ওপর ইংরাজী ভাষার শরণ নিয়েছি। আজ ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষ মোটামুটি ইংরাজী জানে এবং ইংরাজীতে কথা বলতে পারে। কিন্তু ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ নিগূঢ়। তাই সংস্কৃতি ভাষাকে দুমড়ে মুচড়ে নিজের সংস্কৃতির মতন করে নেয়। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি হয়তো পরিষ্কার হ'বে। নাম জিজ্ঞাসা করতে ভারতের অনেক সংস্কৃতিই শুভনাম কথাটা ব্যবহার করবেন। কোন নামই শুভবর্জিত নয়। আর তারই ফলে ইংরাজীতে যখন নাম জিজ্ঞাসা করা হয় তখন বলা হয় What is your good name? এরকম উদাহরণ ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে। ইংলণ্ড দ্বীপের ভাষা আমেরিকা কানাডায় এক রূপ নিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া আর নিউজীল্যাণ্ডে অন্য রূপ নিয়েছে। সাউথ আফ্রিকায় অন্য রূপ ভারতমহাদেশেও তাই। ভারত যেহেতু বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত দেশ—ভারতেও তাই বিভিন্ন সংস্কৃতিতি বিভিন্ন রূপে ইংরাজী চলে। উচ্চারণে ভেদ। বাক্য গঠনে ভেদ। কথার মানেতে ভেদ। আমাদের ভাষার জন্য আমার শ স ষ র তফাৎ করতে পারি না, যখন ইংরাজী বলি তখন সেখানেও একই ব্যাপার। তাই সোশিওলজি বলতে বাঙালীদের বেশ অসুবিধা হয়। ওড়িয়াতে আকারান্ত শব্দ খুব কম। তাই সেখানকার নামজাদা অধ্যাপক আমায় বলেন "ইন্ সেমিনর সমচুয়স লব ইজ ভেরী নেসেশরী।" অসমীয়ারা 'ত' এবং 'ট' বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একইভাবে উচ্চারণ করেন। 'চ' এর উচ্চারণ অসমীয়া ভাষায় অনুপস্থিত। দক্ষিণ ভারতীয়রা এইচ. এম. এন উচ্চারণ করেন হেজ ইযেম আর ইয়েন। সুতরাং ভাষা পরিপার্শ্ব অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ রূপ নেয়। তাই ইংরাজীর মতো একটা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষাও মনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করে না। এই যোগাযোগের জন্য চাই সশ্রম প্রয়াস। ভারতবর্ষের ইংরাজী কাগজের পাত্র-পাত্রী চাই স্তম্ভে 'হোমলি' মেয়ের চাহিদা দেখে মার্কিনীরা হেসে খুন হন। আমরা চাই ঘরের লক্ষ্মী বৌ। ওদের ভাষায় কথাটার মানে কুৎসিৎ-দর্শন।

এই সংস্কৃতির গণ্ডী কাটাবার উপায় কি? এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বটেই, তাছাড়াও ভারতের সমস্ত সংস্কৃতি একই রকম ভাবে বিবর্তিত হয় নি। কিছু সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির চাইতে প্রবলতর এবং কিছুটা আগ্রাসী। আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতি এই রকম একটি আগ্রাসী সংস্কৃতি। আমরা নিজেরা ভারতীয় অন্য সংস্কৃতি-সম্পন্ন লোকেদের চেয়ে নিজেদের উচ্চতর জীব মনে করি। হিন্দী-ভাষীরা আমাদের চেয়েও অনেক সরেশ। তারা তো মনে করে ইংরাজী গিয়ে দেশে হিন্দী এসেছে। বাঙালী যেমন স্বচ্ছন্দে গয়া, পুরী, কাশী, বৃন্দাবনে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা চালায়, হিন্দী-ভাষীরাও তেমনি কলকাতায় আবহকাল বাস করেও অনেকেই বাংলা বলেন না (অনেকে বলেন। খুব ভাল বলেন। এবং তাঁরা ভাব বিনিময়ে সমর্থ হ'ন)। বাঙালীরা ভাগলপুর কিংবা এলাহাবাদ কিংবা বাঙ্গালোরে দীর্ঘকাল বসবাস করেও বাঙালী থাকেন। কিন্তু দেখুন যখন কয়েক বছরের জন্য যখন কেউ ব্যারিস্টরী পড়তে যেতেন তখন সাহেব হয়ে কেমন ফিরতেন। এক আগ্রাসী সংস্কৃতির পরাজয় হ'ত আগ্রাসীতর সংস্কৃতির হাতে।

আমাদের ইতিহাসে ইংরাজীভাষীদের কাছে অবজ্ঞা পাবার নিদর্শন প্রচুর আছে। তাই আমরা ভারত সম্বন্ধে কোন সমালোচনা শুনলেই মিস্ মেয়োকে স্মরণ করি। আমারা মোটামুটি জানি শ্বেতচর্মের লোকেরা অশ্বেতকায় লোকদের হীন মনে করে। সুতরাং যখন একজন ম্যাক্সমুলার কিংবা রোমা রোল্যা কিংবা রিচার্ড এ্যাটেনবরোর আমরা দেখা পাই তখন আমাদের আহ্লাদ হয়। শ্বেতচর্মের উন্নাসিকতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য আমাদের হীনমন্যতা।

দুঃখের কথা ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যেও একই রকম মনোভাব বিরাজমান। প্রায় দশ বছর আগে ওড়িশা সরকার একজন দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত নিয়োগ করেছিলেন সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে যে জয়দেব ওড়িয়াভাষী ছিলেন। জয়দেবের কালে ওড়িয়া ভাষা আর বাংলা ভাষার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য ছিল? কিন্তু ওড়িশার তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রীর মনে হয়েছিল এ প্রমাণটা জরুরী। চৈতন্যদেব বাঙালী সংস্কৃতির একজন প্রধান পুরুষ। চৈতন্যদেব নিজে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। কিন্তু আজ চৈতন্যদেব বড় না শংকরদেব বড় এটা গবেষণার বিষয়। চৈতন্যদেব ওড়িশার ক্ষতিসাধন করেছেন এ কথাটা প্রায়ই শুনতে হয়। অন্যদিকে বাঙালিরা সাধারণভাবে ওড়িশার এবং আসামের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা স্বেচ্ছাকৃত। এর মধ্যে একটা ধারণা উপ্ত আছে যে আমরা শ্রেষ্ঠ। ওড়িশা, আসামের কাছে আমাদের শেখবার কিছু নেই। উন্নাসিকতা এবং হীনমন্যতা কখনো ভাবের আদান-প্রদানের সহায়ক হয় না।

যেসব সংস্কৃতি বাইরের আঘাত সহ্য করতে পারে না তারাই সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ স্পর্শকাতর হয়। আজ ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় সংস্কৃতি বাঁচাও রব উঠেছে। দেখবেন এর মধ্যে কোন হিন্দীভাষী সংস্কৃতি নেই। এই রব যে সব জায়গা থেকে ওঠে সে সব জায়গা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক দিয়েও পশ্চাৎপদ। সুতরাং তুটো দাবিই একই সঙ্গে শোনা যায়—আমাদের সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে আর আমাদের এলাকার উন্নয়ন সাধন করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমি তৈরি করতে গেলে অন্য সংস্কৃতির লোক আসবেই। সুতরাং সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একসঙ্গে সম্ভব নয়।

তুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ভাববিনিময়ের প্রধান শর্ত হ'ল ভাববিনিময়ের তাগিদ থাকাটা চাই। উজবেকীস্তান থেকে যারা ঘোড়া বিক্রি করতে আসত তারা আমাদের দেশের ভাষা বুঝতো না, আমরাও তাদের ভাষা বুঝতাম না। তারা কিন্তু ঘোড়া ঠিক বিক্রি করে যেত। আজো বহু বিবাহ হয় যেখানে পাত্র-পাত্রী বিভিন্ন সংস্কৃতির থেকে আসে। এরকম বহু সফল বিবাহের নজির আছে। ভালবাসার তাগিদে সেখানে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একজন তার সংস্কৃতি ত্যাগ করে। কিংবা অনেক বেশিই নিজেকে বদলিয়ে নেয়। আসলে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে কার প্রয়োজন বেশি সেটা দরকারী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড তরফ যারা তাদের যদি ছোট তরফের কাউকে প্রয়োজন হয় কোন বিশেষ কারণে তখন তারা ছোট তরফের সংস্কৃতি বুঝতে চেষ্টা করে। কি হ'লে সেই দেশের লোক খুশি হবে সে সম্বন্ধে গবেষণা করে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই প্রয়োজনটা ছোট তরফেরই থাকে। আর প্রার্থী হওয়ার জ্বালায় জ্বলতে থাকে। আমাদের বিচার্য ভারতবর্ষ। এখানে আমাদের সমান প্রয়োজন। দেশের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দেশের সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চাই প্রয়াস। এটা সরকারী ক্ষেত্রে যেমনি প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও।

তুঃখের বিষয় আমাদের সরকার ঠিক করেছেন হিন্দী ভাষার মাধ্যমেই এ কাজটা করা যাবে। তাই তাঁরা প্রথমে একটি জিনিস ইংরাজী অথবা হিন্দীতে লিখে সারা ভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করেন। একই জিনিস সবাই শুনলে বা দেখলে দারুণ সংহতি হবে এটাই তাঁদের বিশ্বাস। এর ফলে স্থান নামে ভুল উচ্চারণ হয়, ব্যক্তির নাম পড়তে ঘোষক হোঁচট খান। দিল্লীর নিকটবর্তী জায়গার ঘটনাবলী অনেক বেশী প্রাধান্য পায়। রেডিও আর টি ভিকে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহ'লে এ অবস্থার উন্নতি হবে। প্রত্যেক রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাদের রাজ্যের অধিবাসীদের ওয়াকিবহাল কারার চেষ্টা করলে সেটা অনেক কার্যকর হবে।

এই প্রসঙ্গে লোকসংগীতের এবং লোকনৃত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন মন্ত্রবলে

এটা সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে সহজেই সঞ্চারিত হ'তে পারে। গরবা কিংবা ভাংরা ঝুমুর বংশনৃত্য সবাই উপভোগ করে। বিদেশের লোকসংগীত বা লোকনৃত্যও একই কাজ করে। আসলে লোকগীত বা নৃত্যের আবেদন অনেক সার্বজনীক। কারণ প্রতি মানুষ যে সুঃখ দুঃখের কথা বুঝতে পারে তার কথা বলে। কোন তত্ত্ব নির্ভর নয় সে সুখ দুঃখ। তাই সহজেই মানুষের মর্মস্থলে তা পৌঁছায়।

এরই জন্য হয়তো বিভিন্ন সাংস্কৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের কথা যখন ওঠে তখনই কিছু নাচগানের আয়োজন হয়। কিন্তু মানুষ নাচগানের চাইতে একটু জটিল। সুতরাং এ ব্যাপারে যত্নবান হবার প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আর চলে না।

কাহিনীচিত্রের শববাহকেরা

সূর্য ঘোষ

সংবেদনশীল মহল থেকে তীব্র আপত্তি উঠলেও আমরা, ভারতীয় 'আর্ট ফিল্ম' বলতে একটি বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্রকে বুঝি। ঠিক কি বুঝি বলা কঠিন। কেননা এখনও এর যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ হয়নি। যেমন 'আর্ট ফিল্ম' কমার্শিয়াল ছবি নয়—এটা নির্বোধের উক্তি হয়ে দাঁড়ায়। অথবা ভাল ছবি শংসাপত্রও দেওয়া যায় না, কেননা বহু 'আর্ট ফিল্ম' ভাল ছবি নয়। রুচিশীল, ঠিক ইত্যাদি শব্দ মাঝে মাঝে চালানর চেষ্টা হয়েছে, কিছু ব্যক্তি সৎ শব্দটিও ব্যবহার করেন। কিন্তু বলাবাহুল্য সংবেদনশীল মহলই এই বিশেষণগুলি বাতিল করে দিয়েছেন।

ফলে একটু মোটা দাগে হিসাব করলে দেখা যাবে, আমরা ভারতীয়রা 'আর্ট ফিল্ম' বলতে বুঝি কিছু বিশেষ পরিচালকের ছবি এবং 'বাস্তবসম্মত ছবি। যদি কোন বাস্তবসম্মত রূঢ় ছবি আমাদের মনে ধরে, আমরা ঐ ছবির পরিচালককে 'আর্ট ফিল্ম' নির্মাতা বলেই মেনে নেই।

বর্তমান প্রতিবেদন স্বীকৃত বাংলা আর্ট ফিল্ম সম্পর্কে। অতএব কয়েকটি ছবি যেমন পদী পিসির বর্মী বাক্স[১], নিধিরাম সর্দার[২], সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা[৩] জাতীয় কয়েকটি ছবির কথা আলোচনায় ঢুকে পড়লে তা প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত মতামত হিসাবেই ধরে নেওয়া ভাল। কেননা ঐ ছবিগুলি স্বীকৃত আর্ট ফিল্ম নয়। সম্ভবত হাসির ছবি বলে। বিলেত ফেরৎ[৪] ছবিটিও ঐ তালিকায় ঢুকে পড়ত, কিছু রহস্যময় কারণে বেঁচে গিয়েছে।

যেহেতু 'বাস্তবানুগ' হয়ে ওঠাই সবচেয়ে বড় কথা, ফলে সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে এমনকি গ্রামীণ বাংলা নিজের অধিকারাদি সম্পর্কে অনেকটা সচেতন। একটি সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধু সিজন টাইমে, শ্যাওড়াফুলি স্টেশনে তারকেশ্বর যাত্রীরা যদি জনপ্রতি দশ পয়সা করে ধর্মকর জমা দেন, তবে প্রতিবছর সরকারি অর্থ-ভাণ্ডারে অন্তত পঁচিশ লক্ষ টাকা জমা পড়বে। জাপানীরা শেষপর্যন্ত তেমন কোন বোমা ফেলে উঠতে পারেনি, যাতে বাঙালি সা রে গা মা ভুলে যেতে পারে। তাই এশিয়াডে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'নবান্ন' অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিশ্বব্যাঙ্ক তো বটেই, এমনকি ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি কলকাতা শহরকে সুন্দর করে তুলতে ডলার ঋণ দিচ্ছে। নকশাল আন্দোলন পুরোপুরি ব্যর্থ হওয়ায় এবং একটি কম্যুনিষ্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকায় জনসাধারণের স্বপ্নও বাম ঘেঁষা হয়ে উঠেছে। আর্ট ফিল্মের পটভূমিতে আর একটি অর্থনৈতিক তথ্য জরুরি। তা হল, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার আর্ট ফিল্ম নির্মাণের জন্য ঢালাও অর্থসাহায্য করছেন।

যেহেতু প্রতিবেদনটি আর্ট ফিল্মের সংযোগ ক্ষমতা সম্পর্কে, তাই প্রসঙ্গত আলোকপাত করা দরকার যে পুরস্কার ও বৈদেশিক প্রশংসাপত্র দ্রুত যে কোন ফিল্মকে বর্তমানে আর্ট ফিল্মে রূপান্তরিত করছে। পুরস্কারটি বিদেশী হলেই ভাল, দেশী হলে অন্তত জাতীয় স্তরের। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন পর্যন্ত এই পুরস্কার প্রাপ্তি দর্শক সমাজের কাছে অতটা অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী ছিল না। দর্শকসমাজ অনেকটা নির্ভর করতেন বুদ্ধিজীবী ও প্রাজ্ঞ সমালোচকদের উপর। কয়েক বছর হল দর্শক আরও খুঁতখুতে হয়েছেন। পুরস্কার ও শংসাপত্র না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না। সম্প্রতি কয়েকজন তরুণ পরিচালকের[৫] বিদেশী ও দেশী সম্মান জুটেছে। ফলে ছবি রিলিজ না করলেও এঁরা আর্ট ফিল্ম পরিচালক হিসাবে চিহ্নিত।

এছাড়া আরও একটি পদ্ধতিতে ছবি রিলিজ করার আগেই আর্ট ফিল্ম সনাক্তকরণ চলে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদিতে ক্যালিগ্রাফি ও ক্যাপশনের স্টাইল অভিনব করে তুলতে পারলে পথচলতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব। সত্যজিৎ রায়ই পদ্ধতিটির প্রচলন করেন। অতিক্রান্ত অবশ্য শুধু তাঁর নামই যথেষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। তবে ইদানিংকালে এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করেছে, কলকাতা ৭১, কোরাস[৬], ছেঁড়া তমসুক, মালঞ্চ[৭], ফটিকচাঁদ[৮], ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পরিচালককে কমার্শিয়াল আর্টিস্টের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়।

এ ত গেল বহিরঙ্গ দিক, এবার অভ্যন্তরের প্রশ্ন। আধুনিক কালের সবচেয়ে জটিল ও শক্তিশালী এই গণমাধ্যমটি ব্যবহারের সামান্যতম এদিক ওদিকে দর্শককেও সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ও নঞর্থকভাবে কম্যুনিকেট করতে পারে, বিশেষত যখন এই মাধ্যমের পরিচালক 'বাস্তবতা' জাতীয় কোন কোড পৌঁছে দিতে চেষ্টা করছেন।

কয়েকটি যত্রতত্র উদাহরণ তুলে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এক. রাতে বাড়ি ফিরছে না একজন উপার্জনশীল স্বাস্থ্যবতী কুমারী মেয়ে—তা থেকে টেনশন তৈরি হচ্ছে। লক্ষণীয় ঐ ছবিতে একজন রিটায়ার্ড বুড়ো বাবা ও বেকার ভাই আছে। বেছে নেওয়া হল মেয়েটিকে। এখন ঘটনা যেহেতু মানুষের, ফলে আমি যা দেখছি তা ঘটনা ও মানুষ মিলিয়ে। এখন দর্শক হিসাবে আমি এলিমিনেশন করে যা পেলাম তা হল, ক. উপার্জনশীলতা, খ. কুমারী মেয়ে। অতএব ধরে নিতে হবে, অন্যত্র সমস্তরের উদ্বেগ সম্ভব নয়। আর এক ধাপ এগোলে বুঝতে পারি, একজন উপার্জনশীল পুরুষের অনুপস্থিতিও তার পরিবারকে অনিশ্চিত করে তুলতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে আমি দর্শক দ্বিতীয়বার এলিমিনেট করে পেলাম শুধু 'কুমারী মেয়ে।[৯]

দুই. পশ্চিমবঙ্গের খরা নিপীড়িত কোন গ্রামে এসেছে পিকনিক পার্টি। মাংস

রান্না চলছে। মাংসের খাবারের অনেক দূরে সারিবদ্ধভাবে এসে দাঁড়িয়েছে কুকুর ও শানকি হাতে নিরন্ন মানুষের দল। হুল্লোড থামিয়ে পিকনিক পার্টি তাদের খেদিয়ে দিচ্ছে। এটি কোন পৃথক বিক্ষিপ্ত দৃশ্য নয়। সমজাতীয় দৃশ্যাদির উপরেই ছবিটি দাঁড়িয়ে আছে।[১০]

তিন. স্বামী স্ত্রীর সেপারেশন পর্ব থেকে ছবিটিকে ধরা হয়েছে। নায়ক রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছেন। ছবির পরিসমাপ্তি হচ্ছে একদিকে অবাঞ্ছিত শিশুর আগমনবার্তা অন্যদিকে রাজনৈতিক বন্দীকে আশ্রয়দান। শুধু ভিস্যুয়ালে পরিচালক সন্তুষ্ট নন, পর্দায় লেখা ফুটে ওঠে, অফ ভয়েসে সারসংক্ষেপ জানান হয়।[১১]

বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই। কেননা ছবিগুলি কতদূর শিল্পসম্মত তা এই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু নয়। এগুলি চলচ্চিত্র হয়ে ওঠেনি, ফলে সংযোগে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ—স্রেফ এই সিদ্ধান্ত থেকেও সমস্যাটি বোঝা যাবে না বা ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হবে। উপরের উদাহরণগুলি আপাতত যা প্রমাণ করে, তা হল অবয়বগতভাবে সংযোগকারী, এক্ষেত্রে পরিচালকের সংযোগ স্থাপনের কোন চেষ্টা নেই। ফলে তাঁর ছবিটি সংযোগ সঞ্চারণের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্ষতিকর এবং সম্পূর্ণ নেতিবাচক। কেন না, এক্ষেত্রে অন্যান্য কিছু সুবিধা করে নিতে পরিচালক বলেন, আমি যা বলতে চাইছি, আমার যা বোধ, তা আমি তোমাদের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারছি না। অতএব, তোমরা যা বোঝ বলে আমি মনে করি, যা এতকাল বুঝেছ, যেভাবে বোঝা তোমাদের পক্ষে সহজ, সেভাবে তোমাদের বোঝাচ্ছি।

অর্থাৎ এককথায়, পরিচালক একাধারে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন দর্শকের বোধবুদ্ধি অন্যদিকে ন্যায়অন্যায ; ঠিক বেঠিকের নীতিও তিনি নির্দ্ধারণ করছেন।

দর্শকের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা, সীমাবদ্ধতা ও কল্পজগত সম্পর্কে চলচ্চিত্র পরিচালকেরা অবহিত, ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই গ্রাফ মোটামুটি একরকম। পরিবেশ সাহিত্য চলচ্চিত্র-এর পরিধি বিস্তারে সাহায্য কার। বিস্ময়ের যে মহাভারতের যুগ থেকেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্যটি দেশে বিদেশে সাড়া জাগিয়ে আসছে। কাজেই আজকের দুনিয়ায় কোন আধুনিক প্রতিবাদী চলচ্চিত্রে জোতদার, ফরেস্ট গার্ড বা দুর্বৃত্ত অবলা আদিবাসী নারীর কাপড ধরে টানলে মেয়েটি বাঘে ধরার মত চেঁচাতে থাকে এবং এতে তিনটি স্তরে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া হয়। অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত লুম্পেন দর্শক স্বাস্থ্যবতী অভিনেত্রীর যৌবনশ্রী দেখে পুলকিত হয় এবং জোতদারকে পেটাতে চায়। অভিজাত দর্শকেরা চাপা হাসি হাসেন। কেবল মধ্যবিত্ত মূল্যবোধপরায়ণ প্রয়োজনে-বামপন্থায়-বিশ্বাসী দর্শকের গায়ে কাঁটা দেয়। এমনকি, বাংলা আর্ট ফিল্মে এসময় কৃষ্ণের ভূমিকায় নীলকণ্ঠ ছুটে আসে।

নিউজ মিডিয়াগুলি এখন ভুলভাবে হলেও সক্রিয়। কাগজে নানাধরনের ধর্ষণ, পণপ্রথাজনিত নারী-নিগ্রহ ছাপা হয়। লোকে এসব পড়ে, জানে। দেশের গ্রাম শহরের মিশ্র অর্থনীতিতে আজ যে অসামাজিকতা কাজ করছে, তা প্রাতিষ্ঠানিক। পাঁচতারা হোটেলে কোন পারচেজ অফিসারের ঘর থেকে বিনুনি বাঁধতে বাঁধতে একটি তরুণী বেরিয়ে এলেই[১২] ঐ অবক্ষয়ের হিম, বরফ-শীতল স্পর্শ পাওয়া যায়। দুঃখের কেননা চলচ্চিত্রে নারী-অবমাননা কিভাবে দেখান উচিত তাও এখনও সত্যজিৎ রায়কেই দেখিয়ে দিতে হচ্ছে। এছাড়া আছে কমিটমেণ্টের ভূত। ঋত্বিক ঘটক, একা, বারবার আর্কিটাইপাল ইমেজ তুলে আনার চেষ্টা করেছেন, সংযোগ সন্ধানে শেকড় খুঁড়েছেন। বাংলাদেশের উদ্বাস্তু তরুণীর মুখে দুর্গাপ্রতিমার[১৩] ইমেজ এনেছেন। কিন্তু কমিটমেণ্টের ভূত তাঁর ঘাড়ে উঠে বসে সর্বনাশ করে।

দর্শক নেই, জানা গেল কি করে? দর্শক তো তৈরি করে নিতে হয়। গোড়া থেকেই ছবি যদি একটি ভিন্নখাতে ভিন্নপ্রবাহে চলতে থাকে,—দর্শক আর ছবির মানুষগুলির মধ্যের চীনের প্রাচীরটি যদি তুলে নেওয়া সম্ভব হয়, যদি সত্যিই আন্তরিক সংযোগের চেষ্টা থাকে, দর্শক হাত বাড়িয়ে দেবে।

আসলে বিযুক্তি এবং বিচ্ছিন্নতা গোপনে কিছু পরিচালককে তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে। তুলনামূলক আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, এদের পাশাপাশি ত্রিবান্দ্রাম ও বোম্বাই-এর আর্ট ফিল্ম নির্মাতারা অনেক সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রফেশনাল। তাঁদের কাজ দেখে মনে হতে পারে, এঁরা প্রযুক্তিবিদ্—কনষ্ট্রাকশন সাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই পরিচালক-চিত্রনাট্যকার-অভিনেতা-অভিনেত্রী-ক্যামেরামানের দলগুলি সর্বস্তরে আমূল ব্যর্থ নন। এদের ছবি দর্শক পয়সা খরচ করে দেখে। দুর্ভাগ্যের, বাংলার যাবতীয় বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী পরিচালককে বোম্বাই এর ঐ গোষ্ঠীবদ্ধ গ্ল্যামার ভাঙিয়েই পুরস্কার পেতে হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে চটজলদি সংযোগ-মাধ্যম। বিজ্ঞাপনের পৃথিবী সর্বদাই রঙিন, আশাব্যাঞ্জক, ঝলমলে। অ্যাড ফিল্ম অন্য এক স্তরে কমিউনিকেশন নিয়ে নিত্যগবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। একজন বাঙালি পরিচালকের সংযোগ নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকলেই দ্রুত না বুঝে এগিয়ে যান আদিবাসী সমাজের দিকে অথবা পৌরাণিক ইমেজ নিয়ে অকারণে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেন। অথচ তিনি হয়ত স্রেফ চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে নাম করতে চান। ফলে প্রচণ্ড ব্যর্থতা ও হতাশা। অথচ তাঁর পক্ষে অনেক সুবিধাজনক হত ধীমান ছাত্রের মত বিজ্ঞাপন-চিত্রের কৌশল লক্ষ্য করা।

প্রয়োজন তথ্যচিত্র নিয়ে ব্যাপক গবেষণা। এই সুপারসোনিক জেটগতির পৃথিবীতে

কাহিনীচিত্রের প্রয়োজন হয়ত ক্রমশই কমে আসছে। গল্প শোনার উৎসাহ ক্রমে কমে আসছে, আসবেও। দানিকেন, অরণ্যদেব, প্রিন্সেস অফ ওয়েলস্ ডায়না, জোতদারের হুঁকো, এসব ভৌতিক গল্প ঝেড়ে ফেলে মানুষ প্রয়োজনীয় ইনফর্মেশন চাইবে। সেই সময় কি এসে যায়নি, যখন হাড-হিম-করা ভয়ের সত্যিই কিছু আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হতে পারে?

তথাকথিত আর্ট ফিল্মের পূজারীবাই কাহিনীচিত্রের শবযাত্রায় যোগ দিয়েছেন কিনা, তাও ভেবে দেখার সময় এসেছে।

১. পদী পিসির বর্মী বাক্স—অরুন্ধতী দেবী। ২. নিধিরাম সর্দার—উমানাথ ভট্টাচার্য ও রবি ঘোষ ৩. সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা—রবি ঘোষ ৪. বিলেত ফেরৎ—চিদানন্দ দাশগুপ্ত ৫. উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, সৈকত ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত প্রমুখ ৬. কলকাতা ৭১, কোরাস—মৃণাল সেন ৭. ছেঁড়া তমসুক, মালঞ্চ—পূর্ণেন্দু পত্রী ৮. ফটিকচাঁদ—সন্দীপ রায় ৯. একদিন প্রতিদিন—মৃণাল সেন ১০. ময়না তদন্ত—উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ১১. দূরত্ব—বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত ১২. জনঅরণ্য—সত্যজিৎ রায় ১৩. যুক্তি তক্কো গপ্পো—ঋত্বিক ঘটক।

সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব এবং জনগণ

ক্ষেত্রগুপ্ত

প্রথম প্রস্তাব

সাহিত্য : একটা পুরনো যুদ্ধ, একটা নতুন চ্যালেঞ্জ

১. ভাষার শক্তি, ভাবার সীমাবদ্ধতা

মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটিয়ে মিটিয়ে ভাবসংযোগে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাধ্যম হয়ে উঠেছে ভাষা—সেদিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালীও। ভাষাকে বদলে নেবার, নতুন কাজে লাগাবার, নতুন ভাবের উপযোগী করে তুলবার সুযোগও অনেক,—তাছাড়া কথা বলবার সময়ে চোখেমুখে সারা দেহে স্বভাবত এমন অভিব্যক্তি আসে, আনা যায়, যা অন্যের কাছে ঠিকঠাক পৌঁছতে সাহায্য করে।

ভাষার এই ক্ষমতার তুলনায় তার সীমাবদ্ধতাও কিছু কম নয়। দুই ভাষার দূরত্ব তো আছেই , এক ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে জেলায়, একপ্রান্ত থেকে অন্য সীমান্তে উচ্চারণে—কিছু বা বাক্যবিন্যাসে সুবোধ্যতা আহত হয়। আর শিক্ষিতজনের ভাষা কি সবটা পৌঁছয় শিক্ষাহীনের মনে ? মনের ফারাক এক ভাষার মধ্যেই বোঝাবুঝির সেতুবন্ধে অবিরত হিমসিম খায়। তবুও রোজকার কাজ-কারবার চলে, কারণ এসব সীমা ডিঙিয়ে যাবার কতক বল আছে ভাষার—আর গরজ বড় বালাই।

যেখানে সরাসরি সামাজিক উপযোগিতা নেই, যদি বা থাকে তো ফল জোটে না হাতে-হাতে সেখানে—অর্থাৎ সাহিত্যে ভাষার সঞ্চার-ক্ষমতার চূড়ান্ত ব্যবহার, তেমনি প্রতি পদে সঙ্কট ; সমস্যার মুখে দাঁড়ানো, তাকে উত্তীর্ণ হওয়া, আবার নতুন সমস্যা—নতুন লড়াই ইত্যাদি।

শিল্পের দরবারে সাহিত্য ভাষাশ্রয়ী বলেই সমাযোজনের অনেক অস্ত্র তূণে নিয়েই এসেছে, ভাষার ব্যবহারিক ভাণ্ডারে যা স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে এবং পরিমাণে বাড়ছে। সাহিত্যের ভাষা ছবি আঁকছে, তাতে রঙ ধরাচ্ছে, চলচ্চিত্রের গতিময়তা আনছে, প্রয়োজনে তাকে বিবর্ণ করছে, ফ্রিজ করে দিচ্ছে—কখনো গতি থেকে স্থিতিতে, রঙ থেকে বেরঙে এ-সব ছবির মুহুর্মুহু রূপবদল, বর্ণশাস্ত্রে-অজ্ঞাত বর্ণসম্পাত, বর্ণের রূপান্তর গন্ধে কিংবা সুরে এবং সুরকে নিয়ে-আসা দৃশ্যময়তার ফ্রেমে। অর্থাৎ ভাষার দৌলতে অন্যশিল্পকে আত্মসাতের শক্তি সাহিত্যেরই, এবং ইন্দ্রিয়মুখী আবেদন-সৃষ্টি—ইন্দ্রিয়-আবদনে বিপর্যয়ের। জীবনের মোটা রূঢ় প্রাত্যহিকতা, পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর সমারোহ, নিগূঢ় সমাজ-বিশ্লেষণ থেকে অতিসূক্ষ্ম কাল্পনিক স্বপ্নচারিতা, অলীক অনস্তিত্বের শূন্যতা—

সর্বব্যাপী সাহিত্য-ভাষার বিচরণ। ভাষার মৌল সামাজিক ভিত্তি যে অর্থময়তায় তাকে মেনে এবং ভেঙে সাহিত্য নিজের প্রকাশ ক্ষমতাকে আশ্চর্য বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি দিয়েছে।

কিন্তু এই অসামান্য শক্তি জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা নিয়েও সাহিত্য আজ, বিশের শতকের শেষপাদে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

যারা একসময়ে সাহিত্যের উপাদান-উপকরণ ছিল, অথবা সাহিত্যকে আশ্রয় করে যারা বেড়ে উঠেছিল তারা ক্রমে স্বাধীন হয়ে উঠল, সাহিত্য ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করল, তার কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিল। গত দুই-তিন দশক ধরে সাহিত্যের আমলে এই সমস্যাই ক্রমে বড় হচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার প্রশ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে।

২. নাট্য গ্রাহ্য অভিনয়ে

যতই বলি, অভিনয়ে নাটকের সার্থকতা, অভিনয়-নিরপেক্ষ শুধুই সাহিত্য হিসেবে তার দাম কমে নি। বরং সোফোক্লেস-কালিদাস শেক্‌সপিঅর-চেখভদের নাটক সেরা সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে আসছে। আধুনিক ব্রেখ্‌ট বা ইউনেস্কোর নাটক তো সাহিত্যই, যতই থাক তাদের প্রয়োগে বিচিত্র ও অভিনব সব প্রকরণ। সম্প্রতি কিন্তু এই প্রাচীন সুদৃঢ় দুর্গটি আক্রান্ত হয়েছে। সাহিত্য বর্জিত, অভিনয়-সর্বস্ব একটি নব্য থিয়েটার নিয়ে আজকের য়ুরোপ-আমেরিকা যথেষ্ট উত্তেজিত—যাকে সাময়িক হুজুগ বলে অবহেলা করলে অন্ধত্ব হবে। মুখের ভাষা দেশের ভূগোলে বড় সীমাবদ্ধ। অনেক বেশি সর্বজনীন দেহের ভাষা। ফিজিকাল অ্যাক্‌টিং নিয়ে ও-দেশের থিয়েটারে এখন অনেক সোরগোল। মাইম থিয়েটারের নতুন নানা পদক্ষেপও লক্ষ্যহীন নয়। ভাষায়-গড়া নাট্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, এ-অবস্থায়, কি দাঁড়াবে ভাবার মতো।

৩. 'তুমি কি কেবলই ছবি?'

জন্ম থেকে চলচ্চিত্র সাহিত্যকে আশ্রয় করেছে আবার অস্বীকারও করেছে। নামী উপন্যাসের ছবি করতে গিয়েও বড় পরিচালক স্বাধীন থাকতে চেয়েছেন, সাহিত্যকে কাঁচামাল হিসেবেই ব্যবহার করেছেন, সাহিত্য-রসিকদের তিরস্কার গ্রাহ্য করেন নি। যাঁরা সাহিত্যকে এড়িয়েই শুরু করেছেন, তাঁরা ছবির পর ছবি জুড়ে একটা গল্প বা প্রায়-গল্প, একটা ভাব—স্বর বা দর্শন গড়ে তুলেছেন। সব জাত চলচ্চিত্রই, সাহিত্যের ঘরে সিঁদকাঠি লাগাক কি না, মূলত ভিস্যুয়াল—দেখবার, তারপরে শুনবার। এই গৌণ শ্রুতিমূল অংশটুকুতে নানা ধ্বনি ও সঙ্গীতের সঙ্গে থাকে ভাষা—সংলাপের ভাষা।

সিনেমা তাই ভেতরে চিরকালই অ-সাহিত্য; ক্রমে সেই চরিত্র আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। কোন রকম সাহিত্যের ধার ধারছেন না আধুনিক ত্রুফো-গোদারেরা।

৪. আত্মসমর্পণের দিকে কয়েক পা

ভাষার বাড়তি সামর্থ্য শব্দের অর্থে-অনুষঙ্গে নানা ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দেওয়ায় ও অতৃপ্ত করায়। ফলে লেখায় ছবি ফোটে, রঙ ধরে, সুর জাগে। সাহিত্যের সর্বগ্রাসী স্বর্ণযুগে সে শুদ্ধ সুরকে অনেকটা কথার সীমায় এনে ফেলেছিল। মেঠো গানে এর সূচনা, কুলীন সৃষ্টিতে বিস্তার। কিন্তু সাম্প্রতিক দেশী-বিদেশী পপ-ডিসকোর আসরে কথার চেয়ে অর্থহীন বা ইঙ্গিতময় আওয়াজের মাত্রা বেড়েই চলেছে। সেখানেও কাব্য পিছু হঠছে।

কিন্তু সাহিত্যের ভাগ্যে আরও বড় মার জমা হয়ে উঠল ছবির ঘরে। চিত্রকলা ভাস্কর্যের সঙ্গে সাহিত্যের সরাসরি অন্তরঙ্গতা ঘটার তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু বুক-ইলাসট্রেসনের মধ্য দিয়ে রোগের বীজ ঢুকবে কে জানত? বইয়ে-আঁকা ছবি সাহিত্যের তাঁবে থেকেছে। স্থানটা ছিল গৌণ, আর অপরিহার্য ও নয়। ক্রমে ছবি হয়ে উঠল আসল, ভাষার সংক্ষিপ্ত টিপ্পনিকে সঙ্গে নিয়ে সুতো বাঁধা ছবির পরে ছবি গল্প-পাঠকের খিদে মেটাতে আবির্ভূত হল। 'কমিক্স' নামক এই নব্যশিল্প—যদি আদৌ একে 'শিল্প' বলা চলে—জনপ্রিয়তার জোরে বাজি জিতবে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

৫. অকাল মৃত্যুর অপেক্ষায় নাকি?

কে কতটা ভালো বা উঁচু, সে বিচার না-করেই বলব, টিভি-রেডিও-ফিজিকাল থিয়েটার-মাইম ইত্যাদি মানুষের ইন্দ্রিয়প্রেমকে মূলধন করে, চোখের-কানের দরজায় সোজাসুজি ধাক্কা দিয়ে, অতি প্রাচীন কিন্তু মৌল আবয়ব-প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে জগৎ জয়ে বেরিয়েছে। জন্মে অনেক তরুণ হয়েও আজ এরা সাহিত্যের সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

বুদ্ধিগ্রাহ্য—এবং যখন আবেগপ্রাণ বা ইন্দ্রিয়মুখী তখনও বুদ্ধিমাধ্যম[১] সাহিত্য এই যুদ্ধে কি অকালমৃত্যুর অপেক্ষায়?

যদি বলি, ভিডিও-টেপ বা নব্য থিয়েটারি এক্সপেরিমেন্ট এই তৃতীয় বিশ্বে, বাংলায় কতটাই বা সাধারণ মানুষের কাছে, সাধারণ মানুষের দিকে—সাহিত্যের সামনে এর চ্যালেঞ্জটা তেমন গুরুতর কিছু নয়, অন্তত এখনও বহুকাল ততখানি মারাত্মক হয়ে উঠবার আশঙ্কা নেই, তাতেও অবশ্যি শান্তি ও নিশ্চিন্ততা আসবে না। উল্লিখিত বিধিব্যবস্থাগুলি এদেশেও সেই সমাজ সীমায় দাঁত ফুটিয়েছে, যে পরিধির মধ্যে আমাদের সাহিত্য ঘুরে বেড়ায়। আর চলচ্চিত্রের-রেডিওর মতো গণমাধ্যম যে এখনই অনেক পরিব্যাপ্ত তাতে সন্দেহ কি? এদের সঙ্গে সাহিত্যের যতটুকু মিতালী আজও আছে, তা নেহাৎ অধীনতামূলক মিত্রতা বলে বেশিদিন তার ভরসায় থাকা যাবে না।

১ যে কোন সাহিত্যই অন্যশিল্পের তুলনায় উপভোক্তার বুদ্ধির উপরে অনেক বেশি নির্ভর করে। পড়া বা শোনার সঙ্গে চাই অর্থবোধের ক্ষমতা—তবেই তার আবেদন। ন্যূনতম বুদ্ধি না হলেই নয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব
সামাজিক ক্রিয়া, 'সহৃদয়' সামাজিক

১. 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে'

অন্য সব সুকুমার কলা-সহ সাহিত্য কোন সামাজিক প্রক্রিয়া কিনা, তা নিয়ে তর্ক বহু প্রাচীন। শিল্পদর্শন বা এস্‌থেটিক্‌সের দিক থেকে এই প্রশ্নের গহনে ঢুকে পড়া বর্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য নয়। মূলত যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করা এই প্রবন্ধের অভিপ্রায় তা অবান্তর হয়ে পড়ে যদি সাহিত্যকে তার সৃষ্টি-চর্চা-পঠনকে সমাজোর্ধ বা বিবিক্ত আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়। আর যাঁরা মানবচিত্তে অন্নময় প্রাণময় ইত্যাদি কোষের বিভাজনকে চূড়ান্ত ও অনড় মনে করেন, সাহিত্যকে এক অলৌকিক আনন্দময় সত্তার প্রকাশ বা লীলা বলে রায় দেন, কিংবা যাদের সিদ্ধান্তে সাহিত্য 'অকাজের কাজ', 'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' তাঁদের সঙ্গের আপাতত কলহে প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন দেখি না। সে রণক্ষেত্র স্বতন্ত্র। কিন্তু সাহিত্যের যে সব সম্পর্ক, সমস্যা, দায় ও দায়িত্ব বর্তমানে আলোচ্য তা একান্তই সামাজিক। সাহিত্যের শিল্পরূপ বা লক্ষ নিয়ে যে সব ভাবনা এখানে আসছে তার এক পা সমাজতত্ত্বে।

অন্য সব দিক না-হয় ছেড়ে দিলাম, তো দেখা যাবে রচনা মুদ্রিত হয়ে বাজারে আসছে পণ্য হিসেবে। সমানে চলছে বেচাকেনা বিয়ের উপহার সাহিত্য-সভা আলোচনা গবেষণা পড়াশুনা পুরস্কার সম্বর্ধনা। রয়েছে বড় মেজো পত্রিকা, গ্রন্থাগার-পাঠাগার, স্কুল-কলেজ, লিটল ম্যাগাজিন, প্রকাশন সংস্থা, বই মেলা। এ সবগুলিই সামাজিক ক্রিয়াকর্ম। পুরনো দিনে এত সব কাণ্ডকারখানা যখন ছিল না, তখনও পুঁথি পাঠ হত আসরে বা ভূস্বামী-নৃপতির দরবারে। সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের সৃষ্টিশালায় সমাজ নিশ্চিত বসে থাকে, যারা শক্ত বেড়া বাঁধতে চান অস্মিতার আত্মচলনায় সেখানেও সিঁদ কেটে দেশ-কাল ঢুকছে। আত্মচলনা এজন্য—যে ভাবায় তিনি ভাবছেন, মানস-মূর্তি তৈরি করছেন, আর নিজেকে প্রকাশ করেছেন সেই ভাষা ব্যাপারটাই পুরো সমাজিক।

২. 'একাকী গায়কের নহে তো গান'

যিনিই যখন কিছু লেখেন বা বলেন, তা করেন অপরের কাছে পৌঁছবার জন্যই। ধ্যানের সঙ্গে শিল্পীর পার্থক্য সেখানে। আমার প্রবন্ধ শিল্প নিয়ে, ধ্যান নিয়ে নয়। এদেশে 'ধ্যানী শিল্পী' বলে স্তুতি চালু আছে—অধ্যাত্মবাদের দিকে বেশি ঝোঁকের ফল সেটা। সেক্ষেত্রেও 'ধ্যানী' পদটি শিল্পীর বিশেষণই। আর শিল্প মানেই রূপ—ভাষায় বা রঙে বা সুরে বা অন্য কোন উপায়ে। এরা সবাই বাহন, শিল্পকে অন্যের কাছে

পাঠাবার। শিল্পের ক্ষেত্রে এই বাহন শুধু বাহনই নয়, শিল্পই। যেমন সাহিত্যে ভাষা উপায় মাত্র নয়, লক্ষ্যও। অর্থাৎ যা বাহন তা আবার বাহিতও।

তাহলেই দুটো প্রান্ত, লেখকের এবং পাঠকের-দর্শকের-শ্রোতার। এদের মধ্যেই যাতায়াত, সাহিত্যের এবং যাবতীয় শিল্পের। শুধু সাহিত্যের কথায় আসি। লেখক ছাড়া অন্য লোকের ভূমিকা মানতেই হয়। সেই অন্য লোক কে কারা তাদের স্বভাব ইত্যাদির কথা না ভেবে পারেন না সাহিত্যিক। তিনি ঠিকই জানেন কাদের জন্য লিখছেন। চারণ গানের সরল মাঠো সুর ও মেজাজ, সহজবোধ্য উত্তেজনা কিংবা রাজসভার কৃত্রিম মার্জিত নাগরবৃত্তি—জেনে-শুনে তৈরি করেন কবি। ভালো কবি যিনি, অভিপ্রেত এই পাঠক/শ্রোতা তাঁর সৃষ্টি উৎসে বাসা বাঁধেন। লেখকেরা কেউ বলেন, 'My guests are few but selected। তত্ত্ববিদের উক্তি 'সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসের অভিব্যক্তিই কবির লক্ষ্য।' এই মতেরই মার্জিত সংস্করণ, 'পৃথিবীতে অনেক লোক কবিতা সম্ভোগ করেন, করতে চান—তাতে সুখ পান, দুঃখ পান ; তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি লোক কবিতা পড়েন না, পড়াব দরকার বোধ করেন না, কবিতায় তাদের হর্ষশোক নেই।' অর্থাৎ অধিকারভেদ। এত সহজে বেশির ভাগ মানুষকে গান না-শোনার দলে ফেলা যায় না, ফিল্ম না-দেখার গোষ্ঠীতে। থিয়েটার-যাত্রার আসর থেকে পলাতকের আনুপাতিক সংখ্যাও বেশি নয়। সাহিত্যের তুলনায় এইসব শিল্পের কমিউনিকেশনের ক্ষমতা বেশি বলেই যদি এমন ঘটে, তো সাহিত্যের সংযোগশক্তি বাড়াবার পথ খোঁজা যায় না? অন্য শিল্পে অধিকারভেদ যদি অধিকাংশকে বাতিল করার পক্ষে না হয়ে থাকে সাহিত্যেই বা তা কেন ঘটবে? অনধিকারীই হোক-না ব্যতিক্রম।

সেকালে আসরে রামায়ণাদির কথকতা হত। কীর্তনে গাওয়া হত মহাজনদের পদ। রয়ানি-ভাসানে মনসার পাঁচালি, অষ্টমঙ্গলা গানে চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করা হত। সাহিত্যে পরিবেশনার এই সব প্রক্রিয়া কোন অধিকারী ভেদ রাখে নি। ব্যাপক নিরক্ষরতা বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। বাংলায় মধ্যযুগে কোর্ট-পোয়েট্রি কতটুকুই বা। আর মৌখিক সাহিত্যের (যেমন নানা জাতের গীতিকা বা কাহিনী-কিস্সা) লক্ষ্য ছিল আপামর সাধারণ। প্রশ্ন করা চলে রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণব কবিতা বা মঙ্গলকাব্যের আবেদন ব্যাপক হতে পেরেছিল তার ভক্তিবাদী ধর্মীয় আবেদনের দৌলতেই, সাহিত্য হিসেবে নয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যারা পরিচিত তারা সবাই জানেন ধর্ম এবং জীবন সে সাহিত্যে ওতোপ্রোত ছিল। বৃহৎ জনজীবনের সঙ্গে তার যে সংযোজন তা সাহিত্যসংযোগই। শুদ্ধ ভক্তির আকর্ষণেই ঐ সব অনুষ্ঠানে সবাই ভীড় করত, কোন যুগের সর্বসাধারণকে

এমন ঐকান্তিক ভক্তিবাদী বলে মনে করার কারণ নেই। ভক্তিও ছিল, কাব্য-রসও ছিল, ভক্তিতে কাব্য রসে বিরোধ ছিল না। তাছাড়া গীতিকা-কিস্সা এবং অন্যবিধ লোককথা সাহিত্য হিসেবেই জনমনের সরিক হয়েছিল। সমস্ত মধ্যযুগেও কিন্তু অধিকার ভেদের প্রাচীর ওঠে নি সাধারণ মানুষ ও সাহিত্যের মধ্যে।

অবশ্যই এদেশের শিষ্ট সাহিত্যে জনতার দাবি ছিল না, বিশেষ সংস্কৃত ভাষার দরবারী কাব্যে, নাট্যাভিনয়ের আঙ্গিনায়। সেই সব কাব্য-নাটকে ঘিরে একটি অতি পরিশীলিত, উচ্চ ও সূক্ষ্ম সাহিত্যতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল—সেখানে সামাজিক মানুষকে 'সহৃদয়' বিশেষণে পৃথক করে নেওয়া হয়েছিল। রসিকজন তারা, সাহিত্যের যথার্থ স্বাদ তারাই পেতে পারেন।

সাহিত্য নিয়ে যারা চর্চা করেন, এটা যাদের পেশা ও নেশা তাদের আছে বিশেষজ্ঞের বোধ—থাকতেই পারে। সব বিষয়ের মতো সাহিত্যেও রসিক বিশেষজ্ঞ থাকবেন, তারা গবেষক সমালোচক বিচারক। তাই বলে তাদের জন্যই তো সাহিত্য লেখা হয় না। আরও বড় পাঠক শ্রেণীর কথা ভাবেন লেখকেরা। কিন্তু কত বড? আর কেমন তার চেহারা?

শুধু সহৃদয় নয়, সামাজিক মানুষের নিবিড় সান্নিধ্যের খোঁজে কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যেমন—

এক. জনপ্রিয়তা, বাজারের পণ্য, পেশাদারী—বিশেষভাবে উপন্যাস নিয়ে এই সূত্রগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

দুই. আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা, শিল্পীর নির্জন বিচ্ছিন্নতা।

তিন. গ্রুপ থিয়েটারের নাটক এবং যাত্রার জনসমুদ্র।

চার. গণমুখী ছোটগল্প নিয়ে ভাবনা—শিকড়ের সন্ধান।

তৃতীয় প্রস্তাব

উপন্যাস ঃ জনপ্রিয়তা ও পেশাদারী

১. গল্পের মোহ, 'গল্পহীন' গল্প

এ দেশের বড় সাহিত্যাঙ্গগুলির মধ্যে উপন্যাস সবচেয়ে সাধারণ পাঠকের মনের মতো। নাটক ভালোবাসে বাঙালি, আসলে ভালোবাসে থিয়েটার। ছোটগল্পের আগেকার জনপ্রিয়তা আর নেই। ব্যাপারটা দুঃখের, কারণ এক সময়ে বাংলা গল্প দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল। এখন খোঁজ নিলে দেখা যাবে উপন্যাসের চেয়ে ওর বিক্রি কত কমে গেছে। বড় পত্রিকার পুজো সংখ্যায় বরং খুদে মাপের আটখানা 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাস

বেরুবে—ছোটগল্পের আয়োজনটা যেন ধরার মধ্যে নয়। আসলে উপন্যাস বলতে সমালোচকেরা যা-ই বুঝুন, পাঠকেরা পড়তে চায় গায়ে গতরে মোটা গল্প, এক নিশ্বাসে ফুরোয় না, ইঙ্গিতে যা কাজ সারে না, তার সব কিছু সুবোধ্য সরল এবং সমাপ্ত।

এ-কথা মানতেই হবে গল্প বলাই ছিল উপন্যাসের আসল কাজ গদ্যে বাস্তব জীবনের গল্প—মানুষের কথা, দেহের মনের কাজের কর্মের। কিন্তু উপন্যাসের জন্মের ঢের আগে আগে থেকে নানা ঢঙে সাহিত্য গল্প তৈরি করেছে,—মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য, গদ্য বা পদ্য রোমান্স নাটক-রূপকথা সবাই। গল্প জিনিসটা উপন্যাসের কিছু নিজস্ব সম্পত্তি নয়, নতুন আবিষ্কার নয়।

সৃষ্টির সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে চলল মানুষ গড়া—যার সাহিত্যিক নাম চরিত্র রচনা। সিধে-বাঁকা সত্যি বা আজগুবি—রকম-বেরকমের মানুষ তৈরি হয়েছে রূপকথা মহাকাব্য আখ্যানকাব্য গদ্য-পদ্য রোমান্স নাটকের কারখানায়। লেখকের লেখায় ক্লান্তি নেই, পাঠকের পড়ায়ও। রূপকথা বলিয়ে ঠাকুমারা ঝুলি থলে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছেন, মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য-রোমান্স পৃথিবী থেকে মহাকালের নিয়মে লোপ পেয়েছে। নাটক গল্প-বলা ছেড়ে দিয়েছে অনেক কাল—অন্তত পক্ষে আধুনিক নাটকের অনেকগুলো বড় স্রোতই বইতে শুরু করেছে এমন খাতে যার ঘাটে বা তটে নানা আস্ত-ভাঙা ছবির ভীড়, মানুষ-জন সোজা বা বাঁকা বা আভাসে আইডিয়ায়, ছিটেফোঁটা সঙ্কেতে দাঁড়িয়ে, কিন্তু গল্পের জায়গা মিলছে না। য়ুরোপ আমেরিকায়, আধুনিক জাপানেও কিন্তু উপন্যাসের বড় লেখকরা গল্পের শিকল ছিঁড়েছেন, গোটা মানুষ তৈরির দায় নিচ্ছেন না। বলছেন ও কাজ অনেক হল, বিধাতার ভাঁড়ারে টান পড়ল বুঝি। পুরনোর আবর্তন এবার বন্ধ হোক। গল্পটা গড়া জিনিস, ওর বাঁকগুলি ধরা পড়বে সত্য নয় বলে—চোখ মেলে তাকালেই। গল্প পড়ব প্রতিজ্ঞা করেছি বলেই আমরা মেনে নেই জীবনটা ত্রিভুজের বা বৃত্তের নিয়মে চলে, মাধ্যাকর্ষণের বাইরে ছোটে না মন। জ্যামিতিক এই আকার আর জাগতিক এই শক্তিতত্ত্ব (অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ) দিয়েই দুনিয়ার যাবতীয় গল্প বানিয়ে-তোলা। মানুষের মন আর জীবন কিন্তু ও দুটো প্রথাসিদ্ধ নিয়মকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেখানে মানুষের মুক্তি। আবার ছাপিয়ে উঠতে পারেও না—সেটা তার নিয়তি। মুক্তি বা নিয়তিবন্ধন এবং শিকল ছেঁড়ার লড়াই—এটা তার অস্তিত্ব। গল্পকে না-মানার জোরটা জন্মেছে ওখানেই।

২. জনপ্রিয়তার মাশুল

কিন্তু সাধারণ পাঠক গল্পের উত্তেজনা চায়, মজা চায়, চায় কৌতূহল মেটাবার উপাদান। শিশু যেমন 'তারপরে কি' এই প্রশ্নের সুতোয় গাঁথা কাহিনীর নিবিষ্ট শ্রোতা

সভ্যতার শৈশবের মানুষ যেমন, ঠিক তেমনি চিরকালের পড়ুয়ার বড় অংশটাও। কোন দেশেই এরা সংখ্যালঘু নয়। তাই থ্রিলার-গোয়েন্দাগল্পের সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। জনসংখ্যার মতো এসব উপন্যাসের শিরোনামও প্রায় অগুনতিতে পৌঁছতে চাইছে। এদের বেস্ট সেলারের চেয়ার বাঁধা হয়ে রইল।

তবুও পশ্চিম দুনিয়ায় গল্পহীন গল্প অন্ত্যজ হয়ে থাকে নি। ওদেশে শিক্ষিত রুচিশীল পাঠক যেমন অনেক, অনুবাদ ইত্যাদির সুযোগ অফুরন্ত, বই-কেনার বাজেটও ক্রমে স্ফীত হচ্ছে। অনায়াসে একজন অস্ট্রিয়ান বা নরওয়েজিয়ান লেখকের বই অনুবাদে সারা য়ুরোপ আমেরিকার সম্পত্তি হয়ে ওঠে।

এ-সব কথা বলার এক বিশেষ কারণ আছে, বাংলাতে শরৎচন্দ্রের পরের লেখকরা উপন্যাসের গল্পাংশকে কমিয়ে এনেছিলেন প্রাত্যহিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে। আর বাজারটাও তখন চওড়া ছিল না। খুব ভাগ্যবান না-হলে বই লিখে বড়লোক হওয়া যেত না।

এখনকার অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। পড়ুয়াদের সংখ্যা অনেকটা বেড়েছে—পশ্চিমের তুলনায় কিছু না হলেও। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে এ দেশে সেটা স্বপ্নের মতো ছিল। সাধারণ পাঠকদের খোরাক চাই। সব দেশের সাহিত্যে এই মোটা খাবারের ঢালাও বন্দোবস্ত। কিন্তু থ্রিলার-ঘেরা সেই রসুইঘর আলাদা। সেখানেও কারিগর অনেকেই পাকা হাতের। বড় বা ভালো সাহিত্য করার অভিমান তাঁরা রাখেন না। আমাদের পাঠক দুর্ভাগা। এদেশে মোটা গল্পের প্রয়োজন যারা মেটাতে এসেছিলেন তাঁরা এত দুর্বল যে মাতৃভাষাটা গুছিয়ে লিখতে শেখেন নি। জনপ্রিয়তার ধোপে দু-চার বছরের বেশি টিকলেন না। খড় বেরিয়ে পড়ল।

যারা উপন্যাসকে বাঁধা গল্প আর চরিত্রসৃষ্টির সহজ পথ থেকে সরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকের কলমে জোর ছিল, মনে ছিল সাহস। কিন্তু বাজারের বড় ফাঁকটা ভর্তি করার কাজে এরা অল্পকালের মধ্যে লেগে পড়লেন। উপন্যাসের নব সংস্করণ যখন মাসিক বন্দোবস্ত হয়ে ওঠে তখন এদেশে আতঙ্কিত হতে হয়। কারণ সামনে যারা কিউতে দাঁড়িয়ে তারা গল্পো পড়তে চায়, চায় ভালোমন্দে কামনা-বাসনায় বোনা নরনারী, বহু উচ্চারিত আবেগের প্রত্যাশী তারা। বাংলা উপন্যাসের আধুনিক প্রতিশ্রুতি তাই ডুবতে বসল জনপ্রিয়তায়।

জনপ্রিয়তায় শিল্পগুণে রেষারেষিটাই বেশি, আত্মীয়তা ঘটে কদাচিৎ। এবং আমাদের দেশে জনপ্রিয়তার সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক কতটুকুই বা। যারা পড়তে জানে, পড়তে চায়, বই কেনে বা পয়সা দিয়ে পাঠাগারের সভ্য হয়, তাদের প্রিয় হলেই

জনপ্রিয়। বড কাগজ যার পৃষ্ঠপোষক, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যার সমর্থক, বৃহৎ প্রকাশ-সংস্থা যার অনুকূল, সিনেমা-টিভি-রেডিও যার বান্ধব, সরকারী-বেসরকারী পুরস্কার যার উপরে বর্ষিত, প্রায়ই জনপ্রিয়তা তার মুঠোয়। এবং এদের এই আশীর্বাদের পেছনে কারণ কিছু থাকা চাই, প্রায়ই তা অর্থকরী বা আদর্শগত—একটু জটিলভাবে শ্রেণীস্বার্থগত বলাই বোধ হয় ঠিক।

৩. স্বাধীন উপন্যাস, পেশাদার লেখক

অস্তিত্বের ব্যাধি। যন্ত্রণার কাব্য। বিকৃত বিবেক। মূল্যবোধে বিপর্যয়। ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা। লুপ্তমূল জীবন। সময়ের ভ্রূকুটি। এ-জাতীয় কুট সব ভাবনার চারধারে ঘুরে ঘুরে আমাদের সাম্প্রতিক গল্প-উপন্যাস ভীষণ ক্লান্ত। বছর পনর থেকে এ-রোগে ধরেছে। অতি ব্যবহারে এর প্রতিটি অঙ্গ জীর্ণ। অথচ ছেষট্টি-সাতষট্টিতে আমাদের গল্পে জোরালো দু-একটি উচ্চারণ নতুন আশা জাগিয়েছিল। সময়েরও সমর্থন ছিল। কিন্তু পোকাকাটা কুঁড়ি, জন্মেই শুকিয়ে গেল। তার শব নিয়ে টানা-হেঁচড়ার বিরাম নেই। যে মনোবিকার-দেহবিকার—খুনিয়াবি উত্তেজনা জীবনের একটা আংশিক বাস্তবতা তাকে ফাঁপিয়ে সর্বব্যাপী করে দেখা চলল। মাঝে মাঝে এদেশকে পশ্চিমা দুনিয়া বলে বিভ্রম হতে লাগল। যা একের বোধে ধরা দিলে একটা প্রান্তিক সত্যের উদ্‌ঘাটন হত, তাকে বহুজনের নির্বিচার প্রয়োগ একটা সস্তা 'ক্লিশে' করে তুলল। আধুনিক উপন্যাস মানেই 'সেক্স-ভায়োলেন্স মর্বিডিটি'। না হলে মডার্ন বলে শিরোপা মিলবে না।

ঐ-সব চেতনা আসলে ওঁদের অনেকেরই ভেতর থেকে ওঠেনি; অনেকটাই বাইরে থেকে ধার-করা পড়ে-পাওয়া চোদ্দআনা গোছ—প্রায়ই ফ্যাশান। এঁরা সবাই জীবনানন্দ+মানিক বন্দ্যো+আরও কিছু, আরও আধুনিক আরও স্মার্ট আরও দুঃসাহসী। তারপর যখন লিটল ম্যাগাজিনের বাহবা কাটিয়ে বড গাছে নৌকো বাঁধা গেল, তখন এঁরা কাফকা-কামুর নিচে থাকতে চাইলেন না। জীবনে আচরণে সুখ-ভোগ বিলাসের অপর্যাপ্ত আয়োজন, অন্তরে যুগযন্ত্রণার দাহ, লেখায় অস্থির বিকার। জীবনে-মনে-সাহিত্যে হিসেব মেলে না। যেন দুর্জ্ঞেয় রহস্য! সত্যই রহস্য নাকি? কাদের নিরুচ্চার প্ররোচনা এই ব্যাপক অতিব্যবহারের পেছনে কার্যকর বোঝা খুব কঠিন নয়।

বাংলা সাহিত্যে যাঁরা চিত্তব্যাধি এনেছিলেন, তাঁরা ভীষণ শক্তিমান আর অসাধারণ দর্পী ছিলেন, আর জীবনে-মনে-ব্যবহারে আপন বোধের বৃত্তে অটল আন্তরিক। মানিক-বাবু জীবনানন্দের কথা বলছি।

জীবনানন্দ কাব্যটাকে পেশা করেন নি, উপায়ও ছিল না। কবিতা লেখা ছেড়ে বা লেখার পাশে পাশে বড় কাগজে জনপ্রিয় উপন্যাস রচনার অভ্যাস করেন নি। মানিক-বাবু পেশাদার লিখিয়ে ছিলেন, এটাই তাঁর জীবিকা। তিনি বই-বিক্রির পয়সায় পেট ভরাতে চাইতেন, আত্মবিক্রির অর্থে নয়।

আজ কিন্তু পেশাদারী বাংলা গল্প-উপন্যাসকে পথে বসিয়েছে।

৪. সাহিত্য যখন পণ্য

অবশ্য পণ্য হিসেবে বেচা-কেনার বাজারে সাহিত্যকে নিয়ে আসার মধ্যে যুগোত্তরণের গৌরব ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার ভারতচন্দ্রের কাব্যপাঠ 'ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়' (জীবনানন্দ)—এই লাইনগুলোর কথা মনে করায়। ভূস্বামী-মনোরঞ্জনে জনসাধারণের সব লেখাই 'ছিন্ন খঞ্জনার' নৃত্য ছিল না। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্মের সেই ফিউডাল বন্ধন থেকে পুঁজির স্বাধীন বাজারে, বহু ক্রেতা-কর্তার কাছে সাহিত্য-পণ্য তুলে ধরবার মধ্যে লেখক এক সময়ে মুক্তি পেয়েছিল। এত বৈপ্লবিক আবহাওয়া বদল ছিল। বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় নিজের বই ছাপতেন বেচতেন। সরাসরি দোকানদারি এবং স্বাধীন ব্যবসা। কিন্তু পেশাদার ছিলেন না।

বিশেষ করে আমাদের ভাষায় ছোট বাজারে, যেখানে ফ্রি ট্রেডের সুযোগ কম, যেখানে ধনশালী মালিক সংখ্যায় কম—তাই মোনোপলি, সেখানে পেশাদার হওয়ায় যে-সব প্রভুর মর্জি পূরণে লেখককে অতন্দ্র থাকতে হয় তা বড় ভীষণ। যেমন—

১. বড় কাগজের কর্তৃত্ব। এ বড় আশ্চর্য কিছু কিছু দৈনিক পত্রিকা এদেশে উপন্যাসাদি লেখার নিয়ন্তা।

২. বই-পড়ুয়ার সংখ্যাল্পতা—তাদেরও বড় ভাগের রুচির সঙ্কীর্ণতা।

ওই মালিকদের মন জুগিয়ে চলতে গেলে যে বস্তু মনের কলে লেখক বানাবেন তাতে শিল্পের স্বাধীনতা কতটা বজায় থাকে ভেবে দেখবার। যুগ-যন্ত্রণার নাম করে কিছু স্টক উপাদান নিয়ে কারবার করাই স্বাধীনতা?

সাহিত্য-সৃষ্টিতে বড় মালিককে তোষণ আর জনসাধারণকে খুশি করা—তার নিত্য ভোগের মাল সরবরাহ—এ দায়িত্ব নিলে নিজের কাছে—জীবনের কাছে, যন্ত্রণার কাছে খাঁটি থাকা যায় না।

এই অবস্থায়, বেশির ভাগ বাঙালি ঔপন্যাসিক যে কাজগুলি করার কথা ভাবছেন না বা ভাবতে পারছেন না তা হল—

১. জনরুচিকে বদলে দেবার, উন্নত করার কোন চেষ্টা।

২. ক্রেতাদের বাইরে অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছবার প্রয়োজনীয়তা।

চতুর্থ প্রস্তাব

কবিতা : শিল্পীর একাকীত্ব

১. বুঝবার নয় বাজবার

অল্পবিস্তর সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত যাঁরা তাঁদেরও অনেকে অভিযোগ তোলেন, 'এ বস্তু বোঝা যায় না।'

কবিদের তরফে উত্তর মজুত আছে—

'রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়েও এককালে এ-রকম কথা উঠত।'

'কবিতা পড়ার জন্য মনের ট্রেনিং চাই।'

'সবাই তো ইলেকট্রনিক বোঝে না আর কবিতাই বুঝতে হবে—তা এতই ফ্যালনা বুঝতেই হবে—মাথার দিব্যি কে দিল?' আর একটু মোলায়েম ভাষায় 'কবিতা বুঝবার জন্য নয়, বাজবার জন্য।' এর কোন যুক্তিই এক কথায় বাতিল করা যায় না। কবিতা মুষ্টিমেয় সাহিত্য-সাধকের চর্চার বস্তু—তাতেই ধরা পড়ে তার গূঢ় তাৎপর্য—অর্থভেদী সম্ভোগের রহস্য—এটা ভুল নয়। কিন্তু একথাও সমান নির্ভুল, ঐ মুষ্টির মধ্যে ধরে রাখার জন্য কবি কবিতা লেখেন না। লিখলে বড় জোর নির্বাচিত কয়েকজনের মধ্যে বিলি করতেন,—ছেপে বই করে বিক্রির জন্য পাঠাতেন না, কবি-সম্মেলনে হাজিরা দিতেন না, রেডিওতে আবৃত্তি করে শোনাতেন না। পাঠক সাধারণের আপত্তিকে তাই পত্রপাঠ উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। একালের কবিতা অনেক পাঠকের কাছে, সর্বদা নয়,—মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য। তার কতকগুলি কারণও আছে—

১. অপরিচিত শব্দ, পরিচিত শব্দের অপরিচিত অর্থ, দেশী-বিদেশী অ্যালুশন জড়ানো শব্দ। এগুলি লিজেণ্ড-মিথ্-সাহিত্য-শিল্প-ইতিহাস সব জায়গা থেকে। সঙ্কলিত।

২. শব্দের ইন্দ্রিয় আবেদনগত বিপর্যয় (দেখাকে শোনায়, শোনাকে স্পর্শে রূপান্তর ইত্যাদি) এবং ভাবানুষঙ্গ অনুমানে ব্যর্থতা।

৩. বাক্যবিন্যাসে ক্রমভঙ্গ, যুক্তির সূত্র ছিঁড়ে দেওয়া।

৪. বাক্যের প্রত্যক্ষ সরল অর্থের ভেতরের তাৎপর্য আবিষ্কারে অসামর্থ্য।

কবিরা বলতে চান জটিল দুর্বোধ্য এই যুগ ও জীবনের ভাষা এমনিই হবে। তাঁদের ব্যক্তি-অনুভূতির সূক্ষ্ম বাঁকের সঙ্গে সময়ের যোগ অতি-দুরূহ হতে বাধ্য। মোট কথা,—'আমি আধুনিক কবি, পাঠকের শিল্পরুচির উন্নয়ন চাই, কিন্তু তা শুধু আমারই শর্তে।' অথবা 'আমি কবি হিসেবে অনেক পাঠক, অনেকখ্যাতি, অনেক জাতীয় পুরস্কার চাই; কিন্তু

আমার কবিতা সেই পাঠকেরা, সেই স্তুতিকারকেরা, সেই পুরস্কারদাতারা বুঝবে না, না-বোঝার বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে থাকবে।' এ কি একটু বেশি চাওয়া নয় ?

কিছু কবির পক্ষে ঐ জটিল ভাব-ভাষা, দুর্বোধ্যতার ব্যূহ খাটি, অনেকের ক্ষেত্রে গিমিক। যাঁদের সত্যি সম্ভব নয় ওর বাইরে আসা, নিজের অস্মিতাকে ডিঙোনো, তাঁদের দু-একজন বিশেষজ্ঞের মতে সেরা কবি বলে বিবেচিত। পরিশীলিত সম্ভোক্তাদের সেই ক্ষুদ্র বৃত্তের বাইরে বৃহৎ ভূমিতে বিচরণ যে সাধারণ পাঠকের তাদের কি হবে ? মননে তীক্ষ্ণ যে-কবি জনতার মিছিলে যেতে চান তাঁর কি হবে ? একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। বড় মাপের যে-সব কবির বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ, বিষ্ণু দে তাঁদের একজন। অধ্যয়নের প্রসার এবং বুদ্ধি-প্রবুদ্ধ প্রাখর্য তাঁর কবিব্যক্তিত্বের ধাতু এবং দুরূহতার মূল কারণও।

যদিও মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রী আদর্শে বিশ্বাসী কবি গণজীবন ও মনের ব্যাপ্তিতে গভীরতায় পৌঁছতে অভিলাষী। প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহুল জ্ঞান সাধনায় জাত একধরনের অ্যারিস্টোক্রেসি এবং আপামর জনসাধারণ এই দুই প্রান্তের মিলনই তাঁর অন্বিষ্ট। এবং তার ব্যর্থসাধনাই কবির আত্মিক সঙ্কট। এর ফলে শিল্পরূপে বিষ্ণু বাবুর লেখার মান কমে নি, বরং অন্তশ্চেতনার এই দ্বন্দ্বেই তাতে বিপরীতের রঙ মিশেছে। কিন্তু যাদের মুক্তি নিয়ে কবির সব ব্যাকুলতা তাদের সঙ্গে তাঁর কবিতার দূরত্ব এত দুর্লঙ্ঘ্য।

২. 'এরেই কি মেলা কয় ? বাবুদের মেলা ?

তাদের গ্রামের মাঠে তাদের যে খেলা—'

যখন কবিতার সঙ্গে জনগণের সমাযোজন সহজ ছিল—প্রায় অনায়াস ছিল, সে কাল গত হয়েছে ইতিহাসের নিয়মেই। এদেশে কলোনিয়াল ভগ্ন রেনেসাঁর প্রতিক্রিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও জনসাধারণের মধ্যে দূরত্বটা নিদারুণভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল—তা বেড়েই চলছে। যে-সব দেশে রেনেসাঁ স্বাভাবিক—সেখানেও ফল কিছু অন্য দাঁড়ায় নি। কবিতা আধুনিক কালে অল্প লোকেরই সম্ভোগ্য—মুশায়েরা ধরনের কবিতা-পাঠের আসর জমিয়ে তার পাঠকসংখ্যা যদিবা কিছু বাড়ানো যায়, তারও পরিধি সুনির্দিষ্ট। আবৃত্তির আসর বড়জোর পাঠকের আলস্য ভাঙতে পারে, দুচারজন নতুন পাঠক যোগাড়ও হতে পারে তাতে, কিন্তু মূল সমস্যাকে স্পর্শ করে না।

এদেশে গ্রামে গঞ্জে এখনও যেসব কবিতা লোকের কাছাকাছি, তা পুরনো কবিগান সত্যনারায়ণ পাঁচালি (বীরভূম-মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কাহিনীধর্মী, আসরে পরিবেশিত) বাউলগানের ধারায় চলছে। নানা সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে বাঁধা নতুন ছড়া ছেপে

আদালতে বাসস্টপে হাটে রেলে মেলায় আবৃত্তি সহযোগে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু একে কবিতা বলেই শিক্ষিত লোক মেনে নেবে না। অন্যদিকে রেডিওয় কবিতা-পাঠ ট্রান্সিজটারের কল্যাণে দূরপল্লীর মানুষের কানে পৌঁছয়, মনে নয়।

সঙ্কট এখানেই--এবং তা সমাধানের কোন পথ আমার বা কারুর জানা নেই।

আধুনিক কবিরা অস্মিতা ডিঙিয়ে এলেই কি জনমনের আত্মীয় হবে? বা মেঠো সুর, সহজ সুবোধ্য ভাষা আয়ত্ত করলেই? কুমুদরঞ্জনের কবিতা কি বিষ্ণুদের চেয়ে বেশি লোকের কাছাকাছি? সরলচিত্ত পাঠকের যদি সংখ্যাধিক্য হয় তো, জটিল মনা পাঠকের ঘাটতি থাকবে। আর কুমুদরঞ্জনের কবিতা কি বাউল-কীর্তনের মতো লাখ লাখ মানুষের সম্পত্তি হয়ে উঠবার শক্তি ধরে? বিদ্যুৎযানের সংযোগ, বহুশত বৎসরের ঐতিহ্য, পরিবেশনের ঢঙ যদি সহায়ক হত, কি হত নিশ্চিত বলা যাবে না। কিন্তু আজ যারা আধুনিক কবিতার পাঠক, তাদের কাছে তো এর দাম হত না। বিপুল গণসংযোগের প্রতি গুরুতর দায় নিতে গিয়ে জীবনানন্দ সুধীন দত্ত যদি বাংলা কবিতায় দেখা না দিতেন, সে-ক্ষতি কি সইত? সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভোলা যায় না অগণিত মানুষকে দূরে রাখতে রাখতে কবিতা কি নিজের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলছে না? গণসংগ্রামের কবিতাতেও নেই এই সমস্যার সমাধান। এই সমস্যা বিষয়ে তীক্ষ্ণ চেতনা কোন কোন কবির মধ্য থেকে কোন সমাধান-সূত্রের জন্ম দেবে সে ও দুরাশা, তবে এই বোধ আধুনিক কবির পাঠক-পরিধি বাড়িয়ে তুলতেও বা পারে!

পঞ্চম প্রস্তাব

গ্রুপ থিয়েটারের কারিগরি, যাত্রার জনসমুদ্র

১. নাটক যেহেতু সাহিত্য

বাংলা নাটক বেশিই সাহিত্যমানে নিকৃষ্ট ছিল, জনপ্রিয়তায় যে উঁচুতে উঠেছিল তা থিয়েটারি পরিবেশনারদৌলতে। 'বঙ্গেবর্গী'-'দেবলাদেবী' জাতীয় রচনা মফস্বল বাংলার সঙ্গেও আত্মীয়তা করতে পেরেছিল। সেকালে থিয়েটার সাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল, প্রয়োগকে বাহন করে নাট্যসাহিত্য সংযোগকে অনেকখানি প্রসারিত করতে পেরেছিল, যদিও তার পরিধি মধ্যবিত্ত সমাজের সীমা ছাড়ায় নি, শিক্ষাসংস্পর্শহীন জনতা পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে নি। যাত্রার বাইরের ঢঙ আর ঐতিহ্যবাহিত ভক্তিরসের স্রোত এনেও গিরিশবাবুরা সেই বেড়া ভাঙতে পেরেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। দীনবন্ধু এককালে যশোর অঞ্চলের চাষীর মুখের ভাষায় নাটক লিখেছিলেন। লক্ষ্য ছিল

সাহিত্যিক—সমাজবাস্তবতার কর্কশ মাঠো চেহারা সরাসরি ধরে দেওয়া। তাতে শহুরে ভদ্রলোকদের কাছে আসতে অসুবিধে হয় নি। তুলসী লাহিড়ী থেকে মনোজ মিত্র পর্যন্ত অনেকের নাটকে সংলাপের ভাষা আঞ্চলিক। এটা তাদের সঞ্চার-শক্তিকে হয়ত কিছু সঙ্কুচিত করেছে, যদিও সে-সব নাটকে বস্তুতান্ত্রিক শিল্পসত্য এই আঞ্চলিকতাকে অপরিহার্য মনে করেছিল—ঠিকই করেছিল। কিন্তু তাতে সংযোগের ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ আসে নি। নাট্য-সাহিত্য হিসেবে বিচারে 'চাক ভাঙা মধু'র যতটা গুণ, শহুরে শিক্ষিত জনের কাছে এর প্রযোজনার যতটা স্বীকৃতি, যাদের জীবন আর ভাষা এতে আছে তাদের কাছ বরাবর এর পৌঁছনোই দায়। ঐ দলের একজন কিছুকাল আগে কাগজের এক সাক্ষাৎকারে দুঃখ করেছিলেন যাদের নিয়ে নাটক সুন্দরবনের সেই কৃষিজীবী জনতার কাছে এর আদর হল না।

বাংলা পেশাদারী মঞ্চের এসব ভাবনা ছিল না। কারণ সেই অগণিত জনসাধারণ তাদের নাট্য পণ্যের ক্রেতা নয়। পেশাদারী নাট্যাভিনয়ের যুগে, এটা যাঁর কাছে পেশা ছিল না, সেই আশ্চর্য ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তীব্র প্রয়োজন বোধ করেছিলেন বাংলার নবনাটকের বিচ্ছিন্নতা না ঘোচালে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিলিতি মঞ্চের অনুকরণ নয়, তার সঙ্গে থিয়েট্রিকাল যাত্রার কিছু বহিরঙ্গ কলা-কৌশল এলোমেলো জুড়ে দেওয়া নয়, সমস্যাটির গভীরে যেতে হবে। নাট্যবস্তুর মধ্যেই, সাহিত্যের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বাধা উত্তরণের ধাপগুলো থাকা চাই। গ্রামে বহুকালধরে চলে আসছিল যে সব আভিনয়িক রীতি অথবা যে সব অনাভিনয়িক রীতির মধ্যে মিশে আছে নাটক, তাকে ছেঁকে আত্মসাৎ করে ব্যবহার করা—বাইরের কিছু কলা-কৌশল হিসেবে নয়, নাট্য বিষয়ের প্রাণ থেকে উৎসারিত অচ্ছেদ্য অবয়ব রূপে। পুরনো কালীয়দমন-টাইপ যাত্রার সখীদল, জুড়িদলের গান, বিবেক নিয়তির ভূমিকা যে তাঁর নাটকের উৎসে নানাভাবে সক্রিয়তা একটু ভাবলেই বোঝা যাবে। কথকতা, কীর্তনের আসর—বিশেষ করে নগরসঙ্কীর্তন, বহুরূপী, রথযাত্রা এবং সর্বোপরি বাউলকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে একটা আন্তরিক সংযোগের সুযোগ করে রেখেছেন।[১] চারপাশের গাছপালা প্রকৃতি ঋতুর চক্রাবর্তনকে কাজে লাগিয়ে একটা নিবিড় আত্মিক বঙ্গ জগৎ গড়ে তুলেছেন। অভিজাত-প্রযোজনায় যারা একে মঞ্চঘেষা এবং সঙ্কীর্ণ নাগরিক করে তুলেছেন, তারা নাট্যকারের মহত্তর অভিপ্রায়কে ক্ষুদ্রতার জালে বাঁধছেন। গণনাট্যের মুক্তির বীজ ছিল রবীন্দ্রনাটকে ১৯১২ সালের পরে লেখা বইগুলোয়।

---

১ এ-বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ আছে।

২. শুধু ভঙ্গী দিয়ে

আধুনিক বাংলায় মৌলিক নাটক কটি? অনুবাদ, ভাবানুবাদ, অনুকৃতি—এই সব নিয়ে পনের-আনা আয়োজন। দু-চারটি স্বাধীন লেখাতেও পশ্চিমী নাট্যান্দোলনের পেছনে চলা। বাকি দুচারটিতে সোজাসুজি গণআন্দোলনের সাদামাঠা কথা। যদিও বাংলা গ্রুপ থিয়েটার, মুখে অপেশাদারী কাজে ব্যবসায়িক অথবা সুযোগ পেলেই চূড়ান্ত পেশাদারী হবার জন্য পা বাড়িয়ে, তবু সেখানেই কিছু কলাকৌশল নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট চলে—প্রায়ই বিদেশী বস্তুর হাত-ঘোরা ব্যবহার। কিছু চাকচিক্য, ওলট পালট থাকে প্রযোজনায়, থাকে নাটকেও। এগুলি বহিরঙ্গ কারণ এরা নাট্য-সাহিত্য নির্ভর হয়েও স্বাধীন দেশী নাটক লেখায় নিদারুণ ব্যর্থ; এবং সাহিত্য বিমুখ নবীনতম নাট্যান্দোলনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হলেও 'নাটক' নামক প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্যকে জীইয়ে রাখা, বাড়িয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নিষ্ফল।

৩. উচ্চরব স্থূলতার জয়যাত্রা

অথচ অভিনয়কে বাহন করে চিৎপুরের যে যাত্রাপালা বঙ্গজয়ী তা একধরনের সাহিত্যই। পেশাদারী নৈপুণ্য ব্যবসায়িক সাফল্য দিয়েছে যাত্রাকে, এবং তার আসরে নানা শ্রেণীর মানুষের ভীড়, ক্ষুদ্র একটা বুদ্ধিজীবী অংশ যদি বাইরে থাকেও। বিষয় জীবনানুগ কিংবা কাল্পনিক, অতিঅবাস্তব ও সেকেলে কিংবা আধুনিক ও শ্রেণীসচেতন—সর্বত্র আবেগ উচ্চকণ্ঠ। ঘটনা উত্তাল, তরল সেণ্টিমেণ্ট, সস্তা মেলোড্রামা—সবকিছুর চূড়ান্ত আতিশয্য। অথচ এ বস্তু প্রাচীন নয়, গ্রামীণ নয়, আদিম উৎসবাদির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। কলকাতার থিয়েটার ভেঙে তৈরি হয়েছিল। এখন তা গ্রামেরও আপনজন।

সাহিত্য হিসেবে যাত্রাপালার কোন মর্যাদা নেই। অথচ মর্যাদাহীন এই সাহিত্য একটা বড় সমস্যার সমাধান করে বসে আছে। কিন্তু কি মন্ত্রে? অথবা এ-কি সমাধান, না তার বিভ্রম?

প্রথম জনপ্রিয়তার এই সমাধান মানে উঁচু নাটককে কোন পথ দেখায় না। এই ভঙ্গির আশ্রয়ে কিছু রাজনৈতিক-সামাজিক ভাবনা সঞ্চারের সম্ভাবনা খুলে ধরে। এক সময়ে গণনাট্যের 'বাহুমুক্ত' সে সুযোগ নিয়েছিল। এখনও কোন কোন পালাকার তা নিচ্ছেন। কিন্তু সে আলোয় বাংলা নাটকের অন্ধকার ঘোচে নি। তেমন সম্ভাবনাও দেখছি না।

আর যাত্রাপালার এই বিপুল সংযোগ-ক্ষমতার রহস্য কোথায়—এর উচ্চরবে, স্থূলতায়, আয়োজনের ঐশ্বর্যে অথবা সব উপকরণের মিশ্রণে তা বিশ্লেষণ করা দরকার,

আর তার ফলাফল নতুন নাটকের ক্ষেত্রে কতটা বা আদৌ কার্যকর কিনা তা তখনই ভাবা যাবে।

ষষ্ঠ প্রস্তাব

জনমুখী শপথ ও শিকড়ের খোঁজ : ছোট গল্প

১. সেই পুরনো সংলাপ

—কোন্‌টা নিপীড়িত মানুষকে জাগাবে, সংগ্রামী ক'রে তুলবে, শোষণের মুখোশ খুলবে, সমাজতন্ত্র গড়ায় সহায়ক হবে, তাই নিয়ে ভাবো। ফর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না।

—আমার ভাবনা যত ভালোই হোক, সেটা মাঠে মারা যাবে যদি না ঠিকমতো বলতে শিখি, যেমনটি না হলে নয়, তেমনটি লিখতে পারি। সংলাপটা চলুক, বিতর্ক হতে হতে সমাধান যদি মেলে তো সমাধানের মধ্যেই নতুন বাঁক নেবে সে দ্বন্দ্ব। এভাবেই একটা ফল পাওয়া, সেটা থেকে আবার নতুন কিছু পাওয়ার চেষ্টা। সাহিত্য সৃষ্টিতে এবং সাহিত্যচর্চায় এমনটা ঘটে চলুক ঐতিহাসিক বিকাশের পথ ধরে।

যদি আমার গল্পকে জীবনের স্বাদে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যদি চাই তার সঞ্চার ক্ষমতা বাড়াতে, তবে রূপের কথা সতর্ক হয়ে ভাবতে হবে। রূপটা বাইরের ছলনা এমন আত্মাবাদী হয়ে ওঠার প্রতিজ্ঞা তো নেই।

রূপকে খোঁজা আসলে শিল্পের শিকড়ের সন্ধান—যাকে ধরা না গেলে বহু মানুষের পৃথিবী থেকে দূরে থাকতেই হবে এবং শহুরে মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিকদেরও প্রসাধন সর্বস্বতার বহিরঙ্গ চাকচিক্যের যাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে হবে।

২. শিল্পের রূপ : প্রাণের আয়না

ছোটগল্পের রূপ নিয়ে অনেক নিয়মকানুন প্রায় থেকে জানাজানি হয়ে প্রায় এঁটে বসেছে। তা কলেজপোড়ো ছাত্রদেরও শেখা আছে। সে সব মামুলি কথা ঘেঁটে লাভ নেই। অভিজ্ঞতায় তো দেখেছি শক্তিশালী লেখকেরা প্রায়ই ঐ সব আইন ভাঙেন, নতুন রীতি বানান, গল্পে গল্পে তার বদল ঘটান। গল্পের রূপ কি হবে তা নির্ভর করবে এই কটি প্রসঙ্গের উপর—

১. গল্পের বিষয়
২, লেখকের বোধ
৩. কার কাছে পৌঁছবে গল্প—সেই চিন্তা।

তিন নম্বর সূত্রটি কিছু কম জরুরী নয়, সব লেখকই জেনে বা না-জেনে ঐ চিন্তা

করেন। এককালে গর্ব করে কেউ কেউ বলতেন, 'আমার ভোজের আয়োজনে অল্প কজনই নিমন্ত্রিত—সুনির্বাচিতকজন।' একালে বেস্ট সেলার হবার লোভে ক্রেতা পাঠকদের অর্থাৎ কনজিউমারদেব মনোরঞ্জনই ব্রত। ধনতন্ত্রীযুগের সাহিত্যের নিয়তি।

যাঁদের লক্ষ্য পৃথক এবং স্পষ্ট, যাঁরা কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়া অনেক পাঠকের কাছে পৌছতে যান অথবা, শোষিত সংগ্রামী মানুষের কথা মনে রেখেই লেখেন, তাঁদের কাছে রূপের সমস্যা আরও জটিল। আজকের বাংলায় তাঁদের সামনে দুই শ্রেণীর জনতা —ক যারা পড়েন, খ. যারা পডতে জানেন না এবং পডতে চান না।

এই সব শ্রেণীকে কতকটা টেনে আনার জন্য কবিতার তরফ থেকে আজকাল নানা আয়োজন হচ্ছে, যেমন কবি-সম্মেলন, কবিতা পাঠের আসর ইত্যাদি। গল্পের জন্য এমন কোন আসর বসছে না। কোন সংগঠনের নিজস্ব গল্পপাঠের ছোট নির্দিষ্ট পরিসরে কমিউনিকেশন-সমস্যা ঘোচে না। অথচ গল্প-বলাও শোনার আসর-আড্ডার প্রচলন সেকালেও ছিল। পদাবলী কীর্তনের প্রাঙ্গনের চেয়ে বাঁধানো ঘাটলায় বা চণ্ডীমণ্ডপের গল্পের বৈঠক আয়তনে ছোট ছিল, কিন্তু ছিল প্রায় নিয়মিত ও স্বতস্ফূর্ত - উদ্যোগ-আয়োজনের অপেক্ষা রাখত না।

যাবা জনগণের কথা বলেন তারা জনগণের কাছে পৌঁছবার কথাও ভাববেন, এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু সেটা পরিবেশনের সমস্যা।

শুধুই কি পরিবেশনের? যে-গল্পের ধরন-ধারণ, ভাষা আর মেজাজ আর উপাদান একটা পরিশীলিত মুষ্টিমেয় পাঠকদের উদ্দেশে, তাকে শুধু পরিবেশনের কসরতে অগণিত মানুষের মনে পৌঁছে দেওয়া যায় নাকি। আর্ট-থিয়েটারের সূক্ষ্ম সফিসটিকেশন গ্রামীণ মানুষের ভিড়ে যাত্রাব মতো মঞ্চে হাজির করেই আসবে না চরিতার্থতা। সে-কারণেই সংযোগ-সঞ্চারের (কমিউনিকেশনের) দুটো দিক, যা প্রায় অন্যোন্য ;—১. পরিবেশন রীতি, ২. শিল্পরূপ। রূপে থাকবে এমন বিশিষ্টতা যা ব্যাপ্ত পরিবেশনের যোগ্যভিত্তি ; ; আর পরিবেশন হবে এমন ধারাব যা ঐ রূপকে বহন করে নিয়ে যাবে তাদের কাছে, যাদের-কাছে-মনে ঢুকবার জন্য এত সাধনা।

ছোটগল্পে এগুলি বড সমস্যা হয়ে ওঠে, কারণ একটা ছোট আয়তনে অল্প কথায় তাকে দাগ কেটে যাবার সাধনা করতে হয়। তবে একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বোঝা-পড়া করে নিতে হব শিল্পীকে —তিনি কি চান জনসাধারণকে তাঁর বিশ্বাসের সত্যে শুধু জাগাতে, না আরও চান তাকে আনন্দ দিতে দুঃখ দিতে জীবনকে জানাতে। তাঁর রাজনৈতিক সামাজিক লক্ষ্য আর সাহিত্যিক লক্ষ্য দুটো মিলে এক না-হলে বৃথাই ভাষার নিয়ত-চর্চায় কালব্যয়—'সাহিত্যিক' এই উপাধি।

৩. সেতু বন্ধ : কিভাবে, কতটা

এদেশে গল্প লেখার একটা পুরণ রীতি ছিল আশ্চর্য জনপ্রিয়। তা হল বলা-শোনার একটা পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। গল্পের পর গল্প গড়ে উঠেছে, বাঁধা পড়ছে একটা দীর্ঘসূত্রে। গল্প বলছেন বিষ্ণু শর্মা একটার পর একটা, তেমনি ধারা কথাসরিৎসাগরে বা জাতকে আসলে সাধারণ লোকেরা জমা হত গল্প শোনার লোভে। সেই উৎস থেকে সংস্কৃত আর পালি গল্পের লেখকেরা একটা কথনরীতি ধার করে নিলেন। ঐ রীতির এতজোর যে পশ্চিমে আরব্যরজনী হয়ে দেকামেরন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় (ডমরুর গল্প) বা পরশুরাম (কেদার চাটুজ্জের গল্প) এই কৌশলকে কাজে লাগিয়েছিলেন। বহু গল্পে রবীন্দ্রনাথও। যেমন, অতিপ্রাকৃত স্বাদের গল্পগুলি, সে, গল্পসল্প। এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। থিয়েটারে যেমন প্রসেনিয়াম ভাঙা, তেমনি গল্পের ব্যাপারেও ভাষার জগৎ আর শ্রোতার পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বে সেতুবন্ধ।

লু-সুনের একটি গল্পে (তলোয়ার তৈরির কাহিনী) দেখেছিলাম জাগলারি, ব্ল্যাক-ম্যাজিক—এমনি সব উপাদান ব্যবহার করে শিল্পী ফিউডাল শোষণ-বিরোধী বারুদ বানিয়েছিলেন। ঐ সব পুরন উপকরণ লোকসাধারণের আচরণ ও বিশ্বাসের ভিতে আছে—তাকে মারতে গেলেও তাকে ধরতে হবে।

জীবনের এই সব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মূল পর্যন্ত চলে গেলে ছোটগল্পে যে অসামান্য মাত্রা আসতে পারে তা তো শুধু তাত্ত্বিকের ভাবনা নয়। ঐ সব সার্থক গল্পের নির্দেশই সেইদিকে। রবীন্দ্রনাথের মতো পরিশীলিত নাগরিক মনও তো যথ দেবার ব্ল্যাক এণ্ড অবস্‌কিউর রিচ্যুয়ালকে প্রয়োজনে গল্পাঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন, যেমন সম্পত্তি সমর্পণ।

যদি চাই গল্প-শোনানর আসরে জনসাধারণের আসক্তি, তা তো আসর গড়লেই হবে না, গল্পের মধ্যে চাই লোকাচার, মিথ আর বিশ্বাস অপবিশ্বাসের জটিল ব্যবহার—যার ফলে ঐ লেখা তাদের বস্তু হয়ে উঠবে।

বাংলা সাহিত্যে গল্পবলার আসর (রামায়ণ ইত্যাদির কথকতা, ভাসান-অষ্টমঙ্গলার আয়োজন তো আসলে গল্পই বলত) পরিবেশনার বিচিত্র কৌশলে জনমন জয় করত। তাতে বিবৃতিতে-আবৃত্তিতে অভিনয়ে-গানে এক আশ্চর্য মেলামেশা আমাদের গল্পকারেরা পরিবেশনের ঢংকে গল্পের অঙ্গীভূত করতে পারেন না? কচিৎ গানের সুর, নাটকের মেজাজ, কবিতার ছন্দ। পারেন যে তার প্রমান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বহু গল্পে (বিশেষত সে গল্পকে) এ-সবের মিশ্রণে আবেদন বেড়েছে, অভিনবত্ব এসেছে। যদিও বলব না জনসাধারণের কথা তিনি ভেবেই ছিলেন। সেই লক্ষ্যে আঙ্গিকের ঐ ইঙ্গিত কি নতুনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না?

সপ্তম প্রস্তাব

সিদ্ধান্তের অভাব

আধুনিককালে সাহিত্যের সামনে যে সব নতুন চ্যালেঞ্জ এসেছে তার মোকাবিলা কিভাবে করা যেতে পারে আমার জানা নেই, হয়ত কেউ তা স্পষ্ট নির্দেশ করতে পারেন না। আসল প্রয়োজন সমস্যাটিকে নানা দিক ভাবা, যত বেশি সম্ভব বিচিত্র স্তর থেকে বিশ্লেষণ করা। প্রশ্নটি সমাজতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক-শিল্পী-পাঠক-সমালোচক সমাজ-তাত্ত্বিক চেতনার বাইরে থাকতে পারেন না। সাহিত্যিক এতকাল যে সংযোগের কথা ভেবেছেন, যার জন্য সাধনা করেছেন, তা তারপাঠকদের সঙ্গে। এই পাঠক কারা কোথায় এর সীমা, কেউ হয়ত তা নিয়েও চিন্তা ক,রছেন। কিন্তু সেই বৃত্তের বাইরেই যে বেশিটা—অনেক বেশি পড়ে রইল, সে জনতার সাহিত্য বিমুখতা, বিরূপতা হয়ে দাঁড়াতে পারে-এ চিন্তা অধুনা আসছে। তাদের সাহিত্য লিখিত বা মৌখিক যা আছে, কিছু তো আছেই তার মান যে নিচু, কুলীন গোত্রে তার প্রবেশ নেই সেই ভাবনা তাদের বিদ্রোহ ধূমায়িত করতে পারে।

পেশাদার লেখক ভালো ব্যবসা পেতে রচনাকে জনপ্রিয় করতে চান। ফলে তাঁর পাঠক গোষ্ঠীর পরিধি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। সবাই না হোন, অনেকে সফল হন,—ঝোঁকটা সীমা ছাড়াবার দিকে। যাঁরা সমাজ পরিবর্তনের রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে লেখেন, যাঁদের লক্ষ্য জনগণের শোষণমুক্তি-চিত্তমুক্তি তাঁরাও ব্যাপকতর সংযোগে আগ্রহী। প্রধানত বিষয়ের জোরে তাঁরা লক্ষ্য ভেদ করতে চান। প্রথম ক্ষেত্রে যথার্থ কম্যুনিকেশন হয় না,—আভ্যন্তর যে ধীর ক্রমিক ও স্থায়ী প্রতিক্রিয়া এতে প্রত্যাশিত, জনপ্রিয়তা সেখানে পৌঁছয় না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম্যুনিকেশন ঘটলেও তা সামাজিক রাজনৈতিক, সাহিত্যিক নয়।

আধুনিক সাহিত্যিক শিল্পের মান বাড়াতে চাইলেও নব্য সমাজবোধ যদি ভেতর থেকে আগ্রহ জাগায় তবে নিচের নকসার ৪ নং থেকে ৩ নং-য়ের দিকে কিছু বহিঃপ্রসারণ তাঁর সৃষ্টিতে আসতে পারে। তেমন ঘটলে আশাবাদী চিন্তাবিদ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য একটি ছক আঁকতে পারেন—